# ইতিহাস-অনুসন্ধান

# ইতিহাস-অনুসন্ধান

সম্পাদক

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬

কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭ হইতে মুদ্রিত ও কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত।

# মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে, ১৯৮৫-র ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর। সেখানে যে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রবীণ ও নবীন ইতিহাস অনুরাগী পড়েছিলেন, আলোচনা করেছিলেন, সেগুলিই এখন ছেপে বের করা হল—সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও দিকের উপর আলোকপাত করেছেন প্রবন্ধকাররা। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ইতিহাসবিদরাও যেমন আছেন, তেমনই আছেন তরুণ উৎসাহী গবেষকরা। এম. এ. ক্লাসের দুজন ছাত্রছাত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধও এ সঙ্কলনের মূল্যবান সম্পদ।

১৯৮৬-র ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্ত প্রবন্ধ আমাদের হাতে আসার কথা ছিল সংশোধিত আকারে। বহুবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন প্রবন্ধকার তাঁদের লেখা আমাদের কাছে জমা দেন নি। কেউ কেউ আগস্ট মাসে জমা দিয়েছেন। ফলে ইচ্ছা থাকলেও, তাঁদের লেখা সঙ্কলনে আমরা দিতে পারি নি। তার দায়িত্ব আমাদের নয়।

সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন সংসদের দুই বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী ও কুণাল চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্কলন আমরা বের করতে পেরেছি, লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রকাশক কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানীর সৌজন্যে। সময়মত ছাপার কৃতিত্ব কালান্তর প্রেসের কর্মী ও সংগঠক বন্ধুদের। তাঁদের সবাইকেই অশেষ ধন্যবাদ।

ইতি
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

২ পাম প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০১৯
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

# সূচীপত্র

# বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ

## চিরকিশোর ভাদুড়ী

বৈদিক যুগে প্রথা হিসেবে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিভিন্ন বেদের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতের উল্লেখে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

হিন্দুরা যুগে যুগে বিবাহকে একটি বৈদিক সংস্কার হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কোন সময়েই বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন করেন নি। ঋগবেদের বিবাহ[১] সূক্তে আবেগময়ী ভাষায় বিবাহের অবিনশ্বরতা কামনা করা হয়েছে। মনু[২]ও হিন্দু বিবাহের আকস্মিক অবসানের কথা কখনই চিন্তা করেন নি। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দু বিধবাদের বিকল্প হিসেবে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। মনু[৩] কুমারীদের একবার মাত্র বিবাহের বিধান দিয়েছেন। তাঁর[৪] আরও অভিমত স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী কোন অবস্থাতেই অন্য পুরুষের সাহচর্যের কথা চিন্তা করবে না। মনুর[৫] ধারনা, যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পরে সাধ্বী জীবন যাপন করেন, মৃত্যুতে তাঁর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। তাঁর[৬] বিধান, পতিব্রতা রমনী কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা চিন্তা করবেন না। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিধবা বিবাহের বিধান দেওয়া হয়নি বলেই তাঁর[৭] দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনু বিধবা বিবাহের ঘোরতর বিরোধী।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, Vedic Index[৮] of Name and Subjects-এর সম্পাদকমণ্ডলীর মতে বৈদিক ভারতে নিঃসন্তান বিধবার সঙ্গে দেবরের বিবাহে বাধা ছিল না। তাঁরা ঋগবেদের ১০।১৮।৮ এবং ১০।৪০।২ নং শ্লোক দুইটি নিজেদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করেন।

Cambridge History of India[৯]-র সম্পাদকমণ্ডলী এবং শ্রী এন. কে. দত্ত[১০] এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বৈদিক হিন্দুরা বংশ রক্ষার জন্য বিধবা ভ্রাতৃজায়া এবং দেবরের বিবাহে বাধা দিতেন না।

এইবার আমরা বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতবাদের সমর্থনে উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ উদ্ধৃত ঋগবেদের ১০।১৮।৮ এবং ১০।৪০।২ নং শ্লোক দুটির যাথার্থ্য নিরূপণের চেষ্টা করব।

প্রথমে আমরা ঋগবেদের ১০।১৮।৮ নং শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি ঃ

উদীর্ঘ নার্ঘভি জীবলোকম গতাবু মেতমুপ শেষ এহি।
হস্ত গ্রাভস্য দিধিসস্ত বেদম পতুর্জানিত্বমভি সংবভুথ ॥

শ্লোকটির গ্রিফিথ[11] কৃত ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ ঃ

হে নারি! গাত্রোত্থান কর! জীবলোকে ফিরে এস! তুমি তোমার মৃতপতির পাশে শয়ন করে আছ!

তোমার এই স্বামী যিনি তোমার হস্তধারন করেছিলেন এবং তোমাতে গর্ভসঞ্চার করেছিলেন, তাঁর পত্নী হিসেবে তোমার এখানে (শ্মশানে) আসা সার্থক হয়েছে।

ওপরের ব্যাখ্যা থেকে প্রতীতি হয়, স্বামীর চিতাপার্শ্বে শায়িতা বিধবা যতদূর সম্ভব শিশু সন্তানের জননী এবং তাঁর শিশু সন্তানের লালন পালনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে সহমরণে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করছেন। **মহাভারত**[12] এবং **ভাগবত**[13] **পুরানে** বৈদিক যুগের রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাস বা কল্মাষপাদ বা মিত্র সহের হাতে নিহত ব্রাহ্মনের বিধবা পত্নীর স্বামীর চিতারোহনের উল্লেখ আছে। আমাদের সবিনয় নিবেদন, উপরি বর্ণিত শ্লোকটি বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের যুক্তির বদলে সহমরণের প্রথা হিসেবে অস্তিত্বের কথা বলে। (যদিও উপরিলিখিত ১০।১০।৮ নং শ্লোকটি সতীদাহর কোন ঘটনার উল্লেখ করে না।)

এখন ঋগবেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক ঃ

কুহসিদ্দোষা কুহ বস্তুরোশ্বিনা কুহ ভিপিত্বম করতঃ কুহসত্তুঃ
কো বাং সযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যম ন যোষা কৃনুতে সর্ধস্থ আ।

গ্রিফিথের ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গরূপ ঃ

হে অশ্বিনগণ! তোমরা সন্ধ্যাবেলা কোথায় থাক! প্রভাতেই বা কোথায় অবস্থান কর! রাত্রিতেই বা কোথায় কোথায় বিশ্রাম কর?

শয্যাশ্রিত বিধবা যেমন তার দেবরকে আদর করে বা স্ত্রী স্বামীকে আকর্ষণ করে তেমনি তোমরা কার আকর্ষণে গৃহাভিমুখী হও?

আমাদের বিনীত মতামত হল যে এই শ্লোকটি প্রথা হিসেবে নিয়োগের

অস্তিত্বের ইংগিত করে। নাহলে এই শ্লোকে বিধবার নিজ শয্যায় দেবরকে আকর্ষণের সংগে স্ত্রীর স্বামীকে আকর্ষণ করার তুলনা দেওয়া হতনা। স্মৃতিকার[১৫] বিশ্বরূপ এবং মেধাতিথি এবং ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার[১৬] এই শ্লোকটি বৈদিক ভারতে নিয়োগ প্রথার অস্তিত্বের ইংগিতবাহী বলে মনে করেন। মহাভারতে[১৭] একটি সুনির্দিষ্ট নিয়োগের বৈদিক ভারতে অস্তিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যার ফলে উপরিউল্লিখিত বৈদিক রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাসের বা কল্মাষপাদের বা মিত্র সহের রানী মদয়ন্তীর সংগে ঋষি বশিষ্ঠের সহবাসে অশ্মকের জন্ম হয়। অতএব ঋগবেদের ১০।৪০।২ নং শ্লোকটি বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার যুক্তির বদলে নিয়োগ প্রথা হিসেবে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ দেয় বলেই আমরা মনে করি।

একটা কথা এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখতে হবে বংশ রক্ষার জন্য নিঃসন্তান বিধবার সংগে সহবাসের অধিকার প্রাচীন ভারতে দেবরদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ছিল। য়াস্ক দেবরের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা, নিয়োগ প্রথায় দেবর সাময়িকভাবে স্বামীর সব রকম অধিকার ভোগ করতেন। অতএব প্রাচীন ভারতে যখন নিয়োগ প্রথা হিসেবে অনুমোদিত ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই দেবরের বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের কোন যৌক্তিকতা ছিলনা। অতএব বৈদিক ভারতে বিধবা বিবাহের প্রচলনে উপরিউল্লিখিত পণ্ডিতদের যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

অধিকন্তু, Vedic Index[১৮] of Name and Subjects-এর সম্পাদক-মণ্ডলী মনে করেন অথর্ববেদের ৯।৫।২৭-২৮ নং শ্লোক দুটিতে বিধবা বিবাহের প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। মূল শ্লোক দুটি হল ঃ

ইয়া পূর্বম্ পতিম্ বিত্বা থান্যম্ বিন্দতে পরম্।
পঞ্চদনঞ্চ তাবজম্ দদাতি ন নিয়োসতঃ।
সমানো লোকো ভবতি পুনর্ভবা পরঃ পতিঃ।
য়োজম্ পঞ্চদনম্ দাক্ষিণা জ্যোতিসম দদাতি।

শ্লোকদুটির তৃতীয় লাইনে পুনর্ভবা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটি শ্লোকই পুনর্ভূ বা বাগদত্তা কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্মৃতিকার কাশ্যপের[১৯] মতে পুনর্ভূ সাত প্রকার যথা (১) যে কন্যাকে বিবাহের অঙ্গীকার করা হয়েছে, (২) যে কন্যাকে সম্প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, (৩) যে কন্যার হাতে বিবাহের মাঙ্গলিক বন্ধনী পাত্র নিজে হাতে বেঁধে দিয়েছে, (৪) জলস্পর্শ করে যাকে সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে (৫) যে কন্যার হস্ত ধারণ করা

হয়েছে(৬) যে কন্যা অগ্নি প্রদক্ষিণ করেছে এবং (৭) উপরে বর্ণিত ছয় প্রকার পুনর্ভূ'র গর্ভে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে।

অথর্ববেদের উক্ত শ্লোকদুটির গ্রিফিথ[২০] কৃত ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ ঃ—

কোন পূর্ববিবাহিতা রমণী যদি পুনর্বিবাহ করে যথারীতি শাস্ত্রীয় উপচারে পঞ্চথাল্য অন্ন এবং ছাগ প্রদান করে তাহলে তাদের বিচ্ছেদ হবেনা ॥ ২৭॥

পরবর্তী স্বামী তার পুনর্বিবাহিত পত্নীর সংগে একই পৃথিবীতে বাস করবে যদি সে যথারীতি শাস্ত্রীয় উপচারে একটি ছাগ সহ পঞ্চ থাল্য অন্ন প্রদান করে ॥ ২৮ ॥

কিন্তু যেহেতু মূল শ্লোকে পুনর্ভূ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রসমূহে যেহেতু বিধবা বিবাহের সুপারিশ করা হয়নি, সেইহেতু উপরের শ্লোক দুটি পুনর্ভূ' বা বাগদত্তা কন্যার সংগেই সম্পর্কিত, অন্য কিছুর সংগে নয়। শ্লোকদুটিতে বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহের পাপস্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে। অতএব উপরোক্ত শ্লোকদুটি বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেনা।

কানের[২১] মতে, অথর্ববেদের উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে ( ৯।৫।২৭-২৮ ) বাগদত্তা কন্যাকে বিবাহের পাপস্খালনের জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে পুনর্ভূ' কন্যার সংগে তার প্রতিশ্রুত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে বাধা ছিলনা। মনু[২১] এই ধরনের বিবাহ অনুমোদনও করেছেন। কিন্তু কাশ্যপ প্রমুখ স্মৃতিকারগণ এই ধরনের বিবাহের বিরোধী।

ডঃ বার্নেটের[২৩] অভিমত বৈদিক শাস্ত্রাদি বিবধা বিবাহ সুপারিশ করেনি।

উপসংহারে আমাদের সবিনয় নিবেদন, বেদ বিধবা বিবাহ অনুমোদন করেন নি।

## পাদটীকা এবং গ্রন্থপঞ্জী

১ ঋগবেদ— ১০।৮৫, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৭— ইত্যাদি।
২ মানব ধর্মশাস্ত্র— (জে. জলি সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৮৭) ৫।১৬২, ৯।৪৬, ৯।১০১ ইত্যাদি।
৩ তদেব ৯।৪৭।
৪ তদেব ৫।১৫৭।

৫ তদেব ৫।১৬০
৬ তদেব ৫।১৬২
৭ তদেব ৯।৬৫
৮ "The re-marriage of a widow was apparently permitted. This seems originally to have taken the form of the marriage of the widow to the brother or other nearest kinsman of the dead man in order to produce children. At any rate the ceremony is apparently alluded to in a funeral hymn of the *Rgveda* for the alternative explanation....Moreover another passage of the *Rgveda* clearly refers to the marriage of the widow and the husband's brother (dever) which constitutes what the Indians later know as *niyoga*."—Vedic Index of Names of Subjects—V—1, pp. 476-77 ( Mackdonnel & Keith Ed. ) London 1912.
৯ "(Which) appears clearly in the burial ritual of the *rgveda* that the brother-in-law should marry the widow probably only in cases where the dead man left no son and it was therefore imperative that steps should be taken to secure him offspring."—*The Cambridge History of India*—Vol I, p 80, (Rapson ed), Delhi 1955.
১০ —"No aversion is expressed anywhere in the *Rgveda* to the marriage of a widowed woman. Probably the custom of a widow marrying the brother of her deceased husband was general—*Dutta N. K.—the Origin & growth of Caste in India*—Vol I, pp 73-74 (London 1930).
১১ "Rise ! Come unto the world of life, O woman ! Come ! he is lifeless by whose side thou liest. Wifehood with this thy husband was thy portion who took thy hand and wooed thee as a lover."—Griffith R. T. H.—*The Hymns of the Rgveda*—Delhi 1973.
১২ মহাভারত (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, কলিকাতা) ১. ১৭৫. ১০-২২ ।
১৩ ভাগবত পুরাণ—(গীতা প্রেস গোরক্ষপুর) ৯।৯।৩৬ ।
১৪ "Where are ye Asvins, in the evening, where at the morn ? Where is your halting place, where rest ye for the night ?

Who brings you homeward as the widow bedward draws her husband's brother as the bride attracts the groom ?" —Griffiith R. T. H—*The Hymns of the Rgveda.*

১৫ Kane P. V—*History of Dharmasastra*, Vol-2 Pt—1 pp 606 (Poona 1941).

১৬ Majumdar R. C. (ed.)—*The Vedic Age* (Bombay 1969) p 392.

১৭ মহাভারত (হরিদাস) ১.১১৬.২২—২৩ এবং ১.১৭০.৪৪-৪৮

১৮ —"In the *Atharvaveda* a verse refers to a Charm which world secure the re union in the next world of a wife and her husband"—*Vedic I› dex*, Vol I, p 477.

১৯ বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃত কৌতুক মঙ্গলা
উদক স্পর্শিতা যা চ যা চ পানি গৃহিতিকা
অগ্নি পরিগতা যা চ পুনর্ভূ প্রভবা চ যা
ইত্যেতা কাশ্যপেনক্তা দহতি কুলমগ্নিবং — কাশ্যপস্মৃতি

২০ —"27. Whoever woman having gained a former husband, then gains another later one if they give a goat with five rice dishes they shall not be separated.
28. Her later husband seems to have the same world with his re married spouse who gives a goat with five rice dishes with the light of the sacrificed gifts.—English translation of *Atharvaveda Sanhita* by Whitny, Delhi 1971.

২১ —"It is possible to hold that this may refer to the promise of a girl in marriage, subsequent death of the intended bridegroom before the marriage ceremonies take place and then the bestowal of her on another. Whatever the meaning of *punarbhu* here may be, it is clear that same sort of sin or inferiority attached to her and that such sin or approbieum had to be removed by sacrifices—*History of Dharmasastra,* Vol 2, pt I, p 615.

২২ *Manava Dharmasastra*, IX/69.

২৩ ..."There is no authority even in the *Vedas* that countenances the second marriage of widow"—Burnett L. D.— —*Antiquities gritus of India,*—pp 143-44 (Reprint, Calcutta 1964).

# ঋগবেদে উল্লেখিত একটি সেচ প্রক্রিয়া

রাজীবকান্তি শর্মাধিকারী

ঋগবেদের দশম মণ্ডলের ১০১তম সূক্তে প্রস্তর-নির্মিত জল-উত্তোলনকারী যন্ত্রবিশেষ একটি চক্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লিখিত সূক্তের সপ্তম ঋকের অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

দ্রোণাহাবমবতমশ্ম চক্র মংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণং ॥[১] (১০.১০১.৭)

এর অর্থ ঃ প্রস্তর নির্মিত চক্রে ( অর্থাৎ প্রস্তর নির্মিত চক্রের মাধ্যমে), ধনুরূপ পাত্রে কূপ থেকে নরগণের পানীয়কে (উত্তোলন করে) কাষ্ঠ নির্মিত আধারে (বা দ্রোণ পরিমিত স্থানে) সিঞ্চন কর।

উপরিউক্ত ঋক্‌টি থেকে দেখা যায় যে কূপ থেকে জল তোলার অন্যতম মাধ্যমরূপে প্রস্তর নির্মিত চক্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং উত্তোলিত জল মানুষের প্রয়োজনে দ্রোণ পরিমিত পাত্রে বা স্থানে সিঞ্চন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আলোচ্য ঋক্‌টি দশম মণ্ডলের যে সূক্ত থেকে চয়ন করা হয়েছে সেই ১০১তম সূক্তটি বীজ, সীরা, বপ ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দে মণ্ডিত। সুতরাং ঋগবেদের যুগে কৃষি তথা সেচের কাজে যে চক্র ব্যবহৃত হ'ত এবং সেই চক্র যে কূপের উপরে স্থাপিত হ'ত, তা আলোচ্য সূক্ত থেকেই জানা যায়।

খ্রীষ্টশতক শুরু হওয়ার পূর্বের কয়েকশ' বৎসরের সাহিত্যিক উপাদান যেমন অর্থশাস্ত্র,[২] গাথাসপ্তশতী,[৩] ললিত বিস্তর[৪] ইত্যাদি থেকে স্রোতোযন্ত্র, অরহউ, ঘটিযন্ত্র প্রভৃতি জল উত্তোলনকারী যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি যে কুয়োর উপরে স্থাপিত হ'ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইরফান হাবিব মহোদয়ও[৫] বাবরের পূর্বে ভারতবর্ষে এমন নজীর খুঁজে পান নি। তিনি লিখেছেন, 'নর ইজ ইট স্টেটেড এনিওয়্যার দ্যাট দিজ ডিভাইসেস ওয়েয়ার সেট আপ অন ওয়েলস্'। কিন্তু হাবিব সাহেবের বক্তব্যের অসারতা ইতিমধ্যে প্রতিপন্ন করেছেন আর নাথ,[৬] ফিজ লেহ্‌ম্যান[৭] প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। অপরদিকে ঘটচক্র বা ঘটিযন্ত্রের মূলে দুটি প্রকরণ বা

উপাদান, ঋগবেদোক্ত কূপ এবং কূপোপরি স্থাপিত চক্রের প্রতি এই পণ্ডিত-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি। উপরে বর্ণিত দশম মণ্ডলের ঋক্‌টি থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে খ্রীষ্টশতক শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই ঋগ্‌বেদের যুগে জল-উত্তোলনকারী যন্ত্রবিশেষ অশ্মবক্রের বহুল প্রচলন হয়েছিল।

## পাদটীকা

১. ১. ১০১. ৭

২. ২. ২৪. ২৩

৩. গাথাসপ্তশতী ৫. ৯০. দ্রঃ জগন্নাথ পাঠক সম্পাদিত গাথাসপ্তশতী, বারানসী, ১৯৬৯

৪. ললিত বিস্তর ৫. ১০০. দ্রঃ পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত ললিতবিস্তর, দ্বারভাঙ্গা ১৯৫৮

৫. প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস, মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়া সেকসন, ৩১তম অধিবেশন, ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, বারাণসী ১৯৬৯

৬. জে. এ. এস. ১২ খণ্ড, ১৯৭০, পৃঃ ৮১-৮৪

৭. জে. এ. এস. ১৯ খণ্ড পৃঃ ৫২-৬৪

৮. বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, জেসো ১৬, ২৯৮-৩১৬

# প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে প্রতিরোধ

## সুনীলবরণ বিশ্বাস

ম্যাক্স মূল্যার তাঁর 'হিস্ট্রি অফ্ অ্যান্সিয়েন্ট্ লিটারেচর' গ্রন্থে মন্তব্য করে বলেছেন যে সুপ্রাচীন কালে হিন্দুরা দার্শনিকদেরই জ্ঞাত ছিল। তাঁর ভাষায়, "বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে ভারতের কোন স্থান নেই"।[১] অনুরূপ উক্তি ডবলু এ ডানিংয়েরও, "প্রাচীন আর্যবংশীয় লোকেরা তাদের দেববিদ্যা ও অধিবিদ্যার বাতাবরন থেকে রাষ্ট্রনীতিকে মুক্ত করতে পারে নি।"[২] স্মরণাতীত কালে ভারতের মাটিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির অসাধারণ কর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ব্লুম্‌ফিল্ডও।[৩] তবে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ মতান্ধতা দেখেন নি। তাঁর ভাষায়, "আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসের প্রথম দিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রায়োগিক চর্চার আকাশ ছিল যার পরিমণ্ডলে সময়ের পথে রচিত হয়েছিল বেশ উচ্চস্তরের সাহিত্য।"[৪]

এ কথা সত্য নয় যে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির কোন স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না, বরং সর্বদাই ধর্ম ও অধিবিদ্যার আচ্ছাদন-রজ্জুর দ্বার বাঁধা থাকতো। মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কাছে অতীতের শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। শান্তিপর্বে রাজধর্ম তথা রাজা ও সরকারের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ রয়েছে। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় আজও বিস্ময় উদ্রেক করে আমাদের মনে। কৌটিল্য—উত্তর পর্বে আমরা পাচ্ছি কামণ্ডকীয় নীতিসারকে (৪০০ খৃঃ অঃ) ও শুক্রনীতিকে। শুক্রনীতিতে রাজা, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তাই পাশ্চমী লেখকরা একথা বলে ভুল করেছেন, "প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্টই হল অবাধ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন।"[৫]

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রকে পবিত্র অছি বলে মনে করা হত। রাজতন্ত্রের হিন্দু আদর্শকে বলা হত রাজর্ষি। একথা সত্য যে ভীষ্ম ও মনু প্রচারিত তত্ত্বে রাজগণকে দেবতাদের থেকে ভিন্ন করে দেখা হয় নি। তবু পুরাতন

স্মৃতিগুলোর মৌলিক নীতিসমূহ রাজার দেবত্বের ধারণাকে তাৎপর্য দিয়েছে অন্য দিক থেকে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন, "ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতির চিন্তায় নৈরাজ্যবাদী দর্শনের স্থান ছিল না। অন্য সমস্ত রকমের ধর্মকে অতিক্রম করে গিয়েছিল রাজধর্ম, কেননা রাজা যদি শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হতেন তবে অন্য সব কিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে।"[৬] লেখক আরও বলেছেন, "ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির চিন্তায় ব্যক্তির বিদ্রোহের অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।"[৭]

ইউ এন ঘোষাল বলেছেন যে কৌটিল্যবর্ণিত রাষ্ট্র ছিল অতি উন্নত ধরনের। ভীষ্ম ও মনুতে রয়েছে রাষ্ট্রের স্মৃতি-তত্ত্ব।[৮] ভীষ্ম ও মনু রাজ-তন্ত্রের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা দিলেও তাঁরা প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আর সামাজিক শৃংখলা ও সংহতিকে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছেন। মনুতে কু-শাসনের পরিণতি সম্পর্কে রাজার উদ্দেশ্যে বহু সতর্কবাণীর দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবশ্য, শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিরোধে প্রজাবর্গের সঠিক কর্তব্যের উল্লেখ করতে তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু জনসম্প্রদায়ের পৌর অধিকার সম্পর্কে ভীষ্মের তাৎপর্যপূর্ণ মতামত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভীষ্ম ও মনুর মতে যদিও আপাতদৃষ্টিতে রাজা ঐশ্বরিক মর্যাদামণ্ডিত তবু তিনি আইনের অনুশাসনের ঊর্ধ্বে নন কেননা রাজকার্যের পটভূমিতে রয়েছে কর্মনীতির সক্রিয় ভূমিকা আর জনসম্প্রদায়ের প্রতিরোধের অধিকারকে যুক্তিযুক্ত করেছে আত্মরক্ষার পবিত্র অনুশাসন। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে ঐশ্বরিক তত্ত্বের পক্ষে খুব জোরালো ও রীতিসম্মত যুক্তি আমরা দেখিনা, যেমনটি দেখি রবার্ট ফিল্‌মারের প্যাট্রিআরকাতে। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা তাদের ফারাওকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতো। অনুরূপ মনোভাব প্রাচীন চীন ও মেসোপোটামিয়াতেও দেখা যাবে। কিন্তু ভারতের বেদ ও স্মৃতি রাজাকে ঈশ্বরের পুত্র কিংবা অবতার বলে মনে করে নি।

একথা অনস্বীকার্য যে রাজতন্ত্রকে ঐশ্বরিক শক্তিমণ্ডিত করে দেখেছেন বেদ ও স্মৃতির লেখকরা। তবু ভি পি ভার্মার মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, "প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রের দেবায়ন কিংবা রাজগণ অথবা তাঁদের পূর্বপুরুষদের দেবতাজ্ঞানে পূজাঅর্চনার দৃষ্টান্ত আমরা পাই না। সেই কারণে ঐশ্বরিক পবিত্রকরণ ছাড়া ঐশ্বরিক তত্ত্বের বাস্তব প্রতিষ্ঠানিক পরিপ্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।"[৯] তাৎপর্যবহ কথাটা হল এই যে ভারতীয় লেখকরা কখনও বলেন নি যে শাসক শুধুমাত্র ঈশ্বর অথবা তাঁর নিজের নিকট ছাড়া আর কারও প্রতি

দায়িত্বশীল নন। রাজা নিঃসন্দেহে তার প্রশাসনিক নিয়ম কানুনের প্রতি বাধ্য থাকতেন। মনু ও ভীষ্ম উভয়েই রাজার অন্যায়ের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ন্যায় অথবা অন্যায় যে কোন পথেই হোক সর্বাত্মক প্রতিরোধের কথা ভীষ্ম বলেছেন। শাসক গোষ্ঠীর সঠিক ও উপযুক্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন, সমাজ জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ, স্থায়িত্ব ও প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। সর্বধর্মের মূল কথাই রাজধর্ম। শান্তিপর্বে (৬৩ ঃ ২৫,২৬, ২৯) উল্লিখিত আছে

'এবং ধর্মান্ রাজধর্মেষু সর্বান্সর্বাবস্থং সংপ্রলীনান্নিবোধ।
সর্বা বিদ্যা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রতিষ্ঠাঃ।
সর্বে ধর্মা রাজধর্ম প্রধানাঃ।
আরও বলা হয়েছে—
রাজমূলা মহাভাগ যোগক্ষেম সুবৃষ্টয়ঃ।
প্রজাসু ব্যাধয়শ্চৈব মরনং চ ভয়ানি চ ॥

স্বৈরতন্ত্রী শাসককে সমাজের সামগ্রিক প্রতিরোধে উৎখাত করা যেত। জে, এন, ফিগিস বলেছেন, "প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে এরূপ মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় না যে রাজার অযোগ্যতা কিংবা অন্য কারণে তাঁর বংশসূত্রে অর্জিত রাজ্যশাসনের অধিকার হরণ করা যাবে না।"[১০] আর এফ, ফার্ণ ও দেখেছেন যে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রে এমন কথা নেই যে রাজ্যশাসনের অধিকার অবিচ্ছেদ্য।[১১] ভীষ্মও বলেছেন (১২.৫৬) যে সাগরের ভগ্ন তরীর মতই প্রজাদের স্বার্থসংরক্ষনে ব্যর্থ রাজাও সমানভাবে পরিত্যাজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন (১, ৩৪০) যে রাজা প্রজাদের ধনে কোষাগার পূর্ণ করেন তিনি খুব তাড়াতাড়ি দুর্ভাগ্যে পীড়িত হন ও বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা ধ্বংস হন। প্রজাদের দ্বারা উৎপীড়নজনিত ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হয় না যতক্ষণ না সেই আগুনে দগ্ধ হন রাজপরিবার, সৌভাগ্য ও জীবন।

অন্যায়েন নৃপোরাষ্ট্রাৎ স্বকোশং যোহভিবর্ধয়েৎ।
সোহচিরাদ্ বিগতশ্রবশে নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥
প্রজাপীড়ন অন্তপাৎ সমুদ্ভুতো হুতাশন ঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং প্রিয়ং প্রানাংশ্চাদগ্ধানিবর্ততে ॥

জওহর লাল নেহরু লিখেছেন, "এটা সত্যই লক্ষনীয় যে পুরাতন ভারতের রাজতন্ত্রের ধারনা জনসেবার আদর্শের দ্বারা সিঞ্চিত ছিল। রাজা যদি অন্যায়

করতেন তবে প্রজাদের অধিকার ছিল তাকে অপসারিত করা ও তাঁর স্থানে অন্যব্যক্তিকে অভিষিক্ত করা।"[১২]

অনুরূপ মন্তব্য করেছেন অলটেকারও। তিনি বলেছেন যে ভারতীয় লেখকেরা দুষ্টপ্রকৃতি ও স্বৈরতন্ত্রী রাজাদের শাসনের প্রতি নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের সুপারিশ করেন নি যদিও অবশ্য লেখক প্রতিরোধ দর্শনের কোন সুস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে উপনীত হন নি। লেখক অবশ্য মৌর্য ও সুংগ বংশের শেষ উত্তরাধিকারীবৃন্দ ও রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা চতুর্থ গোবিন্দের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা সিংহাসনচ্যুত হন কেননা তাঁদের কুশাসন জনগণ, মন্ত্রী ও সামন্তপ্রভুদের তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। অল্‌টেকারের ভাষায়, "জনগণের বিদ্রোহের অধিকার ও সিংহাসনে অধিকতর গুণবান শাসককে বসানোর যে অধিকার প্রাচীন ভারতে জনগণ বাস্তবে ভোগ করতো তা আমরা এ যুগে ভাবতে পারি না।"[১৩]

যেহেতু প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্রকে অছি হিসাবে অভিহিত করা হত সেহেতু রাজার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল অবিমিশ্রিত। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন—

> প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাংচ হিতে হিতম্‌।
> নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানামুতপ্রিয়ং হিতম্‌ ॥

তিনি আরও বলেছেন যে রাষ্ট্রের কাজ হলো প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কিংবা তার ভয় দেখিয়ে প্রজাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা, জনগণের ঐতিহ্য, প্রথা ও অনুশাসনগুলো সংরক্ষণ করা আর ধর্ম ও গুণের সমাদর করা।

> দণ্ডো হি কেবলো লোকং নরং চেমং চ রক্ষতি।
> রাজ্ঞা পুত্রে চ শত্রৌ চ যথাদোষং সমং ধৃতঃ ॥

প্রাচীন ভারতে রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একথা বলা ঠিক হবে না যে সেই বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত অতীতে রাজাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ভূষিত বলে মনে করা হত। প্রশাসনিক বিজ্ঞানকে বলা হত নীতিসার। শুক্রনীতিসারে রয়েছে যে, যে রাজা প্রজাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করেন তিনি হারান তাঁর জীবন, পরিবার এবং রাজ্য। অনুশাসনপর্বে দুষ্কৃতিকারী রাজাকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হত্যার কথা বলা হয়েছে, এমন কি এই ধরনের রাজাকে জীবন্ত কালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজা যে কর্তব্যপরায়ণ হবেন, ধর্ম ও সত্যের পথ থেকে সরে আসবেন না তার কথা রয়েছে প্রকিরনকে। বলা হয়েছে, সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত না হলে রাজা ও ব্রাহ্মণকে অবমাননা করা উচিত হবে না।

প্রসংগত কানে বলেছেন যে নারদের মতবাদেও চরম আনুগত্য ও দুষ্ট-প্রকৃতি রাজার কাছে নতি স্বীকারের কথা নাই।[১৪] বহু সীমাবদ্ধতা যে রাজার ছিল তার বর্ণনা করেছেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 'প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি অভিমত দিয়েছেন যে জনমেজয়ের মত নৃপতিও ব্রাহ্মণদের দ্বারা অবদমিত হয়েছিলেন। রাজকীয় কর্তৃত্বের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখত প্রাচীন ভারতের সভা বা রাজপরিষদ এবং জন ও মহাজনের মাধ্যমে যথাক্রমে মন্ত্রীরা ও সাধারণ মানুষেরা।[১৫] প্রসংগত উল্লেখ্য অল্‌টেকারের আর একটি উক্তি, "অভিষেকের সময় রাজাকে যে শপথ নিতে হত তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আইন, অনুশাসন ও প্রথাদি মেনে চলতে হত।"[১৬] পদ-কুশল মানব জাতকে ( নং ৪৩২ ) একটি উপাখ্যান বলছে কিভাবে কোন রাজ্যের নগরবাসী ও অন্যান্য অধিবাসীবৃন্দ সমবেত হয়ে রাজাকে প্রহারের দ্বারা নিধন করেছিল কেননা তিনি ছিলেন অকল্যাণের প্রতিমূর্তি ও তারপর তারা একজন ভাল মানুষকে রাজপদে বসিয়েছিল।

অন্যায়কারী রাজার প্রতি মহাভারত কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করে নি কেননা শান্তিপর্বের রাজধর্মের অধ্যায়ে পুণ্যবান রাজা ও স্বৈরতন্ত্রী শাসকের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শান্তিপর্বে রয়েছে যে যে রাজা দুর্বৃত্ত ও পাপকার্যে লিপ্ত মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হন তিনি ন্যায়ের ধ্বংসকারী বলে বিবেচিত হন আর তিনি তাই তাঁর পরিবারসহ প্রজাবর্গের দ্বারা হত হবার যোগ্য। শান্তিপর্ব থেকে উদ্ধৃত করে অজিত কুমার সেন বলেছেন যে রাজা যিনি ছিলেন সম্পদ ও ঈর্ষার প্রতিমূর্তি, সমস্ত জীবের কাছে অন্যায়কারী বলে বিবেচিত হওয়ায় ঋষিগণ দ্বারা কুশের আঘাতে হত হন।[১৭] অগ্নিপর্বেও বলা হয়েছে যে স্বেচ্ছাচারী রাজা সিংহাসনচ্যুত ও হত হন।[১৮]

একথা ঠিক যে প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি শাস্ত্রের লেখকরা জনগণের অধিকার সম্পর্কিত কোন সুবিন্যস্ত ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দেন নি। ভি. পি. ভার্মার মতে, "আমরা মনু কিংবা অনুরূপ কোন হিন্দু তাত্ত্বিকের দ্বারা বর্ণিত জনগণের রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকারের কথা পাই না"। তাঁর মতে তিনি

অধিকারের তত্ত্বগত দিক কিংবা অধিকার বনাম কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণার সংস্পর্শে আসেন নি। কিংবা তাঁর ভাষায় প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট 'ফরমূলেশন্' অথবা সূত্রের সন্ধান পান নি। ডঃ সেনের ভাষায়, "হিন্দুরা স্বধর্ম ও কর্তব্যের কথা বেশী চিন্তা করেছে, স্বাধিকার ও অধিকারের কথা নয়।"[১৯]

পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ও তত্ত্বাদি যদিও প্রাচীন ভারতকে রাষ্ট্র অথবা সরকারের সংগে সমার্থক করে দেখেছিল, তবু অতীতের ইতিহাসে রাজগণের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। প্রাচীন ভারতের লেখকরা বলেন নি যে রাষ্ট্র নিজেই তার লক্ষ্য। বরং লক্ষ্যসাধনের উপায় ছিল রাষ্ট্রীয় সংগঠন এরূপ আভাস সুস্পষ্ট। কর্মের ধারণায় যে বিরাট সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে তা লক্ষ্য করে ভার্মা বলেছেন যে এতেই প্রমাণ হয় যে দায়িত্বহীন ও স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অবকাশ সে যুগে ছিল না। কর্মের দর্শনই ছিল নৈতিক নিমিত্তবাদের সুপ্রচলিত আই।

যশস্তিলক থেকে ইউ. এন. ঘোষাল উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যেমন দিবা ও রাত্রি যথাক্রমে আলো ও অন্ধকারের সূচনা করে তেমনি প্রজাবর্গের মধ্যে গুণ ও দোষ কিংবা পাপের ক্ষেত্রে রাজা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। বি. জি গোখেলের কথাও উল্লেখযোগ্য, "বিপ্লবের অধিকার জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রাচীনকালে ছিল।[২০] অধ্যাপক ঘোষাল দাবী করেছেন যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইয়োরোপের মধ্যযুগ বিশেষত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ণিত ঐশ্বরিক তত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব দেখা যাবে না। একথা সত্য যে বৈদিক ও স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক শক্তির ইংগিত আছে; তবু ঈশ্বরের প্রতিই রাজার আনুগত্য চরম একথা প্রাচীন শাস্ত্রে বলা নেই। বরং রাজ্যে প্রচলিত আইন ও নিয়ম কানুন ও অনুশাসনের প্রতি রাজার বাধ্যবাধকতার কথা স্মৃতিতে রয়েছে যে নিয়মাবলী নিঃসন্দেহে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত।[২১]

## গ্রন্থপঞ্জী


১ ম্যাক্স মূলার—হিস্ট্রি অফ অ্যান্সিয়েন্ট লিটারেচর, পৃ ৩১
২ ডানিং—এ হিস্ট্রি অফ পলিটিকাল থিওরিস্, পৃ ৯-১০ (ভূমিকা)
৩ ব্লুমফিল্ড—রিলিজিয়ন অফ্ দি বেদ, পৃ ৪-৫

৪ ইউ এন্ ঘোষাল কর্তৃক উদ্ধৃত—এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিকাল আইডিয়াজ, পৃ ১২

৫ অজিত কুমার সেন—স্টাডিজ্ ইন্ হিন্দু পলিটিকাল থট্, পৃ ৬৫-৬৬

৬ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—ইভোলিউশন্ অফ্ দি পলিটিকাল ফিলসফি অফ্ গান্ধী, পৃ ৩৫

৭ ঐ, পৃ ৩৭

৮ ইউ এন ঘোষাল—এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিকাল আইডিয়াস্, পৃ ৫৫৫

৯ ভি পি ভার্মা—স্টাডিস্ ইন হিন্দু পলিটিকাল থট অ্যাণ্ড ইটস্ মেটাফিজিকাল ফাউণ্ডেশন্

১০ এস্ এন্ ফিগিস্—দি ডিভাইন্ রাইট অফ কিংগস্, পৃ ৫-৬

১১ এফ, ফার্ণ—কিংশিপ্ অ্যাণ্ড ল ইন্ দি মিডিল্ এজেস্, পৃ ৫

১২ জে এল নেহরু—গ্লিম্পসেস্ অফ ওয়াল্ড' হিস্ট্রি, পৃ ৫১

১৩ এ এস্ অল্টেকার—স্টেট অ্যাণ্ড গভর্নমেন্ট ইন্ অ্যাসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ ১০২

১৪ এম পি ভি কানে—হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, পৃ ৩৬

১৫ এইচ রায়চৌধুরী—পলিটিকাল হিস্ট্রি অফ অ্যান্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ ১৭৩ ১৭৫

১৬ এ এস অলটেকার—স্টেট অ্যাণ্ড গভর্নমেন্ট ইন্ অ্যান্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ ৯৩

১৭ এ কে সেন—স্টাডিস্ ইন্ হিন্দু পলিটিক্যাল থট, পৃ ৯৯

১৮ ঐ, পৃ ৮২

১৯ ঐ, পৃ ৮৫

২০ বি জি গোখেল—ইণ্ডিয়ান থট থ্রু দি এজেস্, পৃ ১৬৩

২১ ইউ এন্ ঘোষাল—এ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, পৃ ৫৪১

# ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নগর বিন্যাস ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

অনিরুদ্ধ রায়

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপীয় পরিব্রাজকদ্বয়, পিরেস ও বার্বোসা[১] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙলা বণিকদের জয়যাত্রার পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছেন। রাজধানী গৌড় ও বন্দর সপ্তগ্রাম তখন সমৃদ্ধির শিখরে—বাঙলার স্বাধীন সুলতানাৎ-এর অবিভক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বাঙলার এই রাজধানীর পশ্চাদভূমি সুরক্ষিত করে রেখেছে। হোসেন সাহী বাঙলায় চৈতন্যর জোয়ারে "শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়।"

বখতিয়ার খলজীর ঘোড়সওয়ারের পদধ্বনির সাথে সাথে বাঙলার নগরবিন্যাস একটা রূপ নিতে আরম্ভ করে। রাজধানী বার বার স্থানান্তরিত হবার সঙ্গেই নূতন রাজধানী ও শহরের পত্তন হয়। কিন্তু বরাবরই তার ভাগীরথীর কূলে অবস্থান—সমকালীন লেখায় বঙ্গ বলতে যদি পূর্ব বঙ্গকে বোঝায়, তাহলে সোনারগাঁওয়ের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বছর এর বিদ্রোহের ইতিহাস ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই বলে বলা হয়। অধ্যাপক মহম্মদ হাবীবের ইসলাম ও শহরের অভ্যুত্থান পূর্ববঙ্গকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি॥"

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মাহমুদ শাহ'র পরাজয় ঘটে শের শাহ্‌র হাতে যখন থেকে বাঙলা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার পদানত হয়। ১৫০২ সালে ইসলাম শাহ্‌র মৃত্যুর পর, মহম্মদ শাহ্ গাজী সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। এর পরের সত্তর বৎসর শুধু লড়াইয়ের ইতিহাস—উড়িষ্যার রাজা, আফগান, মোগল এবং বাঙলার সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা দখলের হাঙ্গামা। এই অবিরাম লড়াই, যা প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুটো দশক অবধি চলে, সপ্তগ্রাম ও গৌড়কে অনেকখানি পঙ্গু করে রাখে। সপ্তগ্রাম-গৌড় এর পশ্চাদ-ভূমি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার টানাপোড়েনের ফলে সপ্তগ্রাম-গৌড় এর পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিপ্রদাস পিপলাই[২] বা পরবর্তী বিদেশী পর্যটকদের

রচনার মধ্যে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার যে ছবিটা আমরা পাই, সেটাই সপ্তগ্রামের পতনের পক্ষে যথেষ্ট নয়[৩]। বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের পতনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অপসৃয়মান রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে পশ্চাদভূমির ক্রয়ক্ষমতার ও জোগানের চাহিদা হ্রাস, বাঙলার বণিকদের ক্রমশ বিদেশে যাবার অনীহা, হুগলীর মোহানায় ক্রমবর্ধমান পর্তুগীজ রণতরীর হুঙ্কার—সব মিলিয়ে সপ্তগ্রাম-গৌড়ের আলোচনা করা উচিত।

গৌড়ের পতন ও সপ্তগ্রামের পতন সমসাময়িক, যেটা কোনরকমেই কাকতালীয় ব্যাপার নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ১৫৬৫ সালে গৌড় থেকে তাণ্ডায় রাজধানী সরানোর পর দশবছর পরে মোগল সেনাপতি আবার গৌড়ে রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে যান। শুধু নদী দূরে সরে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ বলে ধরা যায় না। বারবার বাঙলার রাজধানী স্থানান্তরিত হচ্ছে ভাগীরথীর কূল ধরে। ১৬০৮ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। এই দৃঢ় পদক্ষেপের কারণগুলো আমরা একটু আলোচনা করব। এর সঙ্গে সমকালীন নগর বিন্যাসের একটা ছবি দিতেও চেষ্টা করব॥

ঢাকা নগরী হবার আগে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পাদরী মানরিকের[৪] অমূল্য চিত্র'র আগে, পূর্ব বাঙলার শহর ও শহরতলীর কিছু কথা আমরা সমসাময়িক বিবরণে পাই। এইসব শহরের বিন্যাসের সঙ্গে গৌড় নগরের বিন্যাসের মূলগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলশ্রুতি। পূর্ববাঙলার পাঁচিলবিহীন, জলেভেজা, ছোট ছোট কসবা জাতীয় শহর গ্রামের সন্ধিস্থলে গঞ্জের কাজ করে। ফলে তাদের গঠনশৈলী ও সমাজ, গৌড়ীয় শৈলী ও সমাজ থেকে পৃথক॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে লেখা বিপ্রদাসের **মনসামঙ্গল** থেকে সপ্তগ্রামের মুক্ত বন্দরের চেহারা পাওয়া যায়। ১৫৩০ সালে পর্তুগীজরা যখন সপ্তগ্রামে আসে, তখনও তার অবস্থা ভালো যদিও সরস্বতী নদী মজে আসছে। পর্তুগীজরা বড় জাহাজ বেতড়ে থামাচ্ছে যেটা নিতান্তই বাণিজ্যের পসরা নামানো-ওঠানোর সাময়িক আস্তানা। পশ্চিম ভারতে এ ধরণের জায়গা বিরল নয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে পর্তুগীজদের বেতড় থেকে ছোট নৌকা করে মাল চলাচল হত হুগলী ও সপ্তগ্রামে। সুতরাং সরস্বতীর মজে যাওয়াটা বিলম্বিত লয়ে বহুকাল ধরে চলেছে যার সঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা

মিলিয়ে পত্তনের কাজটা তরান্বিত করেছে। সুরাট বা ক্যাম্বে বন্দরে বড় জাহাজ ভিড়তে পারতো না; কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ দুই বন্দরের সমৃদ্ধি ঐ কারণে ব্যাহত হয়নি ॥

১৫৩৮ সালে শের শাহের সেনাপতি খাবাস খান যখন গৌড় দখল করেন, তখন পর্তুগীজদের কাছে গৌড়ই বাঙলার প্রধান নগর। ২০০,০০০ পরিবার, লম্বা, প্রশস্ত পথ—তা সত্ত্বেও লোকের ভীড়ে পথচলা দুরূহ। অধিকাংশ বাড়ীই বড় ও সুন্দরভাবে তৈরী[৫] এমন কি ১৫৭০-এর দশকে ফরাসী লব্র[৬] একে বাঙলার প্রধান শহর বলছেন। পূর্ণিমায় সহরে জল ঢোকে ও অমাবস্যায় নৌকা চালানো কষ্টকর। রাজা কাঠের তৈরী প্রাসাদে বাস করেন। ৪০,০০০ বাসা আছে। বহু বিদেশী বণিক—রাশিয়ান, জর্জিয়ান, চীনা—ব্যবসা করে। র্যাভেনশ[৭] বা আবদুল লতিফের গৌড়ের ধ্বংসস্তুপের বর্ণনা থেকে মসজিদ, হামাম, সরাইখানা, প্রকাণ্ড দুর্গতোরণ (যা এখনও দাঁড়িয়ে আছে), চার পাশের উঁচু পাঁচীল ইত্যাদি পাই যার সঙ্গে উত্তর ভারতের ইসলামীয় নগর বিন্যাসের[৮] কিছু সাদৃশ্য আছে। ফরাসী পরিব্রাজকের বর্ণনায় সপ্তগ্রামের বিন্যাস গৌড়ের কাছাকাছি যদিও কোন ধ্বংসস্তুপ পাওয়া যায় না কাছাকাছি পাণ্ডুয়া (হুগলী) ছাড়া। সপ্তগ্রামে পর্তুগীজদের একটা দুর্গ আছে। গঙ্গার থেকে ছোট একটা নদী দিয়ে যেতে হয়—অর্থাৎ সরস্বতী মজে এসেছে। চাল, ভালো কাপড়, চিনি ও অন্যান্য মশলা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর বিশ বছর আগে জয়ানন্দ[৯] বণিকের ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে সোনা, হীরা, মুক্তা, মনোহর ছবি ও প্রচুর পট্টবস্ত্রের কথা বলছেন। আর একদশক পরে মুকুন্দরামের[১০] রচনায় সপ্তগ্রামে বহু বণিকের কথা পাওয়া যায়। ততদিনে "সপ্তগ্রামের বেনে কোথাও না যায়। ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানাবিধ পায় ॥"[১১] রাঢ়'র প্রতি মুকুন্দরাম বিরূপ হলেও, সপ্তগ্রামকে "অতি অনুপম" বলেছেন। ততদিনে সমুদ্রের মোহানায় পর্তুগীজদের ডাকাতি—"ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে" ॥[১২]

ভাগীরথীর কূলে চৈতন্যর সমকালীন নবদ্বীপের যে চেহারা পাওয়া যায়, তা গৌড়ের মতন নয়, এমনকি সপ্তগ্রাম বা হুগলীর চেহারার থেকেও আলাদা। নবদ্বীপ বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র এটা কেউই বলেন নি। আশেপাশের গ্রামের দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও, বারাণসী বা তিব্বতের কিছু কিছু জিনিস আসছে[১৩] যদিও পরিমাণ কম। অর্থাৎ যাকে ফিরিওয়ালার পসরা বলে, কিছু নির্দিষ্ট লোকের জন্যে নিয়ে আসা, এটা সেই। গৌড়ের প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে

সারিবদ্ধ দোকানে সাজানোর ব্যাপার নয়। শান্তিপুরকে সমসাময়িক কবিরা শহর পর্যন্ত বলেন নি। এসব শহরে কোন পাঁচীল শহরকে ঘিরে নেই, কোন সরাইখানা বিদেশী বণিক বা পর্যটককে স্বাগত জানায় না। কিন্তু কোন কোন বাড়ী বড়, পাঁচীল আছে এমনকি বিরাট তোরণদ্বার পর্যন্ত আছে। দৌলতের উপরে শ্রেণীবিভাগ পরিষ্কার হয়ে আসে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বিলাসী দ্রব্যের ব্যবহার।

বখতিয়ার খলজীর সময় থেকে বা **তবাকত-ই নাসিরির**[১৪] লেখকের রচনা থেকে আমরা উত্তরবঙ্গের এক সমৃদ্ধশালী জনপদমালা দেখি যার বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। দেবিকোট, মালদা, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা—প্রায় একই ধাঁচের। চারপাশে পাঁচীল, বড় দরজা, হয়ত একটা মাদ্রাসা বা টাঁকশাল, কোন গাজীর সমাধি বা সরাইখানা—সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে একটা অর্থনৈতিক দ্যোতক। এই জনপদমালার নাগরিক সভ্যতার মূলে ছিল সপ্তগ্রাম বন্দর ও বাঙলার একটা রাজনৈতিক কাঠামো। চালিকাশক্তি গৌড়—এরা তারই সহযোগী নাগরিক সভ্যতার স্মৃতি বহন করছে। পরবর্তী সময়ের মঙ্গলকাব্যে বা চৈতন্য কাব্যে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি পাই, সেটা এই ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে। ততদিনে এই সভ্যতার প্রসার সমুদ্রাভিমুখী—ক্রমশ ভাগীরথীর মোহানায় আসছে। এই প্রসার ও পরিবর্তন ঘটতে সময় লেগেছিল একশ বছরের কিছু বেশী। ১৫৫০-এর দশকে ইসলাম শাহ'র মুদ্রা সপ্তগ্রাম টাঁকশালের শেষ মুদ্রা। এর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক কুঠি বানায় ভাগীরথীর তীরে শাহজাহানের ফর্মানের জোরে আর হার্মাদকে ডিঙিয়ে। কিন্তু এই একশ বছরের আর একটা সভ্যতার ইতিহাস আছে—সেটা হোলো জলেভেজা পূর্ব-বঙ্গের ছোট ছোট শহর ও প্রায় স্বাধীন জমিদারদের উপেক্ষিত ইতিহাস। এই ইতিহাস পূর্ববঙ্গের খাল বিল্ল আর মাঠে মগ, পাঠান, মোগল, হিন্দু ও পর্তুগীজদের লড়াইয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস যেটা ভাগীরথীর তীরের সমৃদ্ধ জন-পদের চৈতন্যের ধর্মের লড়াই নয়। এ লড়াই জীবন-মরণের—সারা সমাজের সঙ্গে আরো অনেক ওপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ঐ ইতিহাসের পাতায় যাবার আগে বোধহয় আমাদের মনে করা উচিৎ যে ভাগীরথীর কূলের যে ছোট শহর তার বৈচিত্র্য কি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঐ সব শহরের—নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, খড়দহ ইত্যাদি—এমন কোন পাঁচীল নেই যা চারপাশের গ্রামীণ সভ্যতাকে সরিয়ে রাখে। শহর ও

গ্রামের মধ্যে কোন বিসংযোগকারী রেখা নেই। এছাড়াও আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ভাগীরথীর কূলের শহরের মালিক বা ইজারাদার বা এমনকি কোন স্থানীয় নেতার নাম পাওয়া যায় না। জমিদারের নাম তো নেই। এর থেকে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে এই সব শহরের কর্তৃত্ব অনেক আলগা ছিল। এর সঙ্গে এটাও বলা বোধ হয় অস্বাভাবিক হবে না চৈতন্য বা তার পরবর্তী মতবাদের এসব ধরনের শহরে যে রকম প্রকাশ পেয়েছিল অন্য কোন ইসলামিক শহরে সে রকম পায়নি। একেবারে শহর বলতে যেরকম বোঝায় —গৌড় বা সপ্তগ্রাম—অথবা সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল—সেরকম জায়গায় চৈতন্যর পদ-সঞ্চার কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক। শহর ও গ্রামের সীমারেখা না থাকার ফলে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীন আচার ব্যবহারের মিশ্রণ পরিষ্কার। এই মিশ্র সভ্যতার বিকাশ লোকজনদের আচারে, ব্যবহারে, খাওয়াদাওয়া, পাটের কাপড়ের চলন রেশমের পরিবর্তে এমনকি মাছমাংস বর্জনের মধ্যেও দেখা যায়।[১৫] তাই আমাদের অবাক লাগেনা যখন দেখি ভাগীরথীর তীরে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য কেবলই ব্যাপারী ও বণিকের কথা বলে, তাদের বর্ণনাপূর্ণ জীবনযাত্রার উপর লক্ষ্য—চাষী বা জমিদার উপেক্ষিত। সুতরাং ভাগীরথীর তীর ধরে ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল সেটার প্রমাণের প্রয়োজন নেই। পূর্ববাংলার মাটিতে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার নেতা আধা-স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও জমির সঙ্গে সম্পর্ক তার গভীরে। ভাগরথীর তীর জল এর পলিমাটি, নৌকা আর বণিকের মানদণ্ড উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে রাজ-নৈতিক অস্থিরতা আর সৈন্যদলের পদহুঙ্কারে যখন দুই তীর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তখনই শুরু হয় কোন কোন রাজকর্মচারীর উত্থানের চেষ্টা—জমি ও প্রজা দখল করার লড়াই। মুকুন্দরামের অবিস্মরণীয় বর্ণনায় ডিহিদার মাহমুদ শরীফের[১৬] ঐ প্রচেষ্টার কথা বলা আছে। বলা বাহুল্য মুকুন্দরাম একা পালাননি—আরো বহুলোক দেশত্যাগী হয়েছিল। পূর্বাঙলার ঐ সময়কার ইতিহাস ঐ দেশত্যাগীদের ইতিহাস।

## ২

রাঢ় অঞ্চলের শহর ও গ্রামাঞ্চলের অবনতির কথা মুকুন্দরামের রচনায় পাওয়া যায়। টাকার মূল্য কমে দশ আনা হয়েছিল ; খাজনা দেবার জন্য চাষীরা গরু ও জমির ফসল বেচছে ; পিয়াদা দরজা চেপে বসে আছে যাতে

কেউ না পালাতে পারে ; স্থানীয় মহাজন বন্দী এবং জমি জরীপ করা চলছে[১৭]। ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে মোগলরা রাজা টোডরমলের বন্দোবস্তে জাবতী প্রথা চালানোর চেষ্টা করছে। শতাব্দীর শেষদিকে অবশ্য তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়েছিল যদিও কিছুদিন পরে আবার জরীপের কাজ শুরু হয়[১৮]। মীরজা নাথান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পেশকাস দেবার কথা বলছেন।[১৯]

মুকুন্দরাম বীরভূমে এক জমিদারের আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন এবং বোধ হয় ওখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জমিদারের সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়েছেন[২০]। জমিদার প্রজা বসাতেন ও পাট্টা দিতেন। প্রজাদের তাকাভী ঋণ, বীজ এমনকি গরু বেঁধে নিয়ে যাবার দড়ি পর্যন্ত দিতেন। গুজরাট পরিপত্তনের কথা মুকুন্দরাম বলেছেন। তার মধ্যে এটাও আছে যে চাষীরা আবার প্রজা বসাচ্ছে, যার মধ্যে শিক্ষিত কায়স্থও আছে। উল্লেখযোগ্য যে কবি প্রথমেই মুসলমানদের বসানোর কথা বলেছেন। অর্থাৎ যেখানে নূতন পত্তনী গড়ে উঠছে সেখানে জমিদার শুধু মালিকের কাজ করছেন না মহাজনের কাজও করছেন। ঐ সব জমিতে খুদকাস্থ ও পাহীকাস্ত উভয় ধরনের প্রজার কথা বলা আছে। ফসলে প্রজার স্বত্ব কত এটা অবশ্য জানা যায় না। তবে জমিদাররা যে বিভিন্ন ধরণের কর আদায় করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলে পত্তনী প্রজার খাজনা তিন বছর মকুব করা হলেও তার জীবন খুব সুখের ছিল এটা মনে হয় না।

অবশ্য এটা মনে করা উচিত হবে না যে সপ্তগ্রামের পতন অকস্মাৎ হয়েছিল বা হঠাৎই জনশূণ্য হয়ে পড়ে। ১৫৬৫ সালে বিদেশী পরিব্রাজক সিজার ফেড্রারিক[২১] একে যে কোন "মূর" শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায় বলেছেন। এর বন্দরে তখনও প্রতি বছর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ছোট বড় জাহাজ চলে, কাপড় ইত্যাদি নিতে আসে। দশ বছর পরে ফরাসী পরিব্রাজকও প্রায় একই কথা বলেছেন। হুগলী অবশ্য তখনও ওঠেনি। মুকুন্দরাম হুগলীর আশেপাশের গ্রামের কথা বললেও হুগলীর কোন উল্লেখ করেননি। পরবর্তী দশকে র‍্যালফ ফিচ[২২] হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যেকার জায়গা জনশূণ্য দেখেছেন—পথে ডাকাত ও বনজন্তুর সম্মুখীন হয়েছিলেন।

হুগলী তখনও উঠেনি, গৌড় প্রায় জনশূণ্য, সপ্তগ্রাম নিবে আসছে—এ সময় ক্ষমতা স্বভাবত বিকেন্দ্রিত হয়েছিল। এই বিকেন্দ্রীকরণ আমরা ছোট ছোট হাটবাজার ভাগীরথীর কূলে দেখি। ফেড্রারিক, অন্যান্য বণিকদের মত, নৌকো করে ভাগীরথী ধরে উঠানামা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় হাটের

সওদা করে। ফিচও এক এক জায়গার সাপ্তাহিক হাটের উল্লেখ করেছেন। গৌড়ের পতনের পর আর কোন বড় শহর না থাকায় কেন্দ্রাভিমুখী যে শক্তি বাঙলার উৎপাদনকে টেনে নিয়ে আসছিল এখন তা বিভিন্ন জায়গায় বিকেন্দ্রীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু না থাকায় এটা আরো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছে।

৩

পর্তুগীজ জোয়া দ্য ব্যারোস[২৩] (মৃত্যু ১৫৭৫)-এর অসাধারণ মানচিত্রে সুন্দরবন এলাকায় অন্তত পাঁচটি শহরের নাম পাওয়া যায়। গৌড়ের পতনের পর ঐ এলাকায়—বিশেষতঃ পূর্বঙ্গের ভাটি অঞ্চলে শহরভিত্তিক সভ্যতা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। গত তিন দশকের অবিরাম লড়াইয়ের ফলে রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা পূর্বঙ্গে আসতে থাকে—ফলে পূর্বঙ্গের পত্তনী জোরদার হয়। দায়ুদের পতনের পর (১৫৭৫) কি করে তার মন্ত্রী শ্রীহরি দায়ুদের ধনরত্ন নিয়ে যশোহরে (কাডার) পালিয়ে আসেন তার বর্ণনা আবুলফজল **আকবর নামায়**[২৪] দিয়েছেন। ১৫৯৯ সালে জেসুইট পাদরীরা যখন গীর্জা বানানোর জন্য যশোহরে আসেন, তখন চ্যাণ্ডেকানের জমিদার প্রতাপাদিত্য সবথেকে পরক্রমাশালী নেতা[২৫]। ১৬০০ সালের বার্থিয়াসফর মানচিত্রে দেখা যায় যে চ্যাণ্ডেকান ভাগীরথীর কূল স্পর্শ করেছে[২৬]। ঈশ্বরীপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তার সাক্ষী বহন করছে।

দায়ুদের পতনের পর পূর্ববাংলার আর একজন জমিদার পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। ১৫৮৩ সালে মোগলদের কাছে ঈশা খান হেরে গেলেও, ১৫৮৬ সালে যখন ফিচ তাঁর সঙ্গে সোনারগাঁওতে দেখা করেন, তখন তিনি মহাপরাক্রম-শালী ও খ্রীস্টানদের বন্ধু। পূর্বাংলার আরো কয়েকজন জমিদারের নাম 'বারোভূঁইয়ার' মধ্যে ধরা হয়। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের কেদার রায়, বাকলার রামচন্দ্র রায় (প্রতাপাদিত্যের জামাই), ভূষণার সত্রাজিৎ রায় ইত্যাদি বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।[২৭]

এদের রাজধানী গৌড়, হুগলী বা সপ্তগ্রামের মত নয়। ফিচ[২৮] বাকলা শহরের বর্ণনা দিয়েছেন। একটা বড় রাস্তার দুপাশে বড় বাড়ী—এটাই শহর। প্রচুর চাল আর কাপড়ের আড়ৎ। মেয়েরা গলায় ও পায়ে রূপোর গহনা পরে যার মধ্যে তামা ও হাতীর দাঁত বসান। সেকালের রূপো, হাতীর দাঁত ও তামার উচ্চ দামের কথা মনে রাখলে বোঝা কঠিন হবে না যে

বাণিজ্যের বিনিময়ে এগুলো আসছে এবং কয়েকটি লোক, যাদের বড় বাসা পথের দুধারে, তারা এগুলো ব্যবহার করছে ॥

এই সমৃদ্ধি অবশ্য চাল ও কাপড়ের বাণিজ্যের উপরে চলছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে পূর্ববাংলার নূতন পত্তনী ও চাল-কাপড়ের বর্ধিত উৎপাদনের উপরে এর ভিত্তি। ফিচ শ্রীপুরে প্রচুর চাল ও কাপড়ের আড়ৎ দেখেছেন। বারো মাইল দূরে, সোনারগাঁওকে তিনি সবথেকে ভালো কাপড়ের জায়গা বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানকার বিরাট কাপড়ের ব্যবসা সমগ্র ভারতবর্ষ, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। এখানে বহু ধনী ব্যক্তিকে তিনি দেখেছেন যারা মাছমাংস খায় না। উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন পাঁচীল দেখেন নি শহরকে ঘিরে। বাড়ীগুলিও ছোট—দরজা জানালা করা আছে রাত্রে বাঘ বা শিয়ালকে ঠেকানোর জন্য।[২৯]

ভাগীরথীর কূলে আমরা নবদ্বীপ ইত্যাদি যে শহরগুলি দেখেছি, তাদের সঙ্গে এখানকার মিল আছে। কোন পাঁচীল গ্রাম ও শহরকে বিচ্ছিন্ন করছে না। বিদেশী বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও বড় সরাই, হামাম ইত্যাদি এখানে নেই। পৌর সপ্তগ্রামের নগর বিন্যাস এর থেকে পৃথক। কিন্তু ভাগীরথীর নবদ্বীপের সঙ্গে এর অমিলও আছে ॥

পূর্ববাঙলার সমৃদ্ধির পিছনে রয়েছে কোন না কোন জমিদার যার উল্লেখ আমরা রাঢ় অঞ্চলে পাই না। ভাটির এক-একটি জমিদার অত্যন্ত ধনী এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আধা-স্বাধীনতা উপভোগ করছে। প্রতাপাদিত্য মোগল শাসক ইসলাম খানকে হাতী, নৌকা ছাড়াও, পঞ্চাশ হাজার রূপোর টাকা পাঠিয়েছিলেন[৩০]। এইসমৃদ্ধির আর একটি কারণ হতে পারে যে মোগলরা প্রথম দিকে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর এইসব জমিদারদেব খাজনা সংগ্রহ করার ভার দিয়েছিলেন। কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হবার পর মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের খাজনা সংগ্রহ করার ভার দেন। কেবলমাত্র ইসলাম খান আসার পর তিনি কঠোরভাবে পেশকাস ও ব্যক্তিগত উপস্থিতির নির্দেশ দেন যার ফলে জমিদারদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এটা করার জন্য ইসলাম খান উত্তর ভারত থেকে ভাগীরথীর কূলে না গিয়ে সোজা পূর্ববাংলায় আসেন ॥

পূর্ববাংলার সমৃদ্ধি ছিল অসমান। যাতায়াতের দুর্গমতা ছাড়াও ছিল জমিদারদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যার ফলে পূর্ববাঙলার শহরগুলোর প্রসারের ফল ছিল ভিন্ন। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার পথ অত্যন্ত দুর্গম ও

বিপৎসংকুল। সমকালীন জেসুইট পাদরীদের চিঠি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে আসে। পাদরী ফার্নাণ্ডেসের ২২শে ডিসেম্বর ১৫৯৯[৩১] এর চিঠি থেকে জানা যায় যে শ্রীপুর থেকে চ্যাণ্ডেকানে নৌকা করে যাবার সময় বহুবার দস্যুদের হাতে আক্রান্ত হন। ২০শে জানুয়ারী ১৬০০[৩২] সালের পাদরী ফনসেকার লেখা চিঠি থেকে জানা যায় যে বাকলা থেকে চ্যাণ্ডকানে নৌকা করে যাবার সময় একধারে ঘন জঙ্গল ও অন্যধারে ধান ও আখের ক্ষেত দেখেছেন। নদীর পাড় ধরে একটা বাঘ বহুক্ষণ নৌকার সঙ্গে আসছিল। এমননকি জঙ্গল কেটে পত্তনী করার দৃশ্যও তিনি দেখেছেন ॥

ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রগুলিতে, এমনকি ১৬৬০ সালের ভ্যানড্যানব্রুকের মানচিত্রে পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে যে ভাগীরথীর তুলনায় পদ্মার জল অনেক বেশী, অর্থাৎ ঐ মানচিত্রগুলিতে ভাগীরথীকে অনেক ছোট করে দেখান হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৬৩০ সালের ঢাকা ছাড়া আর কোন বড় শহর পূর্ববাংলায় চোখে পড়ে না। কারণ হিসাবে বলা যায় যে পূর্ববাংলায় কোন কেন্দ্রীয় শক্তির প্রসার ঐ সময়ে ঘটে নি। ফলে কসবা বা গঞ্জ শহরগুলো জমিদারী শক্তির উৎসে পরিচালিত হয়ে ছোট ছোট দ্বীপের মতন আত্মপ্রকাশ করছে। রাঢ়ের গৌড়ীয় শক্তির প্রভাবে যে চলমান জনপদ-গুলি তৈরী হয়েছিল, ভাটি অঞ্চলে তা বিরল। অর্থাৎ পূর্ববাংলার গঞ্জ শহরে চারপাশের একটা সীমানা আছে যার মধ্যে গড়ে উঠেছে বাণিজ্যের ও স্থানীয় শাসনের কেন্দ্রস্থল জমিদার পরিবারবর্গের দাক্ষিণ্যে। দুটি অঞ্চলের মধ্যে তাই অসমান প্রগতি।

## ৪.

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই পর্তুগীজরা বাংলায় রাজনৈতিক প্রাধান্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে আবুলফজল বলেছেন যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী বন্দর দুটি পর্তুগীজদের হাতে ছিল। বলাবাহুল্য আকবরের ফর্মান পাবার পর পর্তুগীজদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং মোগলরা যে আফগান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের কাজে লাগানোর জন্য এই নীতি নিয়েছিল তা প্রতাপ ফিরেঙ্গীর মোগল মীর নাজাফকে রক্ষার ঘটনা থেকে বোঝা যায়। মুকুন্দরামের রচনা বা জেসুইট পাদরীদের চিঠি থেকে মনে হয় যে মোহানার পর্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে হুগলীর পর্তুগীজদের বিশেষ যোগাযোগ নেই ॥

এই উপকূলবর্তী বোম্বেটে পর্তুগীজদের ঠেকানোর জন্য পূর্ববাংলার জমিদাররা মোগল সম্রাটের মতই খ্রীষ্টানদের বন্ধু ছিলেন। তারা শুধু পর্তুগীজদের নিজদের সৈন্যদলে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে নিয়েছেন তাই নয় বাৎসরিক খাজনার বিনিময়ে জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বেশ কিছু পর্তুগীজ অত্যন্ত ধনী ও শক্তিশালী ছিল, যারা জমিদারদের চাপ দিত পাদরীদের নানারকম সুবিধা দেওয়ার জন্য। তাই দেখি ঈশা খান ও বাকলার রামচন্দ্র রায় পাদরীদের বিশেষ বন্ধু[৩৩]। প্রতাপাদিত্য আরো একধাপ এগিয়ে তাঁর রাজ্যে গীর্জা বসানোর অনুমতি দেন। এমনকি গীর্জার চারপাশের প্রজাদের খাজনা দেবার আদেশ দেন[৩৪]। কিন্তু এর ফলে জমিদারীর মধ্যে আফগান-পর্তুগীজ বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং রীতিমত দাঙ্গার কথাও পাওয়া যায়॥[৩৫]

এই সময়ই শুরু হয় আরাকান রাজ্য প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা। আরাকান রাজ মঙ ফেলুভ (১৫৭৯-৯৩) সমগ্র চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার একটা অংশ দখল করে নেন[৩৬]। মোকাবিলা করার জন্য, মোগলরা সন্দীপ দ্বীপ দখল করে। মঙের পুত্র সেলিম শাহ সন্দীপ আক্রমণ করলে কেদার রায় ও তার পর্তুগীজ কাপ্তান কার্ভালোর হাতে পরাজিত হয়। ক্রমাগত আরাকান আক্রমণ থেকে ঠেকানোর জন্য, কিছু কিছু জমিদার আরাকানদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেন। প্রতাপাদিত্য ঐরকম চুক্তির ফলে কার্ভালোকে হত্যা করলে পর্তুগীজ প্রাধান্য হ্রাস পায়[৩৭]। ১৬৩২ সালে শাহজাহানের আক্রমণে মোগলরা হুগলী নিলেও উপকূল এলাকায় আরাকান ও পর্তুগীজ দস্যুতা অব্যাহত ছিল। ১৬০৪ সালে পাদ্রী মানরিক ঐসব উপকূল এলাকা প্রায় জনশূণ্য দেখেছিলেন।[৩৮] এর ফলে বোঝা অসুবিধা হবে না যে ইসলাম খাঁর বিজয় অভিযানের পর ভাগীরথীর কূলে যখন শান্তি নেমে আসে, তখন পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা আবার ভাগীরথীর তীরে চলতে শুরু করে। সুতরাং রাজনৈতিক ও সামরিক কারণের জন্য একশো বছরের মধ্যে অধিবাসীরা স্থানান্তরিত হয়॥

সমকালীন খাজনার হিসাব[৩৯] থেকে এই সময়কার শহরগুলির একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। ১৫৯৫ সালের পর থেকে বাংলার খাজনার পরিমাণ বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আবুলফজল ঐ সময়ে খাজনার পরিমাণ ২৫ কোটি দাম ধরেছেন, যেটা পূর্বতন আফগান নথী থেকে নেওয়া, কারণ আবুলফজলের সময়ে বাংলার সব জায়গা মোগল

অধিকারভুক্ত হয় নি। এর ফলে পরবর্তী সময়ের খাজনার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি বলে মনে হয়। এ ছাড়াও ইসলাম খানের কড়াকড়ির ফলে খাজনা বেড়েছিল সেটাতে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। ১৬৩২ সালে পাদ্রী মানরিক ৩৬ কোটি দামের উপর খাজনা ছিল বলেছেন যেটা সমকালীন রাজ দরবারের লেখক বিয়াজিদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। সুতরাং মোগল শাসনে বাংলার সামাজিক উদ্বৃত্ত বাড়ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খাজনা কোন সময়েই মোগল সাম্রাজ্যের শতকরা পাঁচভাগের বেশী নয়॥

আবুলফজলের হিসাব যে পূর্ববর্তী আফগান সময়ের সেটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর শহরগুলির জমা ধরলে। প্রতি বর্গ মাইলে গৌর সরকার ও শরিফাবাদ সরকারের জমা সবথেকে বেশী যথাক্রমে ১০·৬ ও ১০·৭। শরিফাবাদ সরকার ভাগীরথীর পশ্চিমপারে যেখানে যুদ্ধ বেশী হয় নি। এর তুলনায়, বাকলা, সোনারগাঁও ও সপ্তগ্রামের জমা যথাক্রমে ৩·৫, ২·৬ ও ৩·০। সপ্তগ্রাম নিবে আসছে বোঝা যায়—কারণ উঠতি বাকলার সঙ্গে তার সমতা আছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পূর্ববাংলার সমুদ্রকূল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে। একেবারে সমুদ্রউপকূল অবশ্য অনেক কম। খালিফাবাদ সরকারের জমা ১·০॥

এ সবের মধ্যে আবুলফজলের হিসাব অনুযায়ী গৌড় শহরের জমা সবথেকে বেশী যদিও প্রায় বিশ বছর আগে গৌড় জনশূণ্য হয়ে গেছে। পরিস্কার বোঝা যায় যে আবুলফজলের হিসাব দায়ুদ কাররাণী আমলের। গৌড়ের জমা আট লক্ষ দাম এবং যশোরের দুই লক্ষ দাম। সুতরাং ১৫৭৫ সালে শ্রীহরি যখন যশোহরে পালান তখন সেটা একেবারে ছোট শহর ছিল না। সোনারগাঁও সে তুলনায় অনেক কম—অর্ধলক্ষ দাম। অর্থাৎ সোনারগাঁওয়ের পরবর্তী উত্থান ইশাখাঁর উদ্যোগে হয়েছে। রংপুর ও ঘোড়াঘাটের জমা যশোহরের সমান॥

এরমধ্যে যশোহরই পরাক্রমশালী হয়ে উঠে যার জন্য এর জমিদার প্রতাপাদিত্যকে দায়ী করা যায়। বহু বিদেশী বণিক ও পর্তুগীজদের আস্তানা থাকায় পাদ্রীরা এখানেই প্রথম গীর্জা তৈরী করেন। মোগল আক্রমণের ফলে প্রতাপাদিত্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে যায় ও তাঁর পতন তরান্বিত হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারের জমা বাংলার মধ্যে প্রতি বর্গমাইলে সবথেকে

বেশী এবং জমা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৫৯৫ থেকে ১৬০৭-এর মধ্যে মান্দারণের জমা দ্বিগুণ হয়ে যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ভাগীরথীর কূলের একটা অংশ এদিকে চলে আসে ॥

এদিক থেকে বিচার করলে পূর্ববাংলার জমা আরো বাড়া উচিত ছিল। কয়েকটি জায়গা ছাড়া, যেমন শ্রীহট্ট, এই সমৃদ্ধি আমরা দেখতে পাই না। দক্ষিণ বঙ্গ বা খলিফাবাদ সরকার ১৬৫৬ সাল অবধি সবথেকে কম জমায় ছিল। বাকলার আর কোন বৃদ্ধি চোখে পড়ে না। এর কারণ অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মোগলরা উপকূলভাগে আরাকানী আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি। ঢাকাতে মোগল রাজধানী হবার পরও ঐ আক্রমণ অব্যাহত ছিল। এটাত অবশ্য হতে পারে যে উদ্যোগী জমিদাররা আরাকানদের যে সমঝোতা করে চলেছিলেন, মোগল আক্রমণে তা ভেঙে যায়। সুলতান সুজা ১৬৩৯ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে রাজমহলে আনেন। ১৬৫৯ সালে সুজার পলায়নের পর, মীরজুমলা রাজধানী আবার ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। মোগলদের এই ব্যর্থতার একটা কারণ হয়ত যে তারা চট্টগ্রামকে ধরে রাখতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য যে চট্টগ্রামের জমা গৌড়ের সমান ছিল। কিন্তু ব্যর্থতার মূল আরো গভীরে ॥

মোগল ব্যর্থতা সুনিশ্চিত হবার পর ও রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ভাগীরথীর দিকে আবার ভারসাম্য হেলে পড়ে। ইউরোপীয় কুঠি ভাগীরথীতে স্থাপিত হবার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মুর্শিদাবাদের উত্থান শুধু সুবাদার ও দেওয়ানের ঝগড়া নয়—সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ পিছনে আছে ॥

১৫৯৫ থেকে ১৬৪৭ সালের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের খাজনা প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে যায় এবং ঐ সময়ে বাংলার খাজনা শতকরা একশ ভাগ বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় যার অধিকাংশই আসে জমি থেকে। উত্তর ভারতে ঐ জমা বৃদ্ধির সঙ্গে দামও বাড়তে থাকে[৪০] যেটা আমরা বাংলার বেলায় পাই না। অর্থাৎ বাংলার উদ্বৃত্ত যে সত্যিকারের বেড়েছিল সেটা সুজা ও শায়েস্তা খাঁনের সময় থেকে বোঝা যায়। কিন্তু এর গোড়াপত্তন করেছিল পূর্ববাংলার জলেভেজা মাটিতে কিছু আধা-স্বাধীন উৎসাহী জমিদার যারা সাহিত্য ও ইতিহাসে অমর হয়ে আছে ॥

সুতরাং বাংলার নগরবিন্যাস একই ধাঁচে নয় বা তাদের বৃদ্ধি ও পতন একই কারণে ঘটেনি। অন্তত তিনটে ধাঁচ আমাদের সামনে আসে—

ইসলামী ঢং-এর গৌড় | সপ্তগ্রাম, মিশ্র সভ্যতা কিন্তু বাণিজ্যিক প্রভাব বেশী—নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং গ্রামবাংলার সঙ্গে জড়িত মিশ্রশহর, যশোহর, সোনারগাঁ ইত্যাদি। এদের ইতিহাস ও কাঠামো আলাদা—সব শহরকেই একই ছাঁচে ফেলা কারুর পক্ষেই যুক্তিযুক্ত হবে না, বাংলার সমাজের গঠন এই নগরবিন্যাসকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে এটাই স্পষ্ট হয়ে আসে। সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলার সমৃদ্ধি আরো বেড়ে যায় যার ফলে আর এক নূতন ধরণের নগর বিন্যাসের সৃষ্টি হয় যেটা আগেকার বিন্যাস ও শৈলী থেকে পৃথক, কিন্তু তার ইতিহাস আরো রক্তাক্ত। ভাগীরথীর তীর ধরে তাকালেও ক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে তার সংযুক্তি ঘটে ॥

## টীকা

১ Tome´ Pires : *Suma Oriental,* ১৬৪১, ২ খণ্ড, ৩১, ৮৮-৯১ ; Duarte Bowhosa : *The Book,* দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫-১৪৮

২ বিপ্রদাস : **মনসা বিজয়,** সুকুমার সেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৪২-৪৩

৩ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও, Journal of Asiatic Society of Bengal, ১৯০৯, ২৪৫-২৫৮ লেখক নদী বুঁজে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৪ Sebastian Manrique : *Travels,* অক্সফোর্ড, দুই খণ্ড, প্রথম।

৫ Manuel Faria de Sousa : *History of the Discovery & Conquest of Asia by the Portuguese* (অনুবাদ), প্রথম, ৪১৬-৪১৮। এছাড়া A.F.M. Abid Ali Khan : *Memoirs of Gaur and Pandua,* কলিকাতা, ১৯৩১ দ্রষ্টব্য।

৬ Vincent Le Blanc : *Les Voyages Fameux,* প্যারিস, ১৬৪৮, ১২৫-২৬।

৭ J. H. Rowenshaw : *Gaur : Its Ruins and Inscriptions,* লণ্ডন, ১৮৭৮। এছাড়া, H Creigton এর ছবি দ্রষ্টব্য ( *Ruins of Gaur,* লণ্ডন, ১৮১৭ )·

৮ H. K. Naqvi : *Urbanisation and Urban Cenires,* সিমলা, ১৯৭২।

৯ জয়ানন্দ : **চৈতন্যমঙ্গল**, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৮, ১১-১৩ .

১০ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : **কবি-কঙ্কন চণ্ডি**, এলাহাবাদ, ১৯৬১ (Indian Press)

১১ ঐ, ৭২ ও ২০১

১২ ঐ, ২৪২

১৩ জয়ানন্দ, ১১-১৩

১৪ মিনহাজ-আস সিরাজ : **তবাকৎ-ই নাসিরী** (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯০৩, ৪১-৪৩ ।

১৫ জয়ানন্দ, ৬৪-৬৫ ।

১৬ মুকুন্দরাম, ৪-৫ ।

১৭ ঐ । জিনিষপত্রের বাজার দর, মুকুন্দরাম, ১৬১ ।

১৮ James Grant (*Fifth Report*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯১) টোডরমল্লের বন্দোবস্তে জরীপ করার কথা বলেছেন । মনে হয়, আকবরের রাজত্বের ২৫ বছর থেকে ২৮ বছর এর সময়, টোডরমল্ল যখন মুজফ্‌ফর খানের সচিব ছিলেন, তখনই জমী জরীপ করান ।

১৯ মীর্জা নাথান ! **বাহারিস্তান-ই ফয়েবী** (ইংরেজী অনুর্বাদ, বোরা) গৌহাটি, ১৯৩৬, ২ খণ্ড, প্রথম, ১০০ ; দ্বিতীয়, ৫১৭ ।

২০ মুকুন্দরাম, ৮৫ ।

২১ Caeser Fredericki (Purchas : *Pilgrims*), পঞ্চম খণ্ড, ৪১০-১১ ।

২২ Ralph Fitch (Purchas), পঞ্চম খণ্ড, ৪৮২-৪৮৩ ।

২৩ C. R. Wilson : "Note on the Topography of the river in the 16th Century from Hughli to the sea as represented in the *Da Asia* of D. C. Barros" (*Journal of Bengal Asiatic Society*, ১৮৯২, প্রথম খণ্ড, ১১০-১১১) ।

২৪ আবুল ফজল : **আকবরনামা** (অনুবাদ : H. Beveridge), তিন খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড (দিল্লী, ১৯০৩), ১৭২ । এছাড়া, নিজামুদ্দীন আহমদ : **তবাকৎ-ই আকবরী**, (বি. দে. এর অনুবাদ), এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় ৪৭৮ ।

২৫ প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে, অনিরুদ্ধ রায় : "Case Study of a Revolt in Medieval Bengal : Raja Pratapaditya Guharay of Jessore" (*Essays in Honour of Prof. S. C. Sarkar*, নিউদিল্লী, ১৯৭৬, ১৩৫-১৬৪) ।

২৬ Susan Golay : *A Series of Country Printed Maps of India*, নিউদিল্লী, ১৯৮০, ১১নং ।

২৭ তপন রায়চৌধুরী : *Bengal Under Akbar & Jahangir*, নিউ দিল্লী, ১৯৬৬, (পুনঃপ্রকাশ)।

২৮ ফিচ, উদ্ধৃত, ৪৮২।

২৯ ঐ, ৪৮৪-৮৫।

৩০ বাহারিস্তান, ১৬২।

৩১ দিয়াঙ্গা থেকে লেখা—অনুবাদ Hossen (*Bengal Past & Present*, ৩০ খণ্ড, ১৯২৫, ৫৯।

৩২ *Bengal Past & Present*, ৬৩-৬৫।

৩৩ পাদ্রী পাইমন্তার চিঠি, গোয়া, ১ ডিসেম্বর ১৬০০ (*Bengal Past & Present*, ১৯২৫, ৫২-৫৫)।

৩৪ পাদ্রী ফনসেকার চিঠি, চ্যাণ্ডেকান, ২০ জানুয়ারী ১৬০০ (*Ibid*, ৬৩-৬৭)।

৩৫ অনিরুদ্ধ রায় : উদ্ধৃত।

৩৬ A. B. M. Habibulla (*Journal of Asiatic Society of Bengal*, ১৯৪৫, ৩৩-৩৮) বলেছেন যে আরাকান প্রসারের সঙ্গে ভাটির জমিদারদের পতনের যোগাযোগ আছে।

৩৭ সন্দীপ ও অন্যান্য এলাকা নিয়ে যুদ্ধের ছবি পাওয়া যায়। Du Jarric : *Histoire des Memorable Advenues aux Indes Orientales*, ১৬০৮-১৬১৪, চার খণ্ড, Bordeux, চতুর্থ, ৮৪৮-৬১।

৩৮ পাদ্রী মানরিক, উদ্ধৃত, প্রথম খণ্ড।

৩৯ এই হিসাব শ্রীমতী সবা সামীউদ্দীনের (আলিগড়)·অপ্রকাশিত গবেষণা থেকে নেওয়া—এর জন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

৪০ ইরফান হাবিব : The Mansab System, 1595-1637 (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের পাতিয়ালা অধিবেশনে পঠিত, ১৯৬৭,) ২৩৮।

# সতেরো-আঠারো শতাব্দীর বাংলার শহর কেন্দ্র

রীলা মুখোপাধ্যায়

সভ্যতা গঠনে শহরের ভূমিকা জানতে ঐতিহাসিকরা বরাবরই উৎসাহী। কিন্তু কোন সভ্যতাই শুধুমাত্র শহরভিত্তিক হতে পারেনা। গ্রামের ভূমিকা এবং শহরের সঙ্গে তার যোগাযোগ শহরকেন্দ্রের রূপ বোঝার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়।

শহরকেন্দ্রকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়, যেমন তীর্থস্থান, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখলে শহরকেন্দ্র ও গ্রামের সম্বন্ধ বোধহয় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং আমি আলোচনা করবো প্রধানতঃ বাণিজ্য ভিত্তিক শহর, এবং আমার আলোচনা সতেরো ও আঠারো শতাব্দীর বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

শহরের গঠন সাধারণতঃ দুইভাবে দেখা হয়, যেমন শহর-গ্রাম বিভেদ, বা rural urban dichotomy, অথবা শহর গ্রাম সমপ্রসার, বা rural urban contiuum। শহর বিন্যাসের দ্বিতীয় রূপ পরিষ্কার দেখা যায় গ্রামীণ হাটের ছোট শহরে রূপান্তরে। ছোট শহর হয় পড়ে যায় বা ক্রমশঃ বড় শহরে পরিণত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় আদান প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হয় এবং তার সঙ্গে শহর-গ্রাম বিভেদের রূপ প্রকাশিত হতে থাকে।

অবশ্যই শহরের বিন্যাস আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার কিন্তু সময়ের অভাবে আমি সে আলোচনায় যাবে না, যদিও আমার মূল প্রবন্ধতে সেটা আলোচিত হয়েছে।

সতেরো ও আঠারো শতাব্দীর বাংলার শহর কেন্দ্রগুলিকে দেখলে কিছু বিশেষ জিনিষ চোখে পড়ে। প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই যে এই সময় বাংলার শহরকেন্দ্রের প্রাধান্য পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গতে সরে আসছে। মধ্যযুগে পূর্ব দিকে বাকলা, চণ্ডিকন বা সাগর, সন্দীপ এবং শ্রীপুর, যাদের বলা হয় the deltaic towns, অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। এই সামুদ্রিক শহরগুলি

বাংলার গুরুত্বপূণ বাণিজ্যপোত হিসাবে পরিচিত ছিল এবং এদের অর্থনীতি নির্ভর করতো চাল ও কাপড় উৎপাদনের উপর।

এই সব শহরের প্রাধান্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সতেরো শতাব্দীতে Manrique এদের মগেদের পীড়নের ফলে জনহীন বলে বর্ণনা করেন, এবং আঠারো শতাব্দীতে Alexander Hamilton এই শহর কেন্দ্রগুলির পড়ন্ত অবস্থার কথা বলেন।

সোনারগ্রাম এক সময় বাংলার রাজধানী এবং একটি প্রধান বাণিজ্য পোত ছিল। শহর কেন্দ্রটিরও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল চাল ও কাপড় উৎপাদনের উপর। এক সময় এখানে প্রচুর ব্যবসায়ী ও ধনীরা বাস করতেন এবং শোনা যায় যে নিকটবর্তী দালালপুরে প্রায় দেড় হাজার তাঁত শিল্পজীবি পরিবার বাস করতেন। ১৬০৮ সালে ঢাকায় বাংলার রাজধানী সরে যাবার পর এই শহরের খ্যাতি বিশেষভাবে আঘাত পায়। আঠারো শতাব্দী অবধি ইংরাজ কোম্পানী এখানে প্রায় এক লক্ষ টাকার বাণিজ্য করেন, তবে ক্রমশঃ বাংলায় সোনারগ্রামের প্রাধান্য কমে যায়।

ঢাকা এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর। ঢাকার উৎপত্তি কিছুটা সোনারগ্রামের অবনতির ফলে। বিভিন্ন সময় বাংলার রাজধানী, বাংলায় ঢাকা শহরের গুরুত্ব, তার প্রাসাদের শৌর্য, তার বাণিজ্যের বিপুল প্রসার তার শিল্প উৎপাদনের এবং জনসমাগমের বৈচিত্র্য তার বর্ণনা বহু বিদেশী পর্যটকেরা দিয়েছেন। আঠারো শতাব্দীর প্রথম দিকে Hamilton ঢাকার প্রাচুর্য কিংবদন্তীর গৌড়ের গৌরবের সঙ্গে তুলনা করেন।

আঠারো শতাব্দীর শেষের ভাগে Louis Laurent Fedebe. Count of Modakc ঢাকার অবনতির কথা বলেন। এর কারণ অনেক, একটি হোলো যে আঠারো শতাব্দীতে মগ সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে যায় বাংলার এই অঞ্চলে। আরেকটি বড় কারণ হোলো যে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি কাপড়ের বাণিজ্য প্রধানতঃ পশ্চিম বাংলায় করতে থাকেন। এইভাবে বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রাধান্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাওয়ার সঙ্গে আরো একটি ঘটনা সূত্র দেখা যায়। মুঘল বাংলার দেওয়ান মুর্শীদকুলি খাঁ ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদকে তাঁর রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেন।

পশ্চিম বাংলায় এই সময় নানা শহরকেন্দ্র দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরীক বাণিজ্যপোত। এইসব শহরকেন্দ্র বেশীর ভাগ হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কারণ তার বিভিন্ন শাখা নিয়ে হুগলী নদী ছিল

এই সময় বাংলার প্রধান জলবাহী বাণিজ্যের পথ। এদের মধ্যে প্রধান শহর কেন্দ্র ছিল হুগলী শহর এবং কলকাতা। তাছাড়া হুগলী নদীর তীরে নানা ইউরোপীয় বসতি এই সময় দেখা যায়, যেমন বরানগর, শ্রীরামপুর, বাঁকি বাজার, চন্দননগর, চুঁচড়া এবং ব্যাণ্ডেল।

আরো ভেতরে আমরা দেখি মুর্শীদাবাদ এবং কাশীমবাজার সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। আরো উত্তরে মালদা, রাজমহল ও পাটনা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। সতেরো ও আঠারো শতাব্দির বিদেশী পর্যটকেদের শেষ থেকে এই সব শহর কেন্দ্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য, সমৃদ্ধি ও জনসমাগমের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বাংলার শহর কেন্দ্রের সম্বন্ধে একটি দ্বিতীয় বিষয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বিষয়টি হোলো এই শহর কেন্দ্রদের অপরিকল্পিত গঠন। বিদেশী পর্যটকেরা, বিশেষ করে ফরাসীরা, এটি বারবার উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে বাংলার শহরকেন্দ্র ক্ষণস্থায়ী। শাসন কেন্দ্র,বাণিজ্য কেন্দ্র বা উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে শুরু হলেও এই কেন্দ্রদের শক্তি যোগায়নি রাজ-নৈতিক প্রভাব থেকে বিমুক্ত হওয়ার, বা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। এটি আমরা বারবার বাংলার শহরকেন্দ্রের ইতিহাসে দেখি, যেমন সাগর, সোনারগ্রাম, ঢাকার বিষয়। বিখ্যাত ঢাকা তার মর্যাদা হারায় রাজধানী মুর্শীদাবাদে ১৭০৪-১৭০৫ সালে চলে যাওয়াতে।

পশ্চিম বাংলায় আঠারো শতাব্দিতে Tieffarthaler ও Modare-এর লেখাতে জানতে পারি হুগলী তীরের ইউরোপীয় বসতিদের অবনতির কথা। এই অবনতির কারণ কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং পসার।

আঠারো শতাব্দির শেষ অবধি মুর্শীদাবাদের সমৃদ্ধি কিছুটা থাকে, কাশীম-বাজারের উনিশ শতাব্দি অবধি। Manrique যখন রাজমহল দেখেন সতেরো শতাব্দিতে রাজমহল তখন অতি শক্তিশালী শহর। রাজধানী ঢাকায় চলে যাবার পর রাজমহলের ভগ্নাবশেষের বর্ণনা করেছেন John Marshall ১৬৬৮-৭২ সালে তাঁর পর্যটনকালে। Peter Meendy সতেরো শতাব্দিতে পাটনার গৌরবের কথা বলেন। ১৭৭০ দশকে Modare-এর এবং ১৭৮০ সালে Forster-এর, উল্লেখে একশো বছরে এই শহরের গৌরব বিলীন হয়ে গেছে বলে জানা যায়। Modare-এর বিবরণের বিশেষ গুরুত্ব এই যে তাঁর লেখাতে বাংলায় মুঘলযুগে শহর সভ্যতার বিলুপ্তির বা de-urbanisation-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলার শহর কেন্দ্র ক্ষণস্থায়ী হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক। নদী বিধৌত জমি, যার উপরে এই শহর কেন্দ্র সব গড়ে ওঠে, অস্থায়ী। বোধহয় তার চেয়েও বড় কারণ অর্থনৈতিক। যে অর্থনীতি অনুযায়ী বেশীর ভাগ manpower এবং resources কাজে লাগে শহরকেন্দ্রের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য এবং যে অর্থনীতি খুবই নির্ভর করে দূর পাল্লার বাণিজ্যর উপর, সে অর্থনীতির পক্ষে শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পনেরো শতাব্দি থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের হতে থেকে বাণিজ্য এবং shipping-এর অপসারণ ; এবং পরে বাংলায় ইংরাজদের হস্তক্ষেপ। ইংরেজ শিল্প উৎপাদনে সহায়ক কর ধার্যের ফলে বাংলার উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভাঙন ধরে। যাইহোক মনে রাখা দরকার যে বাংলার শহরকেন্দ্রর অবনতি কেবলমাত্র ইউরোপীয় প্রাধান্যর জন্য নয়। সময়োচিতভাবে বাংলার অর্থনীতি পরিবর্তিত হতে পারেনি।

অত্যন্ত কম সময়ে আমি কেবলমাত্র কয়েকটি ইঙ্গিত দিতে পেরেছি শহর-গ্রাম এবং শহর সভ্যতা বিন্যাসর উপর বাণিজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে। এই বিষয়ের উপর আরো অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

# মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানী আমলে বাংলায় নগর বিন্যাস

## ( ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতক)

রীণা ভাদুড়ী

ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলার জনজীবনে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই পরিবর্তনের একটি প্রকাশ হল অধিক সংখ্যায় নগর-কেন্দ্র স্থাপন, পূর্বতন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন ও জনজীবনে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাওয়া। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে নগরায়ণ অগ্রগতি লাভ করে এটি তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করার সবিশেষ চেষ্টা করেছেন মুহম্মদ হাবিব, নিজামী, প্রমুখ ইতিহাসবিদরা। ইরফান হাবিব তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে বলেছেন যে নগরায়ণ প্রসার লাভ করেছিল কিনা তা তিনভাবে বিচার করা যেতে পারে (১) নগরগুলির আয়তন ও সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি (২) নগরজীবনের সমৃদ্ধির জন্য কারিগরী শিল্পের প্রসার ও (৩) ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা উৎপাদনের উন্নতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতকের মধ্যে বাংলায় নগরবিন্যাস আলোচনা করা যেতে পারে।

সেনবর্মণ আমলের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিতে বাংলায় বন্দর ও নগরগুলি দুর্দশাপ্রাপ্ত ও পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। খৃঃ ৮ম শতক পর্যন্ত বাংলায় বাণিজ্য প্রবাহ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ৮ম শতক থেকে নবজাগ্রত আরব-জাতি অপ্রতিহত বেগে পশ্চিম থেকে পূর্বজলসীমান্ত পর্যন্ত অভিযান আরম্ভ করে। ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মিশরীয় ও রোমক বণিকদের করতলগত ছিল, সেই সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য আরব বণিকগোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হল।

ভারতমহাসাগরে এই বাণিজ্য অধিকার পরিবর্তন বঙ্গদেশকে আঘাত করে। ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন ৮ম শতক থেকে সেই তাম্রলিপ্তির বন্দর বা জনপদ হিসাবে আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৮ম শতকে যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের

সূত্রপাত, ১৩শ শতাব্দীর রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরে তার চরম পরিণতি। এই সময় বাণিজ্য প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবার ফলে বাংলার জনজীবন পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র হস্তশিল্প ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে নগরায়ণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয় ও পূর্বতন নগরকেন্দ্রগুলি উন্নতি ও সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে হতমান হয়ে পড়ে। মুসলমান আগমণের প্রাক্কালে লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, দেবীকোট, বিক্রমপুর, সোমপুর, কর্ণসুবর্ণ, বর্ধমান, ইত্যাদি, ক্ষীয়মান নগরকেন্দ্র। উত্তরবঙ্গে করতোয়ার বামতীরে এক বর্গ মাইলব্যাপী মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ ও লালবাই-ময়নামতী খননকার্যে যে বিস্তৃত নগর-কেন্দ্রর অবস্থিতির প্রমাণ মেলে, মুসলমান বিজয়ের সময় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ও স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলায় নগরবিন্যাস বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। চতুর্দশ শতকে বাংলার বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পূর্বদিকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে নবজীবনের জোয়ার লাগে। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন সমুদ্র পথে ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি সুদূর প্রসারী ফল। এই সময় নানা কারণে বাংলার বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলা আলেকজান্দ্রিয়া-কুশ-এডেন-ক্যাম্বে হয়ে মালাবার করমণ্ডল দিয়ে মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা উৎপাদিত সামাজিক সম্পদের প্রধান বণ্টন-কেন্দ্র ও বাজার ছিল স্বাভাবিক ভাবেই নগর ও বন্দরগুলি। নগরজীবনের ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর ও বিলাপের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল এই সামাজিক ধন, যদিও তার অধিকাংশই শাসকগোষ্ঠী অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বণিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত হত। এই ধরণের নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য ছিল একটি উন্নতমানের মুদ্রাব্যবস্থা, কারণ সামাজিক সম্পদ মুদ্রাব্যবস্থা মারফৎ অর্থে রূপান্তরিত হত। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধাতু মুদ্রার যে ব্যবহার আলোচ্য সময়ে দেখা যায় তা' ছিল উন্নত অর্থনীতির দ্যোতক। বাংলায় পাল আমলে বিস্তারিতভাবে স্বর্ণ মুদ্রার এবং সেন আমলে স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনো মুদ্রার চলন ছিল না। মীনহাজ

বলেছেন, মুসলমানরা প্রথমদিকে বাংলায় সোনারূপার মুদ্রার চলন দেখেন নি। কড়িই ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। কপর্দক, পুরাণ, কার্ষাপন, চুর্ণীন, ইত্যাদি, বিনিময় মাধ্যম নিয়ে ডাঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি অধুনা প্রকাশিত প্রবন্ধে বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে মনে হয় বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির ফলে স্বর্ণরৌপ্য নির্ধারিত মুদ্রামানের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় সেন আমলে রাজকোষ ও দেবালয়ে, প্রচুর স্বর্ণরৌপ্য মজুত করা হত। কিন্তু সে যুগের সংস্কৃত সাহিত্য নগরবাসিনী বরবর্ণিনীদের অলংকারের অনেক বর্ণনা মেলে। অর্থাৎ সমাজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধনের অভাব ছিল না, কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থা মারফৎ তার অর্থনৈতিক ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বাণিজ্যে অগ্রগতি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ১৪শ শতক থেকে বাংলায় নগরায়ণের অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থার সূচনা হয়। বিদেশী বিজেতাদের নগরে বাস করার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনও নগরবিন্যাসের কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই আমলের নগরগুলির গঠনরীতি বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ মেলে যে টাঁকশালগুলি নগর-বিন্যাসের একটি প্রধান উপাদান ছিল। ইসলামীরীতি অনুযায়ী শাসকের অধিকার আইনসঙ্গত করার জন্য নিজনামাঙ্কিত মুদ্রাপ্রচলন সে যুগে অবশ্য কর্তব্য বিবেচিত হত। ১৪শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৬শ শতকের মধ্য-ভাগ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলার সুলতানদের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির ফলে টাঁকশালগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ও নগরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সেগুলি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন শাসকের মুদ্রা থেকে টাঁকশাল নগরীগুলির নাম ও সেই সঙ্গে সুলতান-দের রাজ্যসীমা ও ক্ষমতার বিস্তার কতদূর ছিল তা' জানা যায়। গৌড় ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ও বৃহত্তম টাঁকশাল নগরী। ফিরুজাবাদ, মুয়াজ্জ-মা-বাদ, ফতেহাবাদ, খিলাফতাবাদ, বরবকাবাদ, ইত্যাদি, এবং সোনারগাঁও, চাটগাঁও, সাতগাঁও ও অন্যান্য বিভিন্ন শহরে টাঁকশাল ছিল।

নগর গঠনের অপর এক প্রধান উপাদান ছিল মসজিদ ও ইসলামী ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি। মসজিদ মধ্যযুগে মুসলিম ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মুখ্য স্তম্ভ স্বরূপ। রাজ্যজয় করা মাত্র মুসলিম বিজেতারা শাসনকেন্দ্রে মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশ পেতো। শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্গত উলেমাকে তোষণ পোষণ করার জন্যও মসজিদ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় ছিল। আলোচ্যযুগের

অসংখ্য শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে বড় বড় শহরে সুলতান ও আমীর মালিকদের আদেশে মসজিদ নির্মিত হত ও সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বতন নগরগুলির মন্দির-দেবায়তন, চৈত্য-বিহার, ইত্যাদি, ধ্বংস করে বা পরিবর্তিত করে, ধ্বংসাবশেষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মিত হত। বৌদ্ধ বিহার ও গর্ভগৃহগুলি পীর ও সুলতানদের সমাধির জন্য ব্যবহৃত হত। কালে মসজিদ ও দরগাগুলিকে কেন্দ্র করে স্থানমাহাত্ম্যের সুযোগে তীর্থ-নগরী গড়ে উঠতো। নিদর্শন পাণ্ডুয়া. সিলেট. ইত্যাদি।

আলোচ্যযুগে দরবারী ইতিহাস ও সরকারি নথিপত্র না থাকায় শাসন-তান্ত্রিক কারণে নগরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব বোধ হয়। যদিও মুঘলযুগে, তবুও আবুল ফজলের 'আইনে' টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থায় (১৫৮২) জমার হিসাব (rent roll) পূর্ববর্তী রাজস্ব বিভাগের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজস্ব বিভাগের নাম ও টংকার হিসাবে যে আদায়ের পরিমাণ দেওয়া আছে তাতে জানা যায় যে বাংলায় ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহলের মধ্যে ৮টি সরকারের ও ২০৮টি মহলের মুসলিম নাম, বাকি পূর্ববর্তী যুগের হিন্দু নাম। প্রত্যেক রাজস্ববিভাগের (সরকারের) সদর দপ্তর ছিল একটি বন্দর বা নগর এবং সেগুলি ছিল স্থানীয় শাসনের কেন্দ্র। মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের (১৩শ থেকে ১৪শ শতক) মুদ্রায় ও শিলালিপিতে পূর্বতন হিন্দুনাম যুক্ত নগর কেন্দ্রগুলি ক্রমশঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলিম নামে পরিবর্তীত হয়।

টোডরমলের জমার হিসাবে প্রদত্ত অধিকাংশ সরকারের নাম টাঁকশাল নগরীর নামের সঙ্গে অভিন্ন। আবার শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে জামী মসজিদগুলি ঐসব শহরেই প্রতিষ্ঠিত হত। ১৯টি সরকার ও ২০টি টাঁকশাল নগরীর নামের মধ্যে অন্তত ৬টির নাম প্রাক্‌মুসলিম যুগের বন্দর ও নগরের যেগুলি আলোচ্য যুগে পুনর্গঠিত ও উন্নীত হয়। মুসলিম নামযুক্ত নগর কেন্দ্রের কোনগুলি পুনর্গঠিত ও কোনগুলি নব প্রতিষ্ঠিত তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। শহর-ই-নও বা নবনগরী নামক একটি নগরের নিকোলো কন্তির ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। ইউল বলেছেন, নিকোলো কন্তির সেরনাভই শহর-ই-নও। ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দের সিকান্দার শাহের একটি স্বর্ণ-মুদ্রায় শহর-ই-নও নামটি মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই শহরটির অবস্থিতি সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা যায় নি। ইবুনবতুতা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে 'হবঙ্ক' নামে

নীল নদীর ( নহর-ই-অজরুক ) তীরে একটি চমকপ্রদ, অতি সুন্দর নগরীর বর্ণনা দিযেছেন। এই শহরেরও স্থান নির্ণয় করা যায় নি। তবে নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন, সিলেট শহরের ৬ মাইল উত্তরে বুরাকক্ নদী যেখানে সুর্মা ও কাশিয়ারা, এই দুই শাখা নদীতে বিভক্ত হয়েছে, তার সংযোগস্থলে হবঙ্গ নামে একটি টিলা পাওয়া যায়। হয়ত সুদূর অতীতে এখানে একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর অস্তিত্ব ছিল।

স্বাভাবিক কারণেই অধিকাংশ বিদেশী পর্যটক গৌড় পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, চাটগাঁও ও সোনারগাঁওতেই আসতেন। তাই এঁদের বিবরণে এই জায়গাগুলিরই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনবতুতা (১৩৪৬) তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে চট্টগ্রাম শহরের এক মনোগ্রাহী বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। চীনা দোভাষী মাহুয়ান (১৪০৯-১৪১২) রাজধানী গৌড়ের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। ফেইসিন (১৪১০) চট্টগ্রামের কর্মব্যস্ত বন্দর, প্রাকারবেষ্টিত সোনারগাঁ, রাজধানী গৌড় পাণ্ডুয়ার অনুপুংখ বিবরণ রেখে গিয়েছেন। ভারথেমার (১৫০০-১৫০৮) 'বেঙ্গালা' বন্দরে এক গতিশীল, চলমান জীবনযাত্রার সন্ধান মেলে যেখানে পৃথিবীর সেরা ধনী বণিকদলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই বেঙ্গালা বন্দরের অবস্থিতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু এর সঠিক স্থান এখনও নির্ণীত হয় নি। বার্বোসা (১৫১৪) বেঙ্গালাদেশে বহু বন্দর ও নগরী দেখেছিলেন; সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো, জাহাজ নির্মাণ করা হত, কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী করা হত। জোআও দ্য বারোস ( ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ) ঘন বসতিপূর্ণ গৌড়ের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের বাণিজ্য কর্ম ও বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। কবি বিজয় গুপ্ত, কৃত্তিবাস ওঝা, সনাতন গোস্বামী, বৃন্দাবন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, প্রমুখের লেখায় নগরবাসী ধনী হিন্দুদের জীবন-যাত্রার বিবরণ মেলে। বিদেশী পর্যটকরা অনেকেই দ্রব্যমূল্য বিশেষ কম বলে উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত বিবরণগুলি থেকে শাসনকেন্দ্র ও বন্দর জাতীয় নগরগুলির সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

দুর্গনগরীকে বলা হত খিট্টা ও দুর্গহীন নগরীকে বলা হত 'কসবা'। মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র ছিল সামরিক শক্তি নির্ভর, বিদেশাগত বিজেতাদের নিকট দুর্গ ছিল অপরিহার্য। আলোচ্যযুগে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে গড়মান্দারণ, গড় একচালা, গড় জরিপা, নারিকেলা বা তুঘারল গড়, প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গনগরীর গঠনরীতি ছিল দুর্গ, প্রাকার, পরিখা, পরিদর্শন

স্তম্ভ ও পণ্য বিক্রয়ের কাট্‌রা-বাজার। এই সুরক্ষিত স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে হত নগরবিন্যাস। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় বা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত অবস্থায় শাসকরা রাজধানী ত্যাগ করে দুর্গনগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

সেন আমলের সাহিত্যের বিবরণ থেকে আমরা নগরজীবনের যে আলোচনা পাই তার সঙ্গে মুসলিম শাসনকালে নগরজীবনের গুণগত ও আকারগত প্রভেদ ছিল। পূর্ববর্তীযুগে নগরজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষিজাত উৎপাদনের উদ্বৃত্ত, আর মুসলিম শাসনাধীনে সে ছাড়াও প্রধানত বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতির উপর নগরজীবন নির্ভরশীল ছিল। বিদেশী মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর জীবনধারার সঙ্গে দেশের কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরী হতে অনেক সময় লেগেছিল। মুসলমান শাসকরা মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে নগর গঠন করাতেন। সমকালীন নবদ্বীপের বিবরণ ও গৌড়ের বিবরণের তুলনা করলেই এই আকৃতিগত প্রভেদের চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়।

আলোচ্য সময়ে নগরবাসী জনগোষ্ঠীর বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। সেন-বর্মণ আমলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিলুপ্তির ফলে বণিক, ব্যবসায়ী, কারিগরদের প্রতিপত্তি নাশ ও ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদের প্রভাববৃদ্ধি পায়। সে যুগে সামাজিক ধনভোগের অধিকারী ছিলেন শুধু উচ্চবর্ণের মানুষরা। ভূমিহীন ও সমাজ শ্রমিকরা ছিল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বঞ্চিত। চর্যাপদের চর্মকার, চণ্ডাল, ডোম, শবর-শবরী, যোগী-কাপালিক 'নগর বাহিরি' কুটিরবাসী। মুসলিম শাসনকালে ধর্মান্তরণের পর ইসলামের সামাজিক সাম্যবাদে এদের নগরজীবনে অংশ মিলেছিল কিনা তার প্রমাণ মেলেনা। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী তাঁদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ, মান-সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ সংখ্যায় কারিগর ও শ্রমিকদের নগরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিয়োগ করতেন এবং তারা নগরবাসী হিসারে অভ্যন্তরে বসবাসের অধিকার লাভ করতো। কিন্তু যারা ভূমিহীন বা অন্যকোনো উপায়ে উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাদের ভাগ্যের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছিল?

বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে নগরজীবনের যে আলেখ্য পাওয়া যায় তা খুবই আংশিক এবং এতে সাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই বল্লেই চলে। বিদেশী বণিক ও রাজদূতরা নগরের শুধু উচ্চ কোটীর মানুষদের সংস্পর্শে আসতেন—তাদের বর্ণনায় শাসকগোষ্ঠী রাজকর্মচারী, সামরিক কর্মচারী ও ধর্মজীবি সম্প্রদায় স্থান পেয়েছে। মা-হুয়ানের বর্ণনায় প্রহরী, সৈন্য ও

কর্তব্যরত রাজপুরুষের কথা—যারা আবার সবাই মুসলমান। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে বাংলায় অনেক দক্ষ কাজের লোক ছিল, যেমন চিকিৎসক, ভূমিবিদ্যা লিখনের অধ্যাপক, জ্যোতিষী, হুনরী, কারিগর, ইত্যাদি। ফেই-শিনের ভোজসভার বিবরণে ধনীদের নগরজীবনের বিলাস ও আড়ম্বরের চিত্র পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কথাই উল্লেখ করেছেন। বারবোসার বেঙ্গালা শহরে আরব, ইরানী ও ভারতীয় বণিকদের বাস। কোনো কোনো বিদেশী সম্প্রদায়কে দেখে বোধহয় তিনি সেখানকার অধিবাসীদের শ্বেতকায় বলেছেন। জোআও দ্য বারোস সর্বপ্রথম গৌড়ের জনসংখ্যার উল্লেখ করেছেন, তাঁর ভ্রমণকালে নাকি গৌড়ের জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ। ভারথেমা বিশেষ ধনশালী বণিকদের উল্লেখ করেছেন। বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন সুলতানের হিন্দুকর্মচারী ও সভাসদরা রাজধানীতে বাস করতেন। বৃন্দাবন দাসের নবদ্বীপ নগরী প্রখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্র, বহু অধ্যাপকের বাস সেখানে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উভয় সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালীরা নগরবাসী। এই নগরজীবনে নিশ্চয়ই সমাজ শ্রমিকেরা অপরিহার্য ছিলেন। ইব্‌নবতুতার ভ্রমণকাহিনীতে ক্রীতদাস প্রথার সাক্ষ্য মেলে। মা-হুয়ান দক্ষ বৃত্তিজীবিদের উল্লেখ করেছেন ও নগরবাসী ধনীদের মনোরঞ্জনকারী সানাই-বাদক, ভাঁড় ও বাজিকরদের কথাও বলেছেন। বৃন্দাবন দাস বর্ণিত নবদ্বীপে তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, মালাকর, শংখবণিক ও নানা জাতির ও পেশার লোকের বাস ছিল। পর্যটকদের বিবরণীতে পোতনির্মাণ-শিল্পের কারিগরদের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতার সংবাদ পাওয়া যায়। নৌ-শিল্পীরাও ছিলেন নগরবাসী। বিত্তশালীদের প্রয়োজনে স্থপতি, তক্ষণ শিল্প, স্বর্ণকার, মণিকার প্রমুখ ছিলেন বাসের অধিকারী। মা-হুয়ান কার্পাসবস্ত্রের সঙ্গে জরীর টুপি, রেশমী রুমাল, রঙ্গীন পাত্রাদি, ছুরি, কাঁচি ও কাগজের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যেতে পারে এইসব কারিগররাও নগরে বাস করতেন। সৈন্যরা ও সামরিক কর্মচারীরা দুর্গনগরীতে ও শিক্ষা ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যক্তিরাই তীর্থনগরীতে প্রাধান্যলাভ করতেন।

আলোচ্যযুগের নগরকেন্দ্রগুলির পতনের কারণ ছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে জলাভাব, রাজধানী বা শাসনকেন্দ্রের স্থানান্তরের ফলে অর্থনীতিক অবনতি। শাসনক্ষমতা হস্তান্তর ও বাণিজ্য অধিকারের দ্বন্দ্বের ফলে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার নগরবিন্যাস ও নগরজীবন ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। সে ইতিহাস পরবর্তী যুগের।

# মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐক্যের ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে

অসিতকুমার সেন

১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশে দুইটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রমাণ করে যে এই ধর্মভিত্তিক দেশভাগ অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। কিন্তু যাঁরা ধর্মের নাম করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন করতে তৎপর তাঁরা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদকে ঐতিহাসিক সত্য বলে এখনও কথা ও কলমে সর্বদা প্রচার করছেন। আর ইতিহাসের পাতায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনেক উদাহরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব লেখক বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে মদতদান করে থাকেন। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের পরাধীনতার শৃংখল মোচনের সংগ্রামের যুগে যেভাবে ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে ব্যবহার করেছিলেন এই যুগের ঐক্য ও সমন্বয়বিরোধী লেখকরা সেই পথ অনুসরণ করেন। এই প্রবন্ধে নতুন করে আর একবার ভারতের ইতিহাসে ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে বিভেদের মধ্যে ঐক্য দেখা যায় একথা প্রমাণিত হয় যখন আমরা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের তুলনা মধ্যযুগের লেখকদের লেখনিতে দেখি। আমির খসরু তাঁর নু-সিপিব বা নয়টি স্বর্গ গ্রন্থে এই দেশের পশুপক্ষী, গাছ লতাপাতা অন্যদেশের নগর প্রান্তর, জন্তুজন্তুর তুলনায় শ্রেয় উল্লেখ করেছেন। খসরুর মাতা ছিলেন ভারতীয় ও পিতা ছিলেন তুর্কী, ত্রয়োদশ শতকের এই লেখকের চোখে হিন্দুস্তানের মানুষজন এমনকি হিন্দুরাও বিদেশীদের অপেক্ষা আদরণীয় বলে মনে হয়েছিল। হিন্দু দেবস্থানের পবিত্রতা বিনষ্ট করার ঘটনা এবং তুর্কী আফগান ও মুঘল যুগের ইতিবৃত্তে হিন্দুবিদ্বেষের কাহিনী মধ্যযুগের ইতিহাসে একমাত্র বৈশিষ্ট্য, বলে অনেকে দাবী করেন। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখেছেন 'মুসলমান শাসনের ইতিহাস

হচ্ছে হিন্দুদের দমন করে রাখবার ইতিহাস'। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, ফিরুজ তুঘলক, আওরঙ্গজেব ও অন্যান্য সুলতানের ও বাদশাহের কথা উল্লেখ করা হয়। মন্দির ধ্বংস করার ঘটনাকে এতদূর অতিরঞ্জিত করা হয় যে মধ্যযুগের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে বঙ্গদেশে মুসলমান বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে হিন্দু মন্দিরের নমুনা বিরল একজন ঐতিহাসিক দাবী করেছেন। ১৯৭০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ডেভিড জে. ম্যাকাচনের অজস্র সচিত্র উদাহরণসহ গবেষণামূলক আলোচনায় এই ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য অপ্রমাণিত হয়েছে।[১] ধর্মদ্বেষে বা ধনলোভে কোন কোন রাজপুরুষ অথবা সুলতান বা বিদেশী লুঠেরার আক্রমণে বহু মঠ-মন্দির, বৌদ্ধবিহার জনপদ ধ্বংস হয়েছিল এই কথাও যেমন সত্য তেমনি মধ্যযুগের সুলতানী শাসনের আমলে প্রজা সাধারণের জীবনযাত্রায় ধর্ম পালনে কোন বিশেষ বাধাবিঘ্ন যে সৃষ্টি করা হয় নি তারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এইভাবে ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ আধুনিক যুগে চলে না। মূলত তুর্কী ও মুঘলরা এই দেশ দখল করেন যুদ্ধ করে। যেমনভাবে আর্য অনার্য সংঘর্ষ হয়েছিল, শক-হুণ-গ্রীকরা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে সেই একই পথে এসেছে পাঠান ও মুঘল এবং তৎপূর্বে আরবরা। সংঘর্ষ, সহাবস্থান ও সমন্বয় এই চলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। কেবল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই কথা বলা যায় না কারণ অন্যান্য বিদেশীরা বেশীদিন পরদেশী হিসাবে হিন্দুস্তানে পরিচিত ছিল না। তুর্কীরা প্রথম যুগে লুঠেরা ছিল। মন্দিরে মন্দিরে বহু ধনদৌলত সঞ্চিত ছিল তা জানত। আলবেরুণীর বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে তুর্কী আক্রমণের সমসাময়িক সময় ধর্মের অজুহাতে প্রজাসাধারণকে দাবিয়ে রাখত আর পুরোহিত শ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর সহ-যোগিতা করত। হিন্দু নৃপতিরা উঃ পঃ সীমান্তে ঝড়ের সংকেত সম্পর্কে একেবারেই নির্বিকার ছিল। চাঁদ বরদাই তাঁর পৃথ্বিরাজ রাসো কাব্যে বলেছেন যে দ্বিতীয় তরাইর যুদ্ধের (১১৯২ খৃঃ) আগে পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা বিলাস লালসাময় মধুর জীবন-যাপন করতেন। তুর্কী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য দিল্লীর নাগরিকরা বিশেষত বণিকরা রাজাকে সক্রিয় করার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁরা কবি চাঁদের নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদে যান কিন্তু প্রাসাদের প্রমিলা দেহরক্ষীরা বেত্রাঘাতে তাদের বিতাড়িত করেন। একমাত্র কবি চাঁদ বরদাই শেষপর্যন্ত পৃথ্বিরাজের কাছে অনেক কষ্টে পৌঁছে নাগরিক-দের আশংকার কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনা কেবল কবি কল্পনা

কি-না বলা যায় না।[২] কিন্তু চাঁদ বরদাই সম্পর্কে উল্লেখ করে ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় বলেছেন যে এই চারণ কাহিনীতে ঐতিহাসিক সারবস্তু পাওয়া যায়।[৩] যদি কাব্য সমাজের প্রতিচ্ছবি হয় তবে চাঁদ বরদাইর পৃথ্বিরাজ রাসো এই যুগের হিন্দু শাসকগোষ্ঠীর অবনতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আলবেরুণী বলেছেন যে এই দেশে বহুলোক এক অঙ্গুল চওড়া এক টুকরো কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে আর অনেকের পোষাকের বাহুল্য এত বেশী যে তারা যে পরিমাণ কাপড়ে নিজেদের আবৃত করে তাতে পুরোপুরি একটা ঘোড়ার জিন তৈরী হয়। ধনী ও দরিদ্র এই পার্থক্য বিদেশী পণ্ডিত আলবেরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৪] আর তার উপরে ছিল জাতপাতের বিচার। চণ্ডাল, ডোম ও মুচি প্রভৃতি নিচু জাতের ৮টি শ্রেণীকে শহরে বাস করতে দেওয়া হত না। একমাত্র ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কেউ অস্ত্রধারণ করত না। ফলে তুর্কী আক্রমণে দেশ যখন বিধ্বস্ত হয় তখন ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আর অন্য জাতের ও বর্ণের মানুষের অস্ত্রধারণের অধিকার ছিল না।[৫]

সুলতান মামুদের মত যেসব আক্রমণকারী লুণ্ঠনের লোভে ধর্মের ধ্বজা তুলে হিন্দুস্তানে বারংবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মঠ মন্দির ও নগর জনপদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বদেশে তাঁরা ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি কতদূর নজর রাখতেন? এই সম্পর্কে গজনীর সুলতান মামুদের একান্ত সচিব আল-উতবীর লিখিত বিবরণী থেকে একটি কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা জানা যায়। বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই ঘটনা থেকে সহজেই গজনীর মামুদের আমলে তাঁর ধর্মাবলম্বী অধীনস্থ প্রজাসাধারণের দুর্দশার চিত্র ধরা পড়ে। উতবী লিখিত কিতাব-ই-ইয়ামিনীতে[৬] উল্লিখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে গজনীর অধীন নিশাপুরে হিজরী ৪০১ সালে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল যে মানুষ মৃত মানুষের অস্থি মাংসে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করত। এই ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার জন্য ইসলামের গাজী মামুদ কি কোন ব্যবস্থা করেছিলেন? স্বভাবত মনে হতে পারে যে স্বধর্মে যাঁর এত অনুরাগ, তিনি নিশ্চয় দরিদ্র দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য কোন প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। যিনি দার-উল হারবে (অবিশ্বাসীর দেশ) পৌত্তলিকতা ধ্বংসের জন্য ও ইসলামের নামে শতসহস্র কাফেরের প্রাণহানী করতে দ্বিধা করেন নি স্বীয় রাজ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রক্ষার জন্য সেই মামুদ অঙ্গুলি লেহন করেন নি। যখন কবর

খুঁড়ে মানুষের হাড় মানুষ বার করছে ও তাই সেদ্ধ করে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মারামারি করছে সেইসময় একজন রুটিওয়ালা তার গুদামে অবিক্রিত রুটি বাজারে কেনার মত খরিদ্দার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আদমের কাছে আফশোষ করছে। দুর্ভিক্ষের দ্বারে মানুষ যখন অনাহারে পশুর মতন ক্ষুধার তাড়নায় যেকোন অখাদ্য কুখাদ্য গ্রহণ করছে সেই সময় গজনীর সুলতান গাজী মামুদের রাজ্যে বাজারে রুটির দাম দেবার মতন পয়সা লোকের কাছে নাই। আর এই মামুদের ভাণ্ডারে আছে মন্দির, জনপদ নগর লুণ্ঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও জহরৎ। আর তিনি ইসলামের ধ্বজাধারী গাজী তাঁর প্রজাদের জন্য তা ব্যয় করেন নি অথবা কালোবাজার থেকে রুটি জোর করে কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন নাই কারণ মামুদের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। তিনি ধর্মের নামে এই লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের হিন্দু রাজারা ছিলেন কূপমণ্ডুক. জাতিবিচারের জন্য মানুষ ছিল বিভক্ত ও প্রাচীন সামরিক রীতির অন্ধ অনুকরণ তুর্কী অশ্বারোহীদের আক্রমণ রোধে হয়েছিল ব্যর্থ। তা না হলে শাসক হিসাবে তুর্কী বা হিন্দু রাজারা প্রজা-সাধারণকে শোষণ করতে বা নিজদের স্বার্থসিদ্ধি করতে একই পদ্ধতিতে তৎপরতা চালিয়েছিলেন এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

ভারতে ইসলামের আগমন ও সুলতানী সাম্রাজ্য পতনের পরবর্তী যুগে লিখিত ইতিহাস অধিকাংশ গোঁড়া উলেমাদের লেখা। অতএব ধর্মের কুসংস্কার, হিন্দু ও মুসলমানদের বিভেদ, সুলতানদের বিজয় কাহিনী ও স্তবস্তুতি ছিল এইসব লেখকদের অনেকের লক্ষ্য। নিরপেক্ষভাবে এই যুগের ইতিহাস থেকে সত্য উদঘাটন করা ও জনমানসের ও সংস্কৃতিতে ভাবসমন্বয়ের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রত্নতত্ত্ব, লোকসাহিত্য, সুফী ও ভক্তি আন্দোলনের সাধকদের জীবনী পাঠ করার প্রয়োজন। এইভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে "স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ব্রাহ্মণ, উলেমা ও দরবারের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা সত্ত্বেও মিলনের স্রোত ধীরে ধীরে গতিশীল হয়ে উঠেছিল"।[৭]

রাষ্ট্রনীতিতে ইসলাম শাসনে ভারতে ধর্মের নামে অনেক অত্যাচার করেছে বলে গত পঞ্চাশ বছরে বা তার আগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে লেখা ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে, ভারতে ধর্ম বিরোধের মূলে ইসলামের গোঁড়ামিই দায়ী বলে অনেক লেখক উল্লেখ করেছেন।[৮] ইতিহাসের আদি ও মধ্যযুগে ধর্মের কুসংস্কারকে বিশ্বের সকল দেশের ইতিহাসে মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি

করেছিল। আজও ধর্মের নামে অনেক সময় অকারণে শান্তিপ্রিয় মানুষের রক্তপাত হয়। কারণ ধর্মের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধে। এইরকম দাঙ্গার উদাহরণ হয়ত খুঁজে পেতে এক-আধটা পাওয়া যাবে মধ্যযুগেও। কিন্তু তাদের সংখ্যা স্বল্প। কোন ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ ও প্রতিবেশীর উপর হামলা করে দেশছাড়া করার উদাহরণ এই যুগে মেলে না।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত মুসলিম রাজত্বে অন্যদের জিজিয়া দেবার বিধান শরিয়তে ছিল। এই ধরনের করের সঠিক চরিত্র কি? অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত মুসলিমরা প্রথমের যুগে সবল সক্ষম নাগরিকরা প্রয়োজনে যুদ্ধে যোগ দিত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসীদের যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে যারা যোগ দিত তাদের কোন জিজিয়া দেবার প্রশ্ন ছিল না। সুলতান মামুদ থেকে শুরু করে প্রায় সব সুলতান ও বাদশাহের অধীনে হিন্দু সেনাপতিরা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদাধিকারী ছিলেন। তিলক, ব্রহ্মজিৎ গৌড়, হিমু, কেশব ছত্রীর নাম মধ্যযুগের ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন আর মুঘল যুগের প্রসিদ্ধ মনসবদার রাজা মানসিংহ, সওয়াই রাজা জয়সিংহ ও অন্যান্য অনেকে আজ ঘরে ঘরে সুপরিচিত। কাজেই জিজিয়ার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। জিজিয়া আদায় সকলের কাছে করা যেত না আর জিজিয়া যেমন অমুসলমানদের দেয় কর ছিল, মুসলানদের ধর্মীয় কর ছিল জাকৎ। মধ্যযুগের অন্যান্য কার্যকলাপের মত কর আদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলার অভ্যাস ছিল। সুলতান আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সালুফ কাফুরকে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে কর বা জিজিয়া আদায় করতে নির্দেশদান করেন। কারণ অনেক সময় পরাজিত শত্রুর সঙ্গে চুক্তির মারফতে আদায়কৃত বশ্যতা প্রদর্শনের করকে জিজিয়া বলার প্রথা ছিল। সুলতানী শাসনে ধনী ও বিত্তবানদের, স্বচ্ছল অমুসলমানদের উপর জিজিয়া বিভিন্ন হারে আদায় করা যেত। ধনীরা বাৎসরিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তরা বাৎসরিক ২৪ দিরহাম ও পরের শ্রেণী বৎসরে ১২ দিরহাম জিজিয়া দিত। নাবালক, বৃদ্ধ, বেকার, অশক্ত ও দরিদ্ররা এই করের আওতা বহির্ভূত ছিল।[৯] উলেমা-শ্রেণীর গোঁড়াপন্থীরা হিন্দুদের উপর নানা বিদ্বেষের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কাজি মুঘসউদ্দীনের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি আলাউদ্দীনকে হিন্দুদের অপমান করে জিজিয়া আদায়ের উপদেশ দিয়েছিলেন।

আজকের দিনেও এই ধরনের ধর্মদ্বেষী লোকের অভাব নাই। কিন্তু এইসব গোঁড়াপন্থীরা রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন না। আলাউদ্দীন কাজি মুখিমকে বলেছিলেন যে যা কিছু রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর তাই আমি করি। তাতে শরিয়তের নিয়ম রক্ষা হয় কি না আমি জানি না।[১০] আলাউদ্দীন যা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন তা বহুদিন থেকে সুলতানী রাষ্ট্রে গৃহীত নীতি ছিল। রাজনীতি থেকে ধর্মকে, সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনকে ধর্মের নির্দেশ থেকে তাঁরা তফাৎ করতে শিখেছিলেন। আবার প্রয়োজনে ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির স্বার্থে তাঁরা ব্যবহার করতেন। ইলতুতমিসের কথাই ধরা যাক। বাগদাদের খলিফার ফরমান নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ধর্মের নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই মোংগল নেতা দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস যখন খোয়রজিমের সুলতানের পশ্চাৎধাবন করে হিন্দুস্থানের সীমানায় হানা দিলেন তখন ইলতুতমিস খোয়রজিমের সুলতান জালালউদ্দীন মাংগবারাণীকে আশ্রয় দিয়ে তুর্কী শাসনকে বিপন্ন করেন নি। কারণ ইতিপূর্বে মোংগলরা পঙ্গপালের মত সমরখন্দ, বোখারা, খিবা আর মধ্য এশিয়ার অন্যান্য মুসলিমকেন্দ্র ও উদ্যান ধ্বংস করেছে। ইলতুতমিসের কূট রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা হিন্দুস্থানের নব্য তুর্কীরাজ্যকে এই ভয়াবহ ভাগ্য থেকে ও তাঁর প্রজাদের মোংগলদের তরবারির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এই মোংগলরা পরবর্তীকালে যে কোন শহর দখল করলে তাতে একটি জনপ্রাণীকে জীবিত রাখত না। চেঙ্গিসখানের পৌত্র হুলাগুখান যখন বাগদাদ দখল করেন সেই সময় টাইগ্রীস নদীর জল নিহত মানুষের রক্তে তিন দিন ধরে লালে লাল হয়েছিল আর খলিফা সহ তার পরিবারের সকলে সেইসঙ্গে মোংগলের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ইলতুতমিসের সমকালীন বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আয়াজ খিলজীও বাগদাদের খলিফার ফরমানে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তারজন্য হিন্দুস্তানের দুই খলিফার স্বীকৃত স্বাধীন নরপতির যুদ্ধ থামেনি। পরে বাংলার সুলতান যুদ্ধে নিহত হন। খলিফার স্বীকৃতি নামেমাত্র একটা অলংকার। বাস্তব রাজনীতিতে তার কোন প্রভাব ছিল না। মহম্মদ বিন তুঘলুক ভেবেছিলেন বোধহয় খলিফার স্বীকৃতি তাঁকে বিদ্রোহের আগুন থেকে বাঁচাবে। কাজেই মোংগল আক্রমণের পরবর্তীযুগে না পাত্তা হয়ে যাওয়া আব্বাসিদ খলিফা পরিবারের বংশধরদের খুঁজে বার করে তিনি অনেক ধুমধামের সঙ্গে ফরমান এনেছিলেন। কিন্তু কোন লাভ হয় নি, বিদ্রোহের আগুন এর ফলে প্রশমিত হয় নি।

আবার আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক খিলজী নিজেকেই খলিফা বলে ঘোষণা করেন। এর কোন ফলাফল তাঁর রাজত্বের রাজনৈতিক ঘটনার উপর পড়ে নি। মুঘলযুগে বাবর প্রতিষ্ঠিত তৈমুরী বংশের খলিফার সাথে যোগসূত্রের অবসান হয়, ভারতের অধিকাংশ সুন্নী মুসলমান ছিলেন আব্বাসিদ খলিফার অনুগত, পরবর্তী যুগে অটোমন তুর্কী সুলতানরা নিজেদের খলিফা বলে দাবী করতেন, ধর্মীয় প্রভাবকে রাজনৈতিক স্বার্থে সুলতানরা ব্যবহারে অনেক সময় সচেষ্ট হন। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধি, ধর্ম নয়—আধ্যাত্মিক আকর্ষণও নয়।

অনেক গোঁড়াপন্থী সুলতানের উদাহরণ মধ্যযুগে পাওয়া গিয়েছে। অন্য সুলতান থেকে এদের নীতির তফাৎ হচ্ছে তাঁদের পরধর্মদ্বেষ। এক্ষেত্রে কয়েকজনের নাম যেমন ফিরুজশাহ তুঘলক, সিকান্দার লোদী, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফিরুজ ইসলামের নামে শারিয়তবিরোধী সমস্ত কর অবলুপ্ত করেছিলেন।[১১] ব্রাহ্মণদের জিজিয়া দিতে বাধ্য করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণরা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে অনশন করার ভয় দেখিয়ে বা আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে ঘোষণা করে তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের কাছে জিজিয়া আদায়ই নয় হিন্দু দেবস্থান ভঙ্গ করা ও ধর্মের জন্য নানারকমে নির্যাতন করে ফিরুজ ইতিহাসে গোঁড়া সুলতান নামে পরিচিত।[১২] আবার এই ফিরুজের রাজত্বকালে কৃষকের মঙ্গলের জন্য সুলতান সর্বদাই আগ্রহ দেখাতেন। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সেচখাল করেন। তিনি গর্ব করেছেন তাঁর রাজত্বে প্রতিটি কৃষকের হালের গরু আছে আর প্রত্যেক কৃষক রমণীর গহনা আছে। এই ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সুলতানের হিন্দু বিদ্বেষের ফলে অগণিত প্রজাসাধারণের কোন ক্ষতি হয় নি। বরং শারিয়তবিরোধী বলে তিনি যে অজস্র কর তুলে দিয়েছিলেন তার ফলে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তৈমুরের আক্রমণে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জীবনে বিপর্যয় নেমেছিল আর তার সময়কার ইতিহাস মালফুজত-ই-তৈমুরী পড়লে জানা যায় উভয় সম্প্রদায় দিল্লী ও অন্যত্র সমবেতভাবে তাঁকে সময় সময় বাধা দিয়েছিল। ফিরুজ তুঘলক ও সিকান্দার লোদীর নীতির ফলে পণ্যমূল্য হ্রাস পেয়েছিল বলে জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পায়। সিকান্দার লোদী সুলতানী শাসনের প্রদোষে লোদী আফগানদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁর প্রধান প্রতিযোগী ছিলেন জৌনপুরের সুলতান। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের

মতে কোন কোন সুলতান মন্দির ও মূর্তিভঙ্গকারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তৎকালীন বিবরণীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সম্ভবত সুলতানদের ধর্মে প্রগাঢ় ভক্তির প্রমাণ হিসাবেই এত বিস্তারিতভাবে এইসব কার্যকলাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুরাগ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। এই সূত্রে ফিরুজের উড়িষ্যা অভিযানের শেষে জগন্নাথ মন্দির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা যায়। এই ধরনের মন্দির ভাঙ্গার সঙ্গে আবার শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাও আছে। এই সূত্রে সিকান্দার লোদী কর্তৃক জৌনপুরের মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা অন্যতম।[১৩]

ইতিহাস নিজের গতিতে যখন অগ্রসর হয় তখন রাজা ও রাজ্য ভাঙ্গাগড়া কোন একজন ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সেই ব্যক্তি প্রতিভাবান হলে গতির সঙ্গে পা মেলাতে না পারলে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আওরঙ্গজেবের যত জায়গীর ছিল তার থেকে বেশী জায়গীরদার ও মনসবদার সৃষ্টি করে শেষ প্রতিভাবান মুঘল সম্রাট জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত দক্ষিণীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ফলে দক্ষিণীরা (বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী ও মারাঠা) অধিক সংখ্যায় অভিজাত ও মনসবদার পদ লাভ করেছিল। মনসব নিয়ে প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল। বেআইনী শুল্ক ও রাজস্ব আদায় কৃষকগণের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল।[১৪] জায়গীরদারী লাভের প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থের নামে রাজপুত ও মারাঠা যুদ্ধের অর্থনৈতিক সংকট, রাজস্ব বৃদ্ধি ও কৃষক বিদ্রোহের সূচনা করে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আর্থিক ও সামাজিক স্ববিরোধ যখন মুঘল সাম্রাজ্যকে জরাজীর্ণ করেছিল সেইসময় বৈদেশিক আক্রমণে সাম্রাজ্যের পতন হয়। তা না হলে আওরঙ্গজেবের পরবর্তী প্রজন্মের অভিজাত শ্রেণী ও মনসবদারদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব ছিল না। এই সূত্রে নিজামউলমুলক, আবসুদ সামাদ খান, জ্যাকেরিয়া খান প্রভৃতি দক্ষ শাসিক ও সেনাপতির নাম উল্লেখ করা যায়। জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নাই একথা সত্য নয়। কারণ এমনকি নিজাম উলমুলক প্রয়োজনে মারাঠাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। জিজিয়া আদায়ের প্রশ্ন নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান বিরোধের প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ১৫২৬ সালে বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন থেকে শুরু করে ১৭৩৯ সালে নাদির শাহর আক্রমণ পর্যন্ত ১৯৭ বৎসরের ইতিহাসে ৫৭ বৎসর জিজিয়া আদায় করা হয়।

জিজিয়া আদায়ই সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান অনৈক্য সৃষ্টি করে নি। অষ্টাদশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় নি। শাওয়ালি উল্লারের ন্যায় দুই একজন মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুসলমান সাম্রাজ্য রক্ষার আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের ধর্মীয় রাজনীতির জীগির মানুষের মনে দাগ কাটে নি। আবার মারাঠারা একসময় যে হিন্দু পাদপাদ-শাহীর আওয়াজ তুলেছিলেন তা ছিল সাময়িক।[১৫] আজকের দিনে অতীতের পাতায় যাঁরা কেবল এইসব ঘটনার মধ্যে ইতিহাস খুঁজে বেড়ান তাদের স্বীয় মানসিকতা সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা এইসব সাম্প্রদায়িক ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করতে ব্যগ্র।

## ৪

ইতিহাসকে খুঁজতে হবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে। ইসলামের আগমণের ফলে উঁচুতলার শাসকগোষ্ঠীর তুর্কী আফগান ও মুঘলরা ও ব্যবসায়ী মহাজন এবং রাজস্ব আদায়কারী হিন্দুখুট, মুকদ্দাম, চৌধুরী ও বিত্তবান কৃষক জমিদারশ্রেণীর স্বচ্ছল অবস্থার কোন হেরফের হয় নি এবং তুর্কী শাসন ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ছিল।

তুর্কী শাসনের ফলে ভারতে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার দ্বারা অগণিত গ্রামীণ মানুষের জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। পুরাতন হিন্দু রাজস্ব-আদায়কারীরা নূতন শাসকশ্রেণীর দ্বারা পদচ্যুত বা ক্ষমতাচ্যুত হন নাই। যে কর তাঁরা কৃষক সাধারণের কাছ থেকে আদায় করতেন তার একটা অংশ রাজ্য সরকারের দেওয়া এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে রাজ্য সরকারের কর বন্ধ করে বিদ্রোহ করা এই ছিল রীতি, রাজস্ব আদায়কারী সুযোগ-সুবিধা পেলে কৃষকের উপর কর বৃদ্ধি করে বা রাজ্য সরকারের কর বন্ধ করে নিজেদের পকেট ভর্তি করতেন. তুর্কী শাসকশ্রেণী অগণিত সাধারণ কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের জীবনে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের জন্য কোন জোর জবরদস্তি করেন নি। বরং এতকাল তাদের যারা শোষণ করেছিলেন সেই হিন্দু, রায়, রাণা ও মুকদ্দাম প্রভৃতির হাতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ হতে থাকল। এর অর্থ এই নয় যে কৃষকরা নির্বিবাদে সকল প্রকার শোষণ ও কর বৃদ্ধিকে মেনে নিয়েছিলেন। কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহ তুর্কী সুলতানী শাসন ও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে, বর্তমানকালের অনেক ইতিবৃত্তকারের লেখনী থেকে সাধারণত ধারণা

হয় যে মুঘল সাম্রাজ্য প্রধানত আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষী নীতির ফলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিল।

এই সকল ঐতিহাসিক মুঘলসাম্রাজ্যের গঠনতান্ত্রিক দুর্বলতা ও জায়গীর প্রথার কুফলের বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিস্মৃত হন যে কৃষক বিদ্রোহ ও অসন্তোষ, মুঘল ও তুর্কীদের পতনের অন্যতম কারণ। এই সকল অসন্তোষ কখনও কখনও মধ্যযুগীয় রীতিতে ধর্মের আবরণে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁদের অন্তর্নিহিত কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ।

এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তুর্কী ও মুঘল আমলে শহরে ও রাজধানীতে শাসকশ্রেণী ও তাদের সৈন্যদের আবাসস্থল ছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেক সময়ে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহালও ছিল না। গ্রামীণ ভারত অধিকাংশ মানুষ তাদের পুরাতন পদ্ধতিতে হিন্দু রায় রানাদের রাজস্ব দিত। এই রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে অসন্তোষ দেখা দিত। এইজন্য তুর্কী ও মুঘলের আমলে কৃষক বিদ্রোহগুলি দেখা দেয়। এই বিদ্রোহগুলি ধর্মীয় কারণে হয় নি, হয়েছে আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে।

সাধারণত যদি প্রশ্ন করা যায় যে তুর্কী ও মুঘল আমলে দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা কারা ছিল তাহলে আমরা সবলেই উত্তর দেব সুলতান ও আমীররা এবং মুঘল যুগে বাদশাহ ও মনসবদাররা। কিন্তু অগণিত গ্রাম ভারতে এদের উপস্থিতি সরাসরি খুব স্বল্পক্ষেত্রেই দেখা যাবে। মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য শাসকরা ভারতের কৃষিব্যবস্থায় বা রাজস্ব প্রথায় অথবা জীবনযাত্রার বিশেষ পরিবর্তন আনতে আগ্রহী ছিলেন না। শহরের অধিবাসী মধ্যযুগীয় আমীর ওমরাহ বা সৈন্যদল কৃষিকর্মে লিপ্ত হয়ে সামরিক বিদ্যা বিস্মৃত হতে রাজী ছিলেন না। অতএব গ্রাম ভারতের কৃষিজীবী মানুষ যাদের দ্বারা চিরকাল শোষিত হয়েছেন সেই মধ্যস্বত্বভোগী রায়, রানা, মুকদ্দাম, চৌধুরীর দ্বারা তুর্কী ও মুঘল আমলেও উৎপীড়িত হতেন, মধ্যযুগীয় তুর্কী ও মুঘল শাসকরা এদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। জিয়াউদ্দীন বারানী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ লেখক যখন হিন্দু এই শব্দ ব্যবহার করেন তখন তাঁরা এইসকল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথাই বলেন এবং প্রধানত তাঁদের বিরুদ্ধে, এই সকল গোঁড়া লেখকরা বিষোদগার করেছেন, সাধারণ কৃষকদের বিরুদ্ধে[১৬] নয়।

সাধারণভাবে শাসকশ্রেণীর আর রাজস্ব আদায়কারীদের অতিরিক্ত ক্ষমতা-

বৃদ্ধির ফলে বা রাজকর্মচারীদের স্বৈরাচারিতার জন্য এই সম্পর্কহানির সম্ভাবনা ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাজস্ব আদায়কারীদের ক্ষমতা হ্রাস করে প্রথমোক্ত কারণ দূর করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়কারীরা কৃষকদের সরকার বিরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করত। এই বক্তব্যের উদাহরণ হিসাবে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী ও সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি সম্পর্কে নীতির পার্থক্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সুলতান আলাউদ্দীন দোয়াবে কৃষকদের উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত শস্যের জন্য নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে তার থেকে লাভের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকও প্রায় এই একইবারে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন কিন্তু উদ্বৃত্ত শস্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করেন নি. কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আমলে দোয়াবে কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আলাউদ্দীনের নীতি সাফল্য অর্জন করেছিল। উভয়ের রাজত্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত অল্প, একজনের আমলে কৃষকরা দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহী হয়েছিল. অন্যজনের আমলে হয় নি কারণ আলাউদ্দীন রাজস্ব আদায়কারীদের শোষণ বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর মহম্মদের নীতির ফলে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাজস্ব আদায়-কারীরা কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহী হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রায় ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে যে সকল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করে ডক্টর ইরফান হাবিব এই যুগে করভার প্রপীড়িত কৃষকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন[১৭], এই সূত্রে ডক্টর বলেছেন যে মুঘলদের পতনের অন্যতম হচ্ছে সাম্রাজ্যের আর্থিক নীতি। যার ফলে জমিদার ও জায়গীরদারদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের আঁতাত গড়ে উঠেছে। হাবিবের ভাষায় বলা যায় আমরা যেসকল সংঘর্ষের কথা জানি তারা প্রধানত আর্থিক শোষণের ফলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল. ধর্মীয় কারণে নয়। প্রথমত শাসকশ্রেণী ও হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়ত রাজস্ব আদায়কারী ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তৃতীয়ত শাসকশ্রেণী ও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকের দ্বন্দ্ব—এই তিন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটেই ঐ যুগের সংঘর্ষগুলিকে দেখতে হবে। মধ্যযুগীয় ভারতের তুর্কী ও মুঘল শাসকশ্রেণী যে হাঁসটি সোনার ডিম দেয় তাকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করতেন। এইজন্য তারিখ ফকরউদ্দীন মুবারক শাহীর লেখক বলেছেন[১৮]

সম্পদ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব থাকে না, চাষী ছাড়া সম্পদ উৎপাদন করা অসম্ভব। সুশাসন ব্যতীত চাষীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় না, শান্তি ছাড়া সুশাসন অসম্ভব, মোঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও জমিদারেরা প্রায়শই সম্পর্কিত হয়ে সামিল হতো। এভাবে কৃষকের কেবলমাত্র যে জমিদারের জমিতে ফসল ফলিয়েই জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধি করত না, উপরন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁর কার্যনীতিও দলবৃদ্ধি করত। এই পথেই মুঘলদের বিরুদ্ধে দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্রোহ পরিচালিত হয়, মারাঠা ও জাঠদের এই বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত পুরো সাম্রাজ্যবাদই ভস্মসাৎ করে, লক্ষ এবং শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল আর্থিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় অনুশাসন প্রচারের মানদণ্ডে নয়। রাজস্ব আদায়কারী বিত্তবান হিন্দুদের সম্পর্কে যেসব বিষোদ্গার সমকালীন ইতিহাসে শোনা যায় তার মূল কারণ ধর্মের মধ্যে নয় তৎকালীন আর্থিক ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত ছিল এইজন্য দেখা যায় যে ফিরুজশাহ তুঘলুকের নায় গোঁড়া ধর্মান্ধ সুলতান কৃষির ও কৃষকের উন্নতির জন্য ব্যগ্র এবং সেচব্যবস্থার মারফতে গ্রামাঞ্চলের চাষবাসের উন্নয়ন করতে আগ্রহশীল, কিন্তু জায়গীরদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা কৃষক বা কৃষিব্যবস্থার স্বার্থে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তাঁরা স্বল্পকালের মধ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে ব্যগ্র ছিলেন এবং নির্মমভাবে কৃষককে শোষণ করতেন ও রাষ্ট্রকে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করতেন। কাফি খাঁ অভিযোগ করেছেন যে সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সকল কর থেকে সর্বসাধারণকে রেহাই দিয়েছিলেন ফৌজদার ও জমিদারদের জন্য সেই সকল আইন কার্যত কোন লাভজনক ফল হয়নি, কিন্তু শাসকশ্রেণী রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও উভয়ের শোষণের ফলে কৃষকসমাজ উৎপীড়িত হতেন। এই যুক্ত শোষণের সঙ্গে ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। কৃষকশ্রেণী কিন্তু নীরবে এই শোষণকে সর্বত্র স্বীকার করে নেয় নি। মধ্যযুগের ইতিহাসে এই জন্য কৃষকে বিদ্রোহের বহু ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় এবং মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যগুলির উত্থান ও পতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে ধর্মবিরোধে নয়।

৫

ভারতের তুর্কী বিজয়ের ফলে এই দেশের শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সর্বশ্রেণী ও ধর্মের লোক নাগরিক জীবনের আস্বাদ লাভ করে। কোন

কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলে বর্ণনা করেছেন।[১৯] কিন্তু শহরে জীবনযাত্রায় ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সুষ্ঠভাবে প্রতীয়মান। ধনী আমির ওমরাহরা বিলাস লালসাময় মদির মধুর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আর দরিদ্র সাধারণ চরম কৃচ্ছতার মধ্যে দৈনন্দিন আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন। দরিদ্র অধিবাসীদের দৈনন্দিন আয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। সামসী সিরাজ আফিক তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে বলেছেন যে ৪টি রৌপ্য জিতল ( ৪৮ জিতল ১ তংকা, H. N. Wright cionage & Metrology of the Sultans of Delhi, পৃঃ ৭৩ ) ব্যয় করলে দিল্লী থেকে ফিরোজাবাদে পাঁচক্রোশ পথ যাবার যানবাহন পাওয়া যেত, পাল্কীবাহকরা এই পথের ভাড়া নিত অর্ধ তংকা এবং ঘোড়ার জন্য লাগত ১২ জিতল। আফিকের মতে শহরে রাস্তাঘাটে অজস্র বেকার মজুর পাওয়া যেত।[২০] একটা সাধারণ হিসাবেই এই সকল দরিদ্র পাল্কীবাহকদের দৈনন্দিন আয়ের একটা ধারণা পাওয়া যায়। কমপক্ষে চারজন পাল্কীবাহক পাঁচক্রোশ পথ অতিক্রম করে ২৪ জিতল আয় করত অর্থাৎ এক একজন দিনে মাত্র ৬ জিতল লাভ করত। সহজেই বোঝা যায় যেখানে অজস্র বেকার মজুর শহর ভর্তি সেখানে একজন মজুর পাল্কীবাহকদের চেয়ে বেশী পেত না। একথাও সহজেই অনুমেয় যে পাঁচক্রোশ পথ পাল্কী বহন করবার পর কারো পক্ষে একই দিনে অন্য কাজের ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না আর কাজের চেষ্টা করলেও পাওয়া সহজ ছিল না। অতএব ধরা যায় যে একজন সাধারণ দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের আয় তৎকালীন যুগে ছিল ৬ জিতল। সাধারণ একটি পরিবারে যদি পিতামাতা ও দুটি সন্তান থাকে তাহলে মাথা পিছু দৈনন্দিন আয় দাঁড়ায় দেড় জিতল অর্থাৎ মাসে এক তংকার মতো। এই আয়ের উপর ভিত্তি করে কোনক্রমে সংসার নির্বাহ করতে হোত।[২১] কে. এম আশরফ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এক তংকা আয়ের একজন ব্যক্তির সংসার খরচ নির্বাহ সম্ভব ছিল। আশরফের বক্তব্য অনুসারে মাসালিক উল আবসার এর গ্রন্থকার তাঁর সংবাদদাতার বক্তব্য উদ্ধৃত করে জনৈক খোজান্দি নামক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনজন বন্ধুসহ খোজান্দিকে সেদ্ধ গোমাংস, রুটি ও মাখন সহ খাদ্য দেওয়া হলে তার জন্য খরচ পড়েছিল ১ জিতল। এই খরচাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিয়ে যদি আমরা হিসাব করি দেখব দৈনিক খাদ্যের দুবেলার যোগানের জন্য কোন ব্যক্তির একমাসে গড় খরচা হবে ১৫ জিতল। প্রাতরাশের জন্য আরও ৫ জিতল যোগ করলে, খাদ্যের জন্য মাসে

গড় খরচা পড়ে ২০ জিতল। বস্ত্র ও অন্যান্য খাতে ব্যয় একসঙ্গে ধরে নিলে বেশী করে ধরলেও প্রতি মাসে ১ তংকার বেশী খরচ হতে পারে না।[২২] যে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষা কোনক্রমেই ভাল ছিল না. তৎকালীন আমীর ওমরাহরা এতদূর বিলাসী ছিলেন যে তাঁরা অনেক সময় একটি পোষাক দিনে একবার পরিধান করেই ত্যাগ করতেন।[২৩] জিয়াউদ্দীন বারাণী অভিযোগ করেছেন যে ধনী হিন্দুরা কিংখাপের পোষাক, অলঙ্কার ও বাদ্যবাজনা ব্যবহার করে, তাদের বিলাসিতার তুলনায় দরিদ্র মুসলমানদের দুর্দশা বারাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বারাণী এক্ষেত্রে উগ্র ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রশ্ন বিচার করেছেন। তাঁর অভিযোগ প্রধানত বিত্তমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে। মূলত তৎকালীন আর্থিক কাঠামোতে দরিদ্র সাধারণ ধর্মমত নির্বিশেষে শোষিত ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের বিত্তবানরা বিলাসী জীবন যাপন করতেন।

শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বিত্তবান হিন্দু। বণিকশ্রেণী হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সহযোগিতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। মিনহাজ সিরাজের তারকত-ই নাসিরী থেকে আমরা জানতে পারি যে সুলতান মুইজুদ্দীন বহরম শাহের (সুলতান ইলতুতমিসের পুত্র) রাজত্বকালে লাহোর যখন মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন শহরের শাসনকর্তা মালিক কায়াকুম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বণিকদের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে তাকে লাহোর পরিত্যাগ করতে হয়।[২৪] এই কাহিনী থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তৎকালীন যুগে বণিকশ্রেণীর সহযোগিতা লাভ দেশের প্রতি-রক্ষার ক্ষেত্রে কতদূর গুরুত্ব লাভ করেছিল লাহোর বণিকরা মোঙ্গল খানদের অনুমোদন নিয়ে তাঁদের অধিকৃত দেশে বাণিজ্য করতেন। অতএব আর্থিক স্বার্থে বণিকশ্রেণী সুলতানী শাসনের স্বার্থকে অবহেলা করেছিলেন।

আর্থিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বণিকশ্রেণী কতদূর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন তার আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলুকের রাজত্বকালে, সুলতান ফিরুজশাহের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লীতে দূরদূরান্তর থেকে যেসব বণিক দিল্লী শহরে পণ্য সরবরাহ করতেন, তাদের আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হতো। একবার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আমলাদের কোপে পড়ে এবং তার তিন মণ তুলা আটক করা হয়। আকস্মিকভাবে এই তুলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল, ফলে ব্যবসায়ী মহলে এতদূর অসন্তোষ উপস্থিত হয় যে তারা দিল্লী পণ্য আমদানী বন্ধ করে দিয়েছিল, ফলে এই ঘটনা সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিল এবং তিনি বেআইনী কর ও উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেন।[২৫] আর্থিক স্বার্থে বণিকশ্রেণীর ঐক্য সম্পর্কে কাফী খানও উল্লেখ করেছেন। মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবার জন্য আওরঙ্গজেব হুকুম-জারী করেছিলেন যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পণ্যের উপর মুঘল সাম্রাজ্যে কোন শুল্ক আদায় করা হবে না। কিছুকাল পরে এই হুকুমনামা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে মুসলমান বণিকেরা পণ্যের পরিমাণ কম হলে রেহাই পাবে। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে মুসলমান বণিকই একএকবারে স্বল্প ওজনের পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করছে এবং হিন্দু বণিকদের পণ্য অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান বণিকদের নামে চালান করা হয় হচ্ছে। এইভাবে আর্থিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ বণিকশ্রেণী ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের আইনকে ফাঁকি দিতে শুরু করে।[২৬]

৬

অতএব দেখা যায় মধ্যযুগের ইতিহাসে ফিরুজ তুঘলুক বা আওরঙ্গজেবের ন্যায় ধর্মান্ধ শাসকরা যে গোঁড়ামি প্রদর্শন করেছিলেন, সাধারণের মধ্যে সেই গোঁড়ামির বিস্তার লাভ করে নাই। মধ্যযুগেও সমাজে রক্ষণশীলতা ও সামাজিক প্রথা সর্বত্র মানুষকে ধর্মের গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়। ভারতে ইসলামের আগমনের পরবর্তী যুগে এই গোঁড়ামি প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন মানসজগতে যে ঐক্যের সেতুবন্ধ রচনা করে ফলশ্রুতি হিসাবে সুফী, বৈষ্ণব ও ভক্তি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মিলনের ফলে নূতন সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয় এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিলনের পথ প্রস্তুত করে। এইজন্য যে সব লেখক প্রাক-বৃটিশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের চিত্র অঙ্কিত করেন সাম্রাজ্যবাদের বিভেদমূমক রাজনীতিকে অস্বীকার করেন তাঁদের বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট। বিগত কয়েক বৎসর পাকিস্তানের রাজনীতি ও বর্তমানে বাংলাদেশের ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্মের নামে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা মানুষকে শোষণ করে। কিন্তু ধর্ম তাদের কাছে বড় নয়, নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা ধর্মান্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের একশ্রেণী বুর্জোয়াদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টার ফলেই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় দেশবিভাগ হয়েছিল।[২৭] পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ও পরে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেভাবে ভারতের ইতিহাসে

উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ সামাজিক বিভেদ ও ধর্মীয় মত পার্থক্য সত্ত্বেও এই দেশের মাটিতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ইতিহাস রচিত হয়েছে।

## পাদটিকা

১ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, দ্বাদশ খণ্ড, (১-৪, ১৯৭০) ;

২ পৃথ্বীরাজ রাসো ( নাগরী প্রচারণী গ্রন্থমালা ) পঞ্চম খণ্ড, ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমন্ত সাউ, শ্রীধর, সুন্দর, যশোধর ইত্যাদি অনেক বণিকের নাম উল্লিখিত আছে এবং চাঁদ বরদাইর সঙ্গে রাজ সন্দর্শনে যায় বলে দাবী করা হয়েছে ;

৩ ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী চাঁদ বরদাইর কাব্যে 'ইতিহাসের সারমর্ম' পাওয়া যায় বলে তার গ্রন্থে ( Dynastic Hist. of N. India দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৫ ) মত প্রকাশ করেছেন, পৃথ্বীরাজ রাসোতে সমকালীন পরিস্থিতির একটি চিত্রাংকন করা হয়েছে এবং কোন কোন প্রক্ষিপ্ত ঘটনায় বহু অংশ কন্টকিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থ পাঠে সমসাময়িক চিন্তা ও ধারণার অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে গবেষণা-মূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য ডঃ বিপিন বিহারী ত্রিবেদীরই রেহাতট সময় ( হিন্দী ) পৃঃ ২২২ দ্রষ্টব্য ;

৪ আল-বেরুণীর ভারতবর্ষ ( ইং অনুবাদ স্যাচু ) পৃঃ ১০১-০২ ;

৫ ঐ পৃঃ ২২-২৩ ;

৬ কিতাব-ই-ইয়েমিনী—লেখক-আলাউতবী ( ইং অনুবাদ, রেনল্ডস্ ) পৃঃ ৩৬৫-৬৭ ;

৭ ভারতবর্ষের ইতিহাস—রোমিলা থাপর পৃঃ ২৪১ ;

৮ নিঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষণ (অমৃতবাজার, ২৭শে অক্টো, ১৯৫৩ )

৯ হিদাইয়া ( ইং অনুবাদ হামিলটন ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১, ২১৪, মহেসাভান থিয়োরী অব ফিনান্স-এগনাইডস, পৃঃ ৫৯৮-৯৯ ;

১০ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ( বি, আই ) জিয়াউদ্দীন বারাণী, পৃঃ ২৯০-৯৫ ;

১১ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯৪১ ;

১২ রাজনৈতিক কারণে উপবাসের দৃষ্টান্তের জন্য রাজতরংগিনী ( ইং অনুবাদ আর, এস. পণ্ডিত ) পৃঃ ৩৪৮, ৩৮৪ দ্রষ্টব্য ;

১৩ থাপর, পৃঃ ২৫৯ পাদটিকা :

১৪ আওরংজেবের দরবারে সুষম অভিজাতশ্রেণী—( বাংলা সংস্করণ ) এম, আতাহার আলি, পৃঃ ২৪০-২৪২ ;

১৫ মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি ( ইং সংস্করণ ) সতীশচন্দ্র, পৃঃ ২৫৭ ;

১৬ এগরেরিয়ান সিসটেম ইন মুসলিম ইণ্ডিয়া, মোরল্যাণ্ড, পৃঃ ৩২ পাদটিকা :

১৭ এগরেরিয়ান কজেস অব দি ডাউনফল অব দি মুঘল এম্পায়র, ইরফান হাবিব ( ইনকোয়ারী, ২য় খণ্ড, ১৯৫৯ ) ;

১৮ তারিখ-ই-মুবারকশাহী, যকরমুদাবির (ইং অনুবাদ স্যার ডেনিসন রস) পৃঃ ৩৬ ;

১৯ ইনট্রোডাকশন টু দি হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ( ইলিয়ট এণ্ড ডাউসন, আলিগড় সংস্করণ ) মহম্মদ হাবিব ;

২০ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ( বি, আই ) সামসী সিরাজ আফিফ পৃঃ ১৩১ ;

২১ পিপল্ এণ্ড পলিটিক্স ( ইণ্ডিয়ার বুক ডিসট্রিবিউটিং কোং ) পৃঃ ২৮ ;

২২ লাইফ এণ্ড কনডিসন অব দি পিপল্ অব হিন্দুস্তান, আসরফ, পৃঃ ১৩১ ;

২৩ বারাণী, পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭-১১৯ ;

২৪ তবকত-ই-নাসিরী ( ইং অনুবাদ রাভেটি ), মিনহাজ, পৃঃ ৬৫৫-৫৬ টিকা ;

২৫ সামসী সিরাজ আফিফ, পৃ: ৩৭৬-৭৭ ;

২৬ সুনতখাব উল লরাব ( ইং অনুবাদ ), কাফী খাঁ, পৃঃ ২২৯-৩০ ;

২৭ এ হিষ্ট্রি অব পাকিস্তান ( ১৯৫৭-৫৮ ) পৃঃ ১৬, নাউকা পাবলিশিং হাউস ( মস্কো, ১৯৬৪ ), তরাই, বি গনদাউস্কী, এল, আর, গর্ডন—পোলোস্কয়া ।

# আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবে বাংলার জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ একটি সমীক্ষা

রঞ্জিত সেন

আঠারো শতকের প্রথম সিকিভাগ সময় বাংলাদেশের জমিদারের পক্ষে অবক্ষয়ের না সংরক্ষণের সময় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। যদুনাথ সরকার মনে করতেন মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকাল বাংলাদেশের জমিদারি ব্যবস্থার পক্ষে বিপর্যয়ের কাল। তাঁর মতে মালজামিনি ব্যবস্থা জমিদারদের পতনকে নিশ্চিত করেছিল। মুর্শিদকুলি ধরেই নিয়েছিলেন যে জমিদাররা অলস অকর্মণ্য অতএব তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না। রাজস্বের বৃদ্ধি ও বর্ধিত রাজস্বের সুষ্ঠু আদায় যেখানে লক্ষ্য সেখানে কেমন করে জমিদার-দের উপর তিনি নির্ভর করবেন? অতএব রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের উপর রাষ্ট্রিক নির্ভরশীলতার নীতিটি বাতিল হল। মুঘল বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থার মূল ব্যক্তির উপর এইভাবে অনাস্থা জারি হলো। জমিদারদের বদলে রাষ্ট্রের আস্থাভাজন হলো আরেক শ্রেণীর কর্মচারী যার নাম আমিল। মুর্শিদকুলি চাইতেন রাজস্বের প্রাক্-অঙ্গীকার ( pre-guarantee ) অতএব আমিলরা রাষ্ট্রকে দিল নির্দিষ্ট জামিন ( security, ফার্সি ভাষায় মালজামিন যার অর্থ রাজস্বের জামিনদার )। রাষ্ট্র তাদের দিল রাজস্ব আদায়ের অধিকার। তারা জমিদারদের মাথার উপর একশ্রেণীর নতুন কর্মচারী হয়ে জমিদারদের তদারকি পেল। যদুনাথ সরকারের অভিমত হলো এইসব আমিলরা কালক্রমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সনাতন ভূস্বামী অভিজাতরা ( Territorial Aristocracy ) এইভাবে ধ্বসে যায় এবং তাদের স্থলে নূতন একশ্রেণীর রাজস্বের স্বত্বাধিকারী মানুষের আবির্ভাব ঘটল যাদের সাথেই ১৭৮৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন। শুরুতে এই আমিলরা ছিল ঠিকাদার (Contractors) যাদের আঠারো শতকে ফরাসী দেশের ফার্মিয়ার্স জেনারেলদের (Farmiers General) সাথে তুলনা করা হয়। তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের ঠিকাদার, আর এক শতাব্দী ধরে গ্রাম বাংলায় কায়েম থেকে ইংরাজ আমলে তারা জমিদারির স্বত্ব পেল।

যদুনাথ সরকারের ঐ মতটির মধ্যে অনেক তাৎপর্য নিহিত আছে। আর তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে কিছু প্রশ্ন। নীচে সেগুলি লিপিবদ্ধ হলো।

প্রথম প্রশ্ন ঃ সনাতন ভুস্বামীদের পতনের সাথে সাথে কি জমিদার ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়েছিল ?

সনাতন ভূস্বামীদের পতনের সাথে সাথে যে জমিদারি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল একথা যদুনাথ সরকার ভিন্ন অন্য কোন ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন যে মুর্শিদকুলির আমলে জমিদারি ব্যবস্থার পতন বা পরিবর্তন হয় নি। মুর্শিদকুলির নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারের যে ব্যয় হত তার সঙ্কোচন ঘটানো। সার্বিকভাবে প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করা যে মুর্শিদকুলির লক্ষ্য ছিল তা যদুনাথ সরকার স্বীকার করেছেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন যে আঠারো শতকে বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ছিল। আর তারা রাজস্ব আদায় করার সময় অনেকখানি নিজেরা আত্মসাৎ করত। এতে রাষ্ট্রের মোট রাজস্বের পরিমাণ কমে যেত। ফলে মুর্শিদকুলি রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের 'ইউনিট' বা এককরূপে ছোট ছোট জমিদারির বদলে বড় বড় জমিদারি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ছোট ছোট জমিদাররা যখনি রাষ্ট্রের দাবীর সমপরিমান রাজস্ব সরকারি তহবিলে পাঠাতে অসমর্থ হতো তখনই তিনি তাদের সন্নিকটের কোন বড জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করতেন সেইসব ছোট জমিদারিগুলিকে। ফলে মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বেশ কয়েকটি বড জমিদারির উদ্ভব হয়েছিল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালকে জমিদারি বিনাশের নয়, জমিদারি সংরক্ষণের কাল বলা যেতে পরে। নরেন্দ্রকৃষ্ণর এই মত স্বীকার করেছেন আর দুজন ঐতিহাসিক—আব্দুল করিম ও তপন রায়চৌধুরী।

নূতন জমিদারির আবির্ভাবের কথা যদুনাথ সরকারও স্বীকার করেন নি। তাঁর রচনায় একটি পরিচ্ছেদ নিয়োজিত হায়ছে এই জমিদারি উত্থান বিষয়টির আলোচনায়! ক্ষুদ্র জমিদারদের যূথবদ্ধ করে বড়মাপের কোন জমিদার করা হলো কিনা এইটি বড় বিষয় নয়। বড বিষয় হলো 'আমিল' নামক এক ঠিকাদারশ্রেণীর আবির্ভাব, গ্রাম বাংলায় তাদের স্থায়ী অধিষ্ঠান, রাষ্ট্রের অধস্তন প্রতিভূরূপে জমিদারদের উপর তাদের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ গ্রাম বালায় এক নতুন মধ্যস্বত্বের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে ইংরাজ শাসনের সময় তাদের আইনগত স্বীকৃতি। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা মূলতঃ একটি ত্রিস্তর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে নীচের স্তরটি হলো কৃষকদের স্তর। এখানে

কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তির মানুষেরা একেকার হয়ে সামাজিক উৎসাদনের বনিয়াদী পর্বের সামান্যজনদের স্তরটি রচনা করে। এটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্তর, ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত বনিয়াদিস্তর। ত্রিস্তরের দ্বিতীয়টি শীর্ষের স্তর সংখ্যা লঘিষ্ঠের স্তর—রাজস্বের চূড়ান্ত আত্মসাৎকারী রাষ্ট্রের স্তর। এই স্তরের মানুষ হলো নবাব ও আমিরশ্রেণীর মানুষ। এই দুইস্তরের মাঝখানে হলো মধ্যস্তর জমিদার ও তালুকদারদের স্তর, যারা উৎপাদক মানুষের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রাজস্বরূপে তাকে রাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করে। রাষ্ট্রের দাবী ও জনগণের উত্তর যে বিন্দুতে মিলিত হয় এটি সে মধ্যস্বত্বভোগীর স্তর। এটা পুরুষ পরম্পরায় সামাজিক উদ্বৃত্তের স্তর। জমিদারের পুত্র জমিদার, তার পুত্র জমিদার—

এইভাবে জমিদারিতে তাদের পুরুষানুক্রমিক স্বার্থ জড়িত ছিল। তারা কৃষকের কাছে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি, শাসক নামের অন্তরালে ভক্ষক ও শোষক। কিন্তু এই জমিদারই আবার বিপদের দিনে কৃষকের ত্রাতা—ধান রোপণের সময় তাকে 'তাকাভি' ঋণ জমিদারই দিত, বন্যার জলে বাঁধ বেঁধে দিত জতিদার, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অজন্মার সময় খাজনা মকুব করত জমিদার, গ্রামের পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচ বহন করত জমিদার। মুঘল শাসনে শোষণ নিষ্পেষণের সাথে কল্যাণধর্মিতার যে দিকটি ছিল গ্রাম পর্যায়ে বা পরগনা পর্যায়ে তার বাহক ও ধারক ছিল জমিদাররা। মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে 'আমিল' নামে যে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হল তারা রাষ্ট্রিক কল্যাণের এই পতাকাটি কেউ বহন করে আসেনি। গোলমালটা এইখানে। তাহলে কি আমিলদের উপস্থাপনার সাথে সাথে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার ত্রিস্তর কাঠামোটি ভেঙ্গে গেল? এইটি হল আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন যা নীচে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ *মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোটি কি বদলে গিয়েছিল?*

মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনের যদি কোন লজিক থাকে ছিল একটি—রাজস্বের সর্বাধিকরণ (Maximization of revenue)। যে কাঠামোতে রাজস্বের সর্বাধিকরণ সম্ভব রাষ্ট্রের কাছে তাই গ্রহণীয়। এদিক থেকে মধ্যস্বত্বভোগীর বিনাশ নিসন্দেহে রাষ্ট্রের পক্ষে কাম্য। এই দৃষ্টিকোণ যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে বলা যেতে পারে যে মুর্শিদকুলি খাঁর মুষ্টিমেয় ঠিকাদার বা ভাড়াটে রাজস্ব আদায়কারী দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে

খাজনা আদায়ের দায়িত্বটা সেরে নিতে চাইছিলেন, অন্ততঃ তাতে খরচ কম ছিল। বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীদের নিষ্ক্রিয় করতে পারলে বিপুল পরিমাণ রাজস্বের মধ্য পর্বে আত্মসাৎ (Middlegrade interception) হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে রোধ করতে পারতেন। অতএব মুর্শিদকুলি খাঁ যদি জমিদারদের উচ্ছেদ করতে নাও চাইতেন তবে অন্তত তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা তার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ আমিল নামে ঠিকাদারদের তিনি নিয়োগ করবেন কেন? যদি জমিদারদের উচ্ছেদ তিনি ঘটাতে না চেয়ে থাকেন তাহলে রাজস্বে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানোর কোন বাসনা তাঁর ছিল না।

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে আব্দুল করিম দুটি মন্তব্য করেছেন। এক, মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরাজদের মতো জমিকে সর্বোচ্চ ডাকে নিলামে তুলে দেন নি। দুই, সালিমুল্লাহ্‌র তারিখ-ই-বাঙ্গালা পড়লে দেখা যায় যে মুর্শিদকুলি রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিলদের পাশাপাশি নিয়োগ করেছেন। আব্দুল করিমের মন্তব্য থেকে যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্বের সর্বাধিকরণ চেয়েছিলেন কিন্তু কাঠামোকে আমূল বদলে দিতে চান নি। মুর্শিদকুলি খাঁ ত জমির হাস্তাবুদ করিয়েছিলেন। জমির উৎপাদন শক্তি কত, রাজস্ব দেবার ক্ষমতা প্রজাদের কতটুকু আছে, রাষ্ট্র কি হারে রাজস্ব দাবী করতে পারে তা জানার জন্যইত হাস্তাবুদের ব্যবস্থা। তবে কেন তিনি ঠিকাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দেবেন? এ প্রশ্ন করেছেন আব্দুল করিম। অর্থাৎ আব্দুল করিম বলতে চাইছেন যে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের প্রথাগত ব্যবস্থা থেকে সরে আসেন নি। জমির হাস্তাবুদ করিয়ে তিনি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে এক নিশ্চিত বনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।

মনে রাখা দরকার যে আব্দুল করিমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল যদুনাথ সরকারের মন্তব্যকে খণ্ডন করা। যদুনাথ সরকার তাঁর তথ্য গ্রহণ করেছিলেন সালিমুল্লাহ্‌র তারিখ-ই-বাঙ্গালা থেকে। আব্দুল করিমও অনেকখানি নির্ভর করেছেন সালিমুল্লাহ্‌র উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে সালিমুল্লাহ্ তার বইয়ের কোন কোন জায়গায় মুর্শিদকুলির অত্যাচারের দিকটা বড বেশী করে দেখিয়েছেন। অতএব সঠিক ব্যাখ্যার জন্য অন্যত্র তথ্যের সন্ধান করতে হল মুর্শিদকুলির সমর্থক ঐতিহাসিকদের। হাতের কাছেই তাঁরা পেয়ে গেলেন জেমস্ গ্র্যাণ্টের বিস্তারিত আলোচনা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহত জেমস্ গ্র্যাণ্টের মন্তব্যকে মেনে নিয়ে বলেছেন যে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে বাংলার

ইতিহাসের এটি স্মরণীয় কাল। জেমস্ গ্র্যাণ্টের সমসাময়িক আর একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক নবাবি আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি হলেন জন শোর। শোরও গ্র্যাণ্টের মত রাজস্বের দৃষ্টিকোণ থেকে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালকে আলোচনা করেছেন। অথচ মুর্শিদকুলির সমর্থক ঐতিহাসিকরা শোরকে যথেষ্ট গ্রাহ্য বলে মনে করেন নি।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ—রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন কতখানি অর্থবহ ?

মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে রাজস্বে হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করলে বোঝা যায় তিনি জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন কিনা। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করলেন তখন রাষ্ট্রের বাৎসরিক নির্ধারিত রাজস্ব ছিল ১,১৭,২৮,৫৪১ টাকা। তারপর থেকে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব নির্ধারণের পরিবর্তন এই রকম ঃ—

| বছর | লক্ষ পরিমাণ টাকায় | বাৎসরিক বৃদ্ধি টাকায় | শতকরা হারে |
|---|---|---|---|
| ১৭০১ | ১,২০,৪৯,৯৮৯ | ৩,২১,৪৪৮ | + ৩·২ |
| ১৭০২ | ১,২৪,৭৯,২৫১ | ৪,২৯,২৬২ | + ৩·৬ |
| ১৭০৩ | ১,২৫,৪১,০১৮ | ৬,১৭,৬৭ | + ০·৫ |
| ১৭০৪ | ১,২৫,৫৫,৫৬৯ | ১,১৪,৫৫১ | + ০·৯ |
| ১৭০৫ | ১,২৬,৬৮,০৬৯ | ১৩,৫০০ | + ০·৯ |
| ১৭১০ | ১,২৫,৭৮,৭২৪ | | |
| ১৭১১ | ১.৩৪,০০,১৭৫ | ৭.২১,৪৫১ | + ৫·৭ |
| ১৭১২ | ১.৩৪.২৬,৯৩৮ | ২৬,৭৬৩ | + ০·২ |
| ১৭১৩ | ১,৩৫,৭০,০৮৭ | ৪৩,১৪৯ | |
| ১৭১৪ | ১,৩৫,৭১,৫১৭ | | |
| ১৭১৫ | ১,৩৪,৭৯,৫৪৮ | ৩,০৮,০৩১ | + ২·৩ |
| ১৭১৬ | ১,৩৯,৩৯,৪০১ | ৯৮,৮৫৩ | + ০·৪৩ |
| ১৭১৯ | ১,৪০,৩০,৩৫৩ | | |
| ১৭২০ | ১,৪০,৯১,৩২৬ | ৬০,৯৭৩ | + ০·৪৩ |
| ১৭২১ | ১,৪১,০৯,১৯৪ | ৭.৭,৮৬৮ | + ০·১৩ |

উপরেব তালিকায় মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব-বছর ও রাষ্ট্রীয় রাজস্ব দাবির হেরফের দেখানো হয়েছে। এরমধ্যে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হল নিম্নরূপ।

এক.   মুর্শিদকুলির বাংলাদেশে আসার তারিখ ১৭০০ ও ১৭১০ সাল (১৭০৮ থেকে ১৭১০ তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন)। এই দুই তারিখের অব্যবহিত পরের দু এক বছর রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমহ্রাসমানতার সূত্রকে ঠেকানো যায় নি। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথমবার বাংলাদেশে আসার পর ১৭০৩ সালে ও দ্বিতীয়বার আসার পর ১৭১১ সালে রাজস্বের দাবী সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল যথাক্রমে ছয় লক্ষাধিক ও সাত লক্ষাধিক টাকা। ১৭০২ সালে এই বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ৩.৬ এবং ১৭১১ সালে ছিল ৫.৭। এর থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রের পক্ষে প্রগতিশীল খাজনা আদায়ের প্রবণতা ছিল। এ প্রবণতা যদি নিরঙ্কুশ প্রবণতা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামো বদলের প্রয়োজনীয়তা ছিল। নিরঙ্কুশ রাজস্ব চাহিদা যদি থাকে তবে কোন ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে এই চাহিদা ছিল। আলমগীর ঔরংজেবের প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। তিনি দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্যব্যদী লড়াইয়ের শেষ পর্বে এসে উপনীত হয়েছিলেন। উত্তর ভারত থেকে কোন রাজস্ব তাঁর হাতে পৌঁছাচ্ছিল না। অতএব তিনি দাক্ষিণাত্যের দক্ষ প্রশাসক মহম্মদ হাদিকে (যাঁর পরবর্তী নাম মুর্শিদকুলি খাঁ) সুবে বাংলায় প্রেরণ করলেন। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। তোডরমলের ব্যবস্থরার ৭৬ বছর পর ১৬৫৮ সালে সুলতান সুজার আমলে রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। এইবার তার ৬৪ বছর পর ১৭৭২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে আবার রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

এর অর্থ হলো এই যে রাষ্ট্রের কাছে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল। ১৭০৭ সাল পর্যন্ত ঔরংজেব জীবিত ছিলেন। এই সময় পর্যন্ত নিঃসন্দেহে সুবে বাংলীর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দাবী খুব বেশী ছিল। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকে এ চাপ নিশ্চয় কমেছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর যখন ফারুকসিয়র দিল্লীর সম্রাট হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তখন তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর উপর একবার অর্থের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এরপরে আর সেরকম কোন চাপ সুবে বাংলার উপর পড়েনি। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এবং বড় বড় জাগিদারদের জাগির নিয়ে সমস্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল ততই মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক রাজ্যগুলির উপর চাপ পড়ছিল।

এ চাপ সুলতান সুজার সময়ও ছিল এবং মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ও ছিল। এ চাপের মুখে দাঁড়িয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ হয় তো ভেবেছিলেন যে রাজস্বের সর্বাধিকরণের সবচেয়ে বড় পথ হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ করা। বিশেষ করে মেদিনীপুর বর্ধমানের জমিদার শোভা সিং, যশোরের জমিদার সীতারাম রায় ও রাজশাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের বিদ্রোহের পর তিনি সঙ্গত কারণেই ভাবতে পারেন যে জমিদারদের উচ্ছেদ করে, রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন এনে তিনি রাজস্ব বৃদ্ধি করবেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করলে মনে হয় যদুনাথ সরকার যে তত্ত্বটির উপস্থাপনা করেছেন তা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও আব্দুল করিম-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও ঠিক।

## যদুনাথ সরকারের মত কতখানি ঠিক?

উপরে যে দৃষ্টিকোণ থেকে যদুনাথ সরকারের তত্ত্বটি আলোচনা করা হয়েছে তা একটি আপাত দৃষ্টিকোণ। তার মধ্যে একটি বড মৌলিক তথ্যকে ধরা হয় নি। যদুনাথ সরকারের তত্ত্বটি আপাতভাবে ঠিক। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের মুখে দাঁড় করালে তাকে নির্ভুল মনে হবে না। অর্থাৎ মূল প্রশ্নটি কোন আলোচকই আলোচনা করেন নি। তা হলো এই ঃ যদি সুলতান সুজার আমলে জমিদারি ব্যবস্থাকে উৎখাত না করেই রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায় তবে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে কেন? সুলতান সুজার সময় বিপুল পরিমাণ নতুন রাজ্যাংশ সুবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়েছিল। তার থেকে এসেছিল বিপুল পরিমাণ রাজস্ব, ফলে জমিদারদের উপর রাষ্ট্র চাপ সৃষ্টি করেছিল বটে কিন্তু তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে নি। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় নূতন রাজ্যাংশ খুব বেশী যুক্ত হয় নি বটে কিন্তু কৃষিকাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে দেশে বসতি যেমন বাড়ছিল তেমন কৃষিকাজও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বড় আকারের যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকার জন্য সৈন্য চলাচল খুব বেশি ছিল না, ক্ষেতের জমি ও ফসল নষ্ট হয় নি। অতএব মুর্শিদকুলি রাজস্ব বাড়িয়ে কৃষি বৃদ্ধির ফসলটুকু তুলে নিয়েছিলেন মাত্রার বেশী কিছু করেন নি। এরফলে কৃষক ও জমিদারদের যে সমৃদ্ধি কৃষিবৃদ্ধির ফলে হওয়া উচিত ছিল তা হয়ত হয়নি। দেশের অতিরিক্ত শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনাটিকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন কিন্তু তার ফলে দেশের

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সনাতন কাঠামোটি টিকে গিয়েছিল। জমিদারদের পুরোপুরি উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তা আর দেখা দেয়নি।

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বৃদ্ধির টেক্‌নিক ছিল চারটি। এক, সমস্ত প্রশাসনের ব্যয়ভার তিনি কমিয়ে ফেলেছিলেন। সমস্ত বিলাস ও বৈভব তার আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে রাজস্বের সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল।

দুই, তার আমলে কোন বড় মাপের যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ( যা পরবর্তী নবাবদের আমলে হয়েছিল ) হয় নি। ফলে রাষ্ট্রিক রাজস্বের অপচয়ও ঘটে নি। তিনি সৈন্য বাহিনীর আয়তনও কমিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক বাজেটকে হ্রাস করেছিলেন। এতে নূতন করে রাষ্ট্রের তহবিলে অর্থ-সঞ্চয় হয়েছিল।

তিন, মুর্শিদকুলি নির্মম নিষ্পেষণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারদের কাছ থেকে তিনি যা ন্যায্য তাই আদায় করতেন, কিন্তু যা আদায় করতেন তা নির্মম নিষ্পেষণের মধ্য দিয়ে। শোনা যায় যে রাজস্ব অনাদায় হলে তিনি জমিদারদের উপর নির্মম শারীরিক নির্যাতন চালাতেন এবং তাদের ধর্মের উপরেও হস্তক্ষেপ করতেন।

চার, মুর্শিদকুলি একটি অভিনব রাজস্ব বৃদ্ধির অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তার নাম 'আবওয়াব'। সময় সময় প্রয়োজন হলে নাজিম বা সুবেদার হিসেবে তিনি জমিদারদের উপর কিছু অতিরিক্ত কর স্থাপন করতেন। তাদের কাছ থেকে নজরাণাও আদায় করতেন। আগে বড় বড় জমিদারদের দেয় নজরাণা দিল্লীর সম্রাট গ্রহণ করতেন। মুর্শিদকুলির সময় থেকে সেই সব নজরাণা কেন্দ্রের হাতে না গিয়ে প্রাদেশিক তহবিলে জমা পড়ত। তাতেও যদি রাষ্ট্রের অর্থের ঘাটতি হত তখন চাপ দিয়ে বিদেশী বণিকদের থেকে অর্থ আদায় করা হত। অতএব অর্থের এতগুলি উৎস থাকতে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব কাঠামো বদলানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্তত মুর্শিদকুলির মত সতর্ক শাসক শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটানোর ঝুঁকি কখনোই নিতেন না একথা ধরে নেওয়াই সঙ্গত। তবে তিনি জমিদারদের সচল করার জন্য তাদের উপর তদারকির দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন আমিল নামক একগুচ্ছ কর্মচারীর উপর। তারপর থেকে বাংলাদেশে আমিল ও জমিদারদের পাশাপাশি সহ অবস্থানটি একটি নূতন ট্র্যাডিশন হিসাবে গড়ে ওঠে।

## দ্রষ্টব্য

১ যদুনাথ সরকার সম্পাদিত **হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল,** দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৪০৮-৪১৭।

২ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ইকনমি **হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল** দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭।

৩ তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত কেম্ব্রিজ ইকনমি হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭। আব্দুল করিম, মুর্শিদকুলি খান এণ্ড হিস টাইমস, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৩।

৪ রমেশচন্দ্র দত্ত, ইকনমিক হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড।

৫ রঞ্জিত সেন, বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট এ ইণ্ডিয়ান মানি লেণ্ডারস: সরফস ইন বেঙ্গল ইন দ্য সেকেণ্ড হাফ অফ এইটিন্থ সেঞ্চুরি, পৃষ্ঠা ৬০। রঞ্জিত সেন, ইকনমিকস অফ রেভেনিউ ম্যাক্সিমাইজেশন ১৭৫৭-১৭৯৩: বেঙ্গল এ কেস স্টাডি (প্রকাশিতব্য)।

৭ আব্দুল করিম-এর গ্রন্থে "রেভেনিউ রিফর্মস," পৃষ্ঠা ৭৪-৯৩ দ্রষ্টব্য।

৮ জেমস গ্র্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল এণ্ড কম্প্যারেটিভ এনালিসিস অফ দ্য ফিনান্সেস অফ বেঙ্গল।

৯ জন শোর, মিনিট, ডেটেড ১৮ জুন, ১৭৮৯ ও মিনিট ডেটেড ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯।

১০ গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল, রেভেনিউ প্রসিডিংস ভল্যুম ১২৬, এলোপিণ্ডকা ৫।

১১ রায়, এম. এন. গুপ্ত বাহাদুর, ল্যাণ্ড সিসটেম অফ বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৮।

# অতুলচন্দ্র গুপ্তের ইতিহাস চেতনা

নিখিলেশ গুহ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাধারণত দু-ধরণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পায়—এক, গবেষণা-ধর্মী ; দুই, শিক্ষিত কিন্তু অবিশারদ জনসাধারণের উপযোগী রচনা। তথ্যান্বেষীরা জানার সীমানা বাড়িয়ে চলেন, বিশেষ কোনো সমস্যার নিষ্পত্তিতে তাঁদের সমস্ত মনোযোগ। নানা সূত্রে লব্ধ তথ্য-সমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণের তুলনায় বিশেষ জটিল কোনো প্রশ্নের সাধ্যমত মীমাংসা তাঁদের টানে। অনুশীলিত বিষয়ের গোটা চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব নেই সময়ে-সময়ে এমন অনেকে 'বিশেষজ্ঞ'-রূপে পরিচিতি লাভে যাঁদের উৎসাহ নেই। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, যেখানে গবেষণার দাবী সবচেয়ে বড়, সর্বদা তাঁদের কৌলীন্য মানে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সজীব রাখায় তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত হাজির করার পরিবর্তে বিভিন্ন জ্ঞান কণিকাগুলি এক সূত্রে গেঁথে উপহার দেন তাঁরা, অখণ্ড পরিপ্রেক্ষিত রচনা যাতে সম্ভব হয়। সংশ্লেষণী এবং বিশ্লেষণী চিত্তবৃত্তির মধ্যে অবশ্যই কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। অনেকের সৃজনীশক্তি উভয় পথই আলিঙ্গন করেছে, কারু কারু বা একটিতে সিদ্ধি এসেছে।

ভারতবর্ষে গবেষণার অবকাশ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বিস্তার পেয়েছে। সেই সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মুখে। বাস্তবে কর্মকাণ্ড রূপায়ণের অন্যতম বাধা এতাবৎকাল ইংরিজির ওপর অধিক নির্ভরতা, যার ফলে আঞ্চলিক ভাষাসমূহে উপযুক্ত ছাত্র পাঠ্য বইয়ের অভাব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। প্রয়োজনীয় কেতাবের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কিন্তু জনসাধারণের ভাষায় আধুনিক কালে তাদের জন্য লিখিত জ্ঞান ভাণ্ডারের পর্যাপ্ত সমীক্ষণ ঘটে ওঠে নি। ঘটলে, কেবল অভিনিবেশযোগ্য পুস্তক সংখ্যা বাড়তো না, এদেশে বিদ্যানুশীলনের পূর্ণতর চিত্র আমরা পেতাম। সেকাজে কিছুটা সহায়তার আশায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। কিছুটা সময়োপযোগিতার কথাও সেই সঙ্গে মনে এলো। সম্প্রতি অতুলচন্দ্র গুপ্তের

জন্মশতবর্ষ ( ১৮৮৪-১৯৮৪ ) নিঃশব্দে অতিবাহিত হলো। 'ইতিহাস সংসদ' অন্তত কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর স্মৃতিতে প্রণাম জানিয়ে এই ত্রুটি কিঞ্চিৎ স্খালন করুক। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ব্যতীত তাঁর সমস্ত আলোচনা গ্রন্থে ইতিহাস চিন্তা বিশেষ স্থান পেয়েছে। এমন কি 'কাব্যসিজ্ঞাসা' প্রবন্ধেও শিল্পালোচনার মধ্যে ঝল্‌সে উঠেছে এই উপলব্ধি ঃ

'যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মূর্ত প্রতীক।' ( **কাব্যজিজ্ঞাসা**, পৃঃ ৭২ )

পাঠকদের বোধ হয় মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করবার পর তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী অনুবর্তিনী হতে চান। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের আশ্বাস দিয়েও তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় নি। উল্টে সেই বিখ্যাত প্রশ্নের আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি—'অমৃত-লাভ যাতে হয় না তাতে কি প্রয়োজন?' যাজ্ঞবল্ক্যের অপর ধর্মপত্নী কাত্যায়নী এ রকম কোনো জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছিলেন বলে শোনা যায় না। তাঁর প্রত্যাশা সম্ভবত ছিলো আরো স্থূল, পার্থিব। মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নীর উল্লেখে অতুলচন্দ্র উপরের উক্তিতে মানুষের ঊর্ধ্বতর ও লৌকিক চরিত্র বোঝাতে চেয়েছিলেন।

২

"প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সাহায্য আমার জীবনের বড় সম্পদ। তা না ঘটলে সম্ভবত জীবিকার্জনের উৎসাহে লোকে যাকে বলে কাজ তাতেই ডুবে যেতাম। আমি বাংলা সাহিত্যের দু ছত্রের নগণ্য লেখক। কিন্তু সে লেখাও লিখতেম না প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় না হলে।"

—প্রমথ চৌধুরী, '**আত্মকথা**' গ্রন্থের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

উপরোক্ত সাক্ষ্য সত্ত্বেও অতুলচন্দ্র গুপ্তর জীবনে আরো ক'টি বৈশিষ্ট্যে বেড়ে উঠে ছিলো বলা যায়। প্রথমত, আইন ব্যবসায়ে তাঁর পসার। প্রমথ চৌধুরীর মতো তিনি ব্যবহার জীবিকার অধ্যাপনা মাত্র ক'রে দায়িত্ব সম্পাদন করেন নি ; আদালতে তাঁর ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত সফল, সক্রিয়। ফলে —যেমন, তিনি নিজেই উদ্ধৃত সাক্ষ্যে জানিয়েছেন—সাহিত্য রচনা কর্ম তাঁকে সারতে হ'তো ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে। তাঁর লেখার সংখ্যা বিপুল নয় এবং তাতে যে মন প্রতিফলিত হয়েছে তাতে আইন শিক্ষার সার্থক লক্ষণ স্পষ্ট,— যুক্তিশীল, তথ্যনিষ্ঠ, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

সামাজিক দায়িত্ব-সচেতনতা অতুলচন্দ্র গুপ্তর জীবনের আরেকটি বড় দিক। তাঁর পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন রংপুরের ডাক সাইটে উকিল। অতুল-চন্দ্রকে তিনি কেবল জীবিকানির্বাহের সন্ধান দেন নি, জাতীয়তামন্ত্রেও দীক্ষিত করেছিলেন। স্বদেশী যুগে রংপুর শহরেই প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ( ৮ নভেম্বর ১৯০৫ )। বিনা বেতনে অতুলচন্দ্র, তিন বছর এখানে শিক্ষাদান করেন। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে ছাত্র যুব সংগঠন গ'ড়ে ওঠে তাতে তিনি সহকারী সচিবের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিবেকী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মেধাবী ছাত্র হিসাবেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে—সাম্মানিক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখলেও প্রমথ চৌধুরী কখনো সংগ্রামে সরাসরি প্রবেশ করেন নি। এখানেও অতুলচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে তার পার্থক্য। জীবন সায়াহ্নে এসেও শেষোক্তজন বেরুবারি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সামিল হয়েছিলেন, কম্যুনিষ্ট এবং বিনা বিচারে আটক, অন্যান্য রাজবন্দীদের পক্ষে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন উত্থাপনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা এখনো অনেক সংগ্রামী স্মৃতিতে উজ্জ্বল। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে অতুলচন্দ্র সাহিত্যিক মঞ্চে উপস্থিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ভাবধারার পরিবর্তনের স্পৃহা দুটি দিক চিহ্ন স্থাপন করেছিলো—প্রথম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা (১৯১১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ) এবং পরে 'সবুজপত্র' ( প্রথম সংখ্যার তারিখ মে, ১৯১৪ ) প্রকাশ। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন বাঁক বদলের মুখে প্রত্যাশী, পাশ্চাত্য সভ্যতার, বর্বর লোভ রক্ত নখদংষ্ট্রা মেলে নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা। মননশীল সারবান মিতবাক আলোচনায় যুগ সমস্যা বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন 'সবুজপত্র'-র লেখকগোষ্ঠী, পরবর্তী যুগে ব্যক্তি-গত স্মৃতি থেকে যাঁদের নিম্নবিধ লক্ষণ সনাক্ত করতে চেয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ

'(১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য-স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত অঙ্গীকারের উপসিদ্ধান্ত হল বুদ্ধির স্বাধীনতা, কারণ যেটা সাধারণ অর্থাৎ

অবিশেষ ( সাধারণের বুদ্ধি আছে সবুজপত্রের দল স্বীকার করেনি কখনও ), সেটা মুক্ত। এই স্বাধীনতা থেকে আমরা অনুমান করেছিলাম যে, লেখক, কর্মজীবনে কারুর দাসত্ব করবে না. সাহিত্যিক জীবনে সবদাই সমালোচনা করবে। সমালোচনার বিষয় অবশ্য নির্দিষ্ট ছিল না, তবে সমাজই ছিল প্রধান। পলিটিক্স-এ আমাদের আগ্রহ ছিল না, তার বদলে পলিটিক্যাল গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামি, এমন কি বিজ্ঞানের, দর্শনের। মোদ্দা কথা কিছুই বাদ পড়েনি। ফলে লেখায় এসেছিল ফ্র্তি এবং সাহিত্যে এল প্রবন্ধ, সর্ববিষয়ে জানবার আগ্রহ।' ('নতুন ও পুরাতন' : বক্তব্য পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮)

উদ্ধৃতি খানিক দীর্ঘ হলো। আপত্তি না জানিয়ে এর পুরোটা অন্তত আমি গলাধঃকরণ করতে পারবো না। কিন্তু সমকালেও 'সবুজপত্র'-র, আবহাওয়ার মধ্যে অতুলচন্দ্রর নাম যে স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি করতো তার প্রমাণ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যত্র রেখে গেছেন—প্রমথ চৌধুরীর স্নেহের বিতরণ ছিল অত্যন্ত পরিমিত।

'এক অতুল ( গুপ্ত ) বাবুকে ছাড়া ; তাঁকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সুখ্যাতি করেছেন, স্নেহ করেছেন এবং খাতির করেছেন। পেয়েছেনও।' ( **ঝিলিমিলি**, ১৫।৫।৫৯ তারিখের বিবৃতি, পৃঃ ৪৩।)

## ৩

অতীতের দৃষ্টান্ত থেকে বর্তমানে অনেক শিক্ষা নেওয়া যায়—ইতিহাস পাঠের পক্ষে এটি একটি বড় যুক্তি। পূর্ব অভিজ্ঞতা ভুলে থাকার ক্ষমতাও কিন্তু মানুষের অসীম। বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে কখন যে আপ্ত বাক্য, ধরতাই বুলি, গুরু নির্দেশে পথ চলা শুরু করি তা আমরা নিজেরাও জানি না। মুক্ত বুদ্ধিকে যাঁরা উস্কে দিতে চান তাঁদের বক্তব্য নিয়ে তাই গোল বাধে। ক্রমশ হয়তো আমরা তার যাথার্থ্য উপলব্ধি করি কিন্তু প্রথমে তর্ক লাগে। আবির্ভাব কালে প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা যত অভিনব ঠেকেছিলো আজ তা সমান চাঞ্চল্যকর বোধ না হ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইতিমধ্যে সময়ের ব্যবধানে তাঁর মতামত স্থির হয়ে শোনবার অবকাশ ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ যা-ই বলুন, 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী কেবল সৌখিন সাহিত্য চর্চা করেন নি, পারি-পার্শ্বিক ত্রুটি বিচ্যুতি-জড়তা সম্পর্কে সর্বদা সরব থেকেছেন। প্রমথ চৌধুরীর আক্রমণের প্রধান বিষয় ছিল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধায় যাতে কেবল বিত্তবানদের পথ প্রসারিত হত।

'আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা দু পাতা ইংরাজি পড়ে নব্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত, সে বিষয়ে লক্ষ্য না ক'রে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে থাকতুম, তা হ'লে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন ক'রে যা লাভ করেছি, তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশ শুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের Culture কে nationalise করতে পারি নি বলেই গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আইনের দ্বারা বাধ্য করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক।' ( 'তর্জ্জমা' ঃ **বীরবলের হালখাতা** )

'টেক্‌ষ্ট বুক্‌ কেউ পড়ে না, সকলেই তা মুখস্ত করে। আর পরীক্ষা-পাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যা আমরা মাথা থেকে যত শিগগির পারি বহিষ্কৃত করে দিই। অতঃপর "ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ" অর্থাৎ তেলের ভাঁড় থেকে তেল ফেলে দিলে তার অভ্যন্তরে যেমন কিঞ্চিৎ তেল লেগে থাকে সেইরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে জড়িয়ে থাকে।' ( **'প্রাচীন বংগ সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান** পৃঃ ১ )

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল বর্ণনায় প্রমথ চৌধুরীর আক্ষেপের জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কদের অনেকের বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী মন ভারতের অতীত ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত করে দেখেনি। স্বদেশী যুগে দেশের ঐতিহ্য সন্ধানের চেষ্টা যখন জাগ্রত হয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

'এ কথা কেহ না মনে করেন, গৌরব-অনুসন্ধানের জন্য পুরাবৃত্তের দুর্গম পথে প্রবেশ করিতে হইবে। সে দিকে গৌরব না থাকিতেও পারে—অনেক পরাভব, অনেক অবমাননা, অনেক পতন ও বিকারের মধ্য দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস বহিয়া আসিতেছে।'—'ঐতিহাসিক চিত্র', **ইতিহাস**, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, খণ্ড ১৩, পৃঃ ৪৮০।

রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সেকালে সকলে মেনে নেননি। ফলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এবং আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের তুলনা দেবার লোভ দীর্ঘ দিন এদেশের পণ্ডিত সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো।

রবীন্দ্রনাথের বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ভুল হয়নি। এর অন্যতম প্রমাণ 'সবুজপত্র' প্রথম বর্ষে প্রকাশিত অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের Fundamental Unity of India—যে-গ্রন্থের যুক্তি ও তথ্য আজও আমরা নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করি—প্রমথ চৌধুরী-কৃত সমালোচনা ( 'ভারতবর্ষের ঐক্য', **নানা-কথা** )। প্রধান যে কয়েকটি কারণে পুস্তকে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছিলো তা নিম্নরূপ। এক, সংস্কৃত সাহিত্য বহু যুগ ধরে রচিত ; কালচিহ্ন নির্ধারিত না থাকায় রচনাগুলির সঠিক সময় নির্ধারণ শক্ত। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের একতা বোঝাতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধার করেছেন প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ের মানসিকতায় তাদের জন্ম নেয়নি এমন কথা জোরের সঙ্গে কে বলবে ? আধিপত্যসূচক যে সকল উপাধি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—সম্রাট, একরাট, অধিরাট প্রভৃতি—শাস্ত্রের সাক্ষ্য মেনে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন বিশেষ যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ সেগুলি পুরোহিত সম্প্রদায় প্রদান করতেন।

দ্বিতীয়ত, প্রমথ চৌধুরী স্মরণ করতে সাহায্য করেছেন—আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত। 'মনু সংহিতা'-র মতে, ব্রহ্মাবর্ত এবং আর্যাবর্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছদেশ। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও মনে করতেন ভারতবর্ষের প্রকৃত ঐক্য প্রথম সাধিত হয়েছিলো প্রাকৃত জনের প্রভাবে বৌদ্ধযুগে। 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' গ্রন্থের একস্থানে ( পৃঃ ১৪ ) তিনি বলেছেন বর্ণাশ্রম ধর্ম যেখানে সমাজে প্রাচীর তুলেছে, বৌদ্ধ ধর্মে সেখানে সব মানুষের আসন প্রতিষ্ঠিত ঃ 'অশোক ছিলেন শূদ্র, কণিষ্ক, ছিলেন তুরস্ক, ও মিলিন্দ ছিলেন যবন অর্থাৎ গ্রীক।'

সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও মনে করতেন প্রাচীন ভারত-শ্রেষ্ঠ সাধনা সমাজ গঠনে, ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছায়ায় এদেশের অতীত সন্ধান এই বিড়ম্বনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'বর্তমান য়ুরোপের আদর্শ-দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিমেয় নহে।' ( 'ঐতিহাসিক চিত্র' ) সতর্কতার সঙ্গে এই বক্তব্য প্রনিধান না করায় প্রমথ চৌধুরীর মতে দু-ধরণের ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিতুলনার ঝোঁকে প্রথমত আমরা ভারতবর্ষের অতীত আদর্শকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের পর্যালোচনায় একস্থানে পড়ি—

"আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণো বোতলে ঢালছি। আমরা স্পেন্সারের বিলাতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি,

Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি এবং তাই যুগ সঞ্চিত সোমরস বলে পান করে তৃপ্তিও লাভ করি, মোহগ্রস্ত হই।'

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে অতীত ভারতবর্ষের সঙ্গে বর্তমান য়ুরোপের সাদৃশ্য সন্ধানের চেষ্টায় এদেশের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে না এই মর্মে অন্যত্র 'বীরবল'-এর মন্তব্য—

'এঁরা আহেলা বিলাতি শিক্ষার মোহে এ কথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা, ইতিহাসে নয়—পুরাণে বিজ্ঞানে নয়—দর্শনে ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্ম গ্রহণ না ক'রে তার চর্ম গ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগী হ'তে বাধ্য হ'ল। ( 'প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস', **বীরবলের হালখাতা** )

আদর্শ এবং আত্মীয়তার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আপন হলেও একটি বিষয়ে কিন্তু প্রমথ চৌধুরী কিছুটা স্বাতন্ত্র রক্ষা ক'রে চলেছিলেন। তাঁর 'রায়তের কথা' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু গ্রামসমাজে জমিদারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে উভয়ের মত পার্থক্য ছিলো। বইটির মধ্যেই রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' আলোচনার কাছে ঋণ স্বীকার। বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী গ্রামবাংলা উৎসন্নে যাওয়ার জন্য জমিদারদের দায়ী করেছেন, যদিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐ শ্রেণীর আচরণ সম্পূর্ণ নঞর্থক ভাবতে পারেন নি। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতে মহাজনদের আচরণ বিশ্লেষণে প্রমথ চৌধুরী আরো বিশদ হ'তে পারতেন। বাংলা দেশের অর্থনীতির মূল নির্ভর যে কৃষি সমাজ তার বিপত্তির কারণ সম্বন্ধে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, জমিদার, এবং মহাজনদের অর্থনৈতিক বিন্যাস সম্পর্কে বর্তমান কাল পর্যন্ত, ঐতিহাসিকরা একমত হননি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন বিষয়ে 'রায়তের কথা' গ্রন্থের আলোচনায় সংক্ষেপে যাথার্থ্য এবং প্রাঞ্জলতার যে সহাবস্থান ঘটেছে, দুর্ভাগ্য ছাত্রদের কাছে বিষয় পরিচিতি পৌঁছে দিতে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে তার সদ্ব্যবহার করিনি। রাজনীতিতে ভদ্রলোকদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ইদানীংকার আলোচকরা সম্ভবত মনেও রাখেন না কত আগে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছিলেন—ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এদের গাঁটছড়া বাঁধা ( দ্রঃ উপসংহার, 'রায়তের কথা' )। 'সাম্য'' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে বঙ্কিমচন্দ্রর উৎসাহ ছিল না; সাম্যবাদী চিন্তার সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীর জোরালো প্রকাশ কিন্তু কখনোই ভুলে যাবার নয়।

'যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে Bolshevik, কারো

মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, কারো মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

'······Bolshevik জন্তুটি যে কি, তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনুচিত, নিজে পাওয়াও তেমনি ছেলেমি।

* * * *

'আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে. যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের "পেটিয়টিক" জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।' ( 'প্রোগ্রামের পরিচয়', **রায়তের কথা** )

অতুলচন্দ্র গুপ্তর ইতিহাস চেতনা বোঝাতে প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে পূর্বেকার আলোচনা প্রসঙ্গে সন্দেহ জাগতে পারে—মূল বিষয় থেকে অনেকটা সরে এসেছি কিনা ? উত্তরে বলতে হয় 'সবুজপত্র'—সম্পাদকের প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপে যে পত্রিকা গ'ড়ে উঠে ছিলো—গোষ্ঠীর মূল সুর অতুলচন্দ্রর সমগ্র সাহিত্য কীর্ত্তির মধ্যে ধ্বনিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বিপিনচন্দ্র পালের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী যখন লেখনী ধারণ করেছিলেন, অতুলচন্দ্র গুপ্তর মনীষা সহায় হয়েছিলো। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-র লেখকরূপে বর্তমানে আমরা যাঁকে মনে রাখি 'সবুজপত্র'-র স্তম্ভে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিলো যে ক'টি সন্দর্ভ মাধ্যমে পরবর্তীকালে তা 'শিক্ষা ও সভ্যতা' ( ১৯২৭ ) নামে গ্রথিত হয়েছে। বস্তুত অতুলচন্দ্রর সমগ্র রচনাকর্মের পরিমাণ স্মরণে রাখলে রসসাহিত্যের ব্যাখ্যা তার পরিচয় তাঁর ক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ঠেকে। অত্যন্ত দায়িত্ববান সাংস্কৃতিক কর্মীর মর্যাদা তাঁর অনেক বেশী প্রাপ্য। সমসাময়িক ঘটনাবলীর তাৎপর্য প্রমথ চৌধুরীর মতো তাঁকেও ভাবিয়ে তুলতো। উদাহরণত—দ্বৈত শাসনের মর্মোদ্ঘাটনে 'দু ইয়ারকি' ( ইংরিজি dyarchy শব্দের ব্যঙ্গ যাতে প্রচ্ছন্ন ) নামে রস রচনাটি প্রমথ চৌধুরীর পাঠক সহজেই মনে করতে পারবেন। অনুরূপভাবে ( গ্রাসিয়াস এবং হবসের রাষ্ট্রতত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণে অতুলচন্দ্র বলেন,—প্রথমোক্তের মধ্যে মানুষের আদিম সমাজের হানাহানির রূপ, পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাশব বৃত্তি প্রশমনের চিত্র এঁকেছেন হবস্ ( 'আর্যামি' **শিক্ষা ও সভ্যতা**, পৃঃ ৬৩-৬৪ )।

অতুলচন্দ্রর ইতিহাস চেতনার একদিকে ছিলো গ্রীস এবং রোমের ধ্রুপদী সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, অন্যদিকে সমকালীন সমস্যার তলিয়ে দেখার ক্ষমতা। আয়ত দৃষ্টিবলে তাঁর কলমে যুগিয়েছিলো এমন পংক্তি—

'প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর আধুনিক জার্মানির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্মানির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকাল পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন ন্যায়ের জোরে?' ( 'রোম', ঐ, পৃঃ ৫৫ )

তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে যে সকল বক্তব্য, ক্রমশই জোর পাচ্ছে, অতুলচন্দ্রর রচনায় অর্ধ শতকের কিছু বেশী আগে তার রেখা পড়েছে। উদাহরণত নীচের অংশটি লক্ষ্য করা যাক।

'ইউরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে, আবার বাকী পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে'। সে প্রাধান্য বজায় থাকবে—আর সবাইকে ছোট ও খাটো করে' রাখতে পারলে।' ( 'বৈশ্য', ঐ, পৃঃ ৯০ )।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠিন সমালোচনা করেছেন অতুলচন্দ্র তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন থেকে। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রকৃত চরিত্র গত শতাব্দীর শেষেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে প্রকট হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর থেকে একটি উদাহরণ—'খৃষ্টান-ইতিহাসে দেখা যায় আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় মাটির লোভে অসহায় দেশবাসীদিগকে পশুদলের মতো উৎসাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়িগণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই।' ( 'গ্রন্থ-সমালোচনা', **ইতিহাস**, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩, পৃঃ ৪৮৬-৭ )। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধন বণ্টনের পরিসংখ্যান শুনিয়েছেন অতুলচন্দ্র। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ( যা ইউরোপের একখণ্ড ছিট মাত্র ) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে, লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে।' ( 'বৈশ্য', ঐ, পৃষ্ঠা ৮৩ )। শ্রম বিভাজনের উপযোগিতা আবিষ্কারের পর যাবতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের উন্মেষ ভেবেছেন অতুলচন্দ্র—'Industrial Revolution-এর গোড়ার কথা শিল্পীদের মজুর করে একসঙ্গে খাটিয়ে তাদের কাজের নিট লাভ অল্প লোকে বেটে নেওয়া। কল ও ইঞ্জিন কাজে লাগানোর পূর্বেই Industrial Revolution আরম্ভ হয়েছিল। কল ও ইঞ্জিনের আবিষ্কার অনেকটাই ঐ

Revolution-এর ফল, কারণ নয়।' ( 'জমির মালিক', **বিশ্বভারতী**, চৈত্র ১৩৫০, পৃঃ ১৫ )

প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' আলোচনার সম্প্রসারণ ঘটান অতুলচন্দ্র। জমির মালিকানা দিয়ে কৃষিকর্মে উন্নতিকামী যে ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন কর্ণওয়ালিস বাস্তবে তা রূপলাভ করেনি—অর্থনীতিবিদদের কাছে অনেক আগের এ সত্য ধরা পড়ে ছিলো। কিন্তু কেবলমাত্র ভূমি সংস্কার বা উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে, অতুলচন্দ্র এমন আশা পোষণ করেননি। প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সম্পত্তির যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন তিনি। এ ক্ষেত্রে তাঁর মতামত প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে র‍্যাডিক্যাল। 'রায়তের কথা' যুক্তি টেনেছিলো কৃষকের প্রজা-স্বত্বের পক্ষে, অতুলচন্দ্রের নির্দেশ সাম্যবাদী ধনবণ্টনের দিকে। উভয়ের রচনা থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দিলে তফাৎটা পরিষ্কার হবে।

'প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত-দূর বেড়ে যায়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ—বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে' রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই, ত, কাল তারা নিতে প্রস্তুত হবে।' ( 'প্রোগ্রামের পরিচয়', **রায়তের কথা** )

'চাষের জমিতে এই বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন দেশের সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ঘটানো সম্ভব নয়। এই আংশিক পরিবর্তন নির্ভর করে সমগ্রের গতি ও পরিণতির উপর। যেদিন আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক জীবনকে নতুন পৃথিবীর উপযোগী ক'রে ভেঙে গড়ার কাজ আরম্ভ হবে, কৃষির উন্নতির প্রকৃত চেষ্টাও সেই দিন আরম্ভ হবে তার পূর্বে নয়। সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' ( জমির মালিক, পৃঃ ২৭ )

ওপরের দুটি বক্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য তার পিছনে রয়েছে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের চেহারা। ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের ওপর, এই যুগান্তকারী ঘটনার অভিঘাত যাঁরা খুঁজছেন দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের

রচনাতেও অতুলচন্দ্রের মতামত প্রায়ই উল্লেখ পায় না। অথচ—এই প্রবন্ধের শুরুতেই যেমন বলেছি—বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরীর মতো অতুলচন্দ্র'র সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ কেবলমাত্র রচনাকর্মেই বিনিঃশেষ হয়নি। ১৯২৬ খৃঃ নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণ এবং পরে বঙ্গীয় কৃষক এবং শ্রমিক দল গঠনে উৎসাহ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের স্মৃতিকথায় পড়ি—

'রাজনীতিতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত অগ্রসর চিন্তার ধারক ছিলেন। তিনি জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন, তখনকার দিনের মতো দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর মত ঘোলাটে ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে, ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাকেই তিনি স্বাধীনতা বলেন।' ( 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি', কলকাতা, ১৯৮৪ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪০ )

অতুলচন্দ্র গুপ্তকে তবু কোনো বিশেষ মত ও পথের পথিক বলা চলবে না। তাঁর ইতিহাস চেতনা ছিলো অনেকান্ত। ইতিহাসকে 'বিজ্ঞান' আখ্যা দিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করতেন। অতীতের পৃষ্ঠা উল্টে ভবিষ্যতের দিশা পাওয়া যায়, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিলো না। 'ইতিহাসের মুক্তি' (১৯) গ্রন্থে তিনি এ প্রসঙ্গে গিবনের দৃষ্টান্ত পেড়েছেন। বহু খণ্ডব্যাপী রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী শোনানোর পর এই মহান ঐতিহাসিকের মনে হয়েছিল—ইউরোপের ইতিহাসে আর কখনো এমন বিপর্যয় ঘটবে না। দু বছরের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় তাঁর সিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ে। ইতিহাস রচনাকে অতুলচন্দ্র বরং তুলনা করেছেন সীবনশিল্পের সঙ্গে। "মানবীয় ঘটনার বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রত্নতত্ত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল ইতিহাসের মালমসলা মনে করা সত্য দৃষ্টিভঙ্গি নয়। যে নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পূর্ব থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়, সে জ্ঞান, ইতিহাসের মালমসলা। কারণ সে জ্ঞান ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর একটু বেশী চওড়া করে, অথবা ফাঁক পূর্ণ করে সে প্যাটার্নের বুনানিকে আরও একটু ঠাসবুনানি করে।' ('ইতিহাসের রীতি,' **'ইতিহাসের মুক্তি'**, পৃঃ ৫৩। )

অতীতের যা কিছু স্থবির তার বিলোপ সাধন ক'রে এগিয়ে যাওয়া মানুষের মুক্তি। কর্মের ওপর অতুলচন্দ্র জোর দেন, কারণ কর্মী মানুষই পারেন ইতিহাসের গতি বদলাতে। 'ইতিহাসের মুক্তি', গ্রন্থের উপসংহারের শেষ কটি ছত্রে তাই তিনি বলেন—'মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টি লীলার দর্শক।

এ লীলার কলাকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মম্‌সেন ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্য স্থাপন করতেন, আর ব্রাডলির হাতে আর একখানা হ্যাম্‌লেট লেখা হত।'

মানুষের জীবনশক্তি সমস্ত রকম বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নিজস্ব গতিপথ খুঁজে নেয় ব'লে আগ বাড়িয়ে তার সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই তুচ্ছ নয়, কারণ মানুষের ছাপ রয়েছে প্রত্যেকটিতে। বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিরুচি অনুযায়ী আমরা ইতিহাস থেকে পাঠ নিই; কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই শেষ বিচারে অমোঘ, অটল, অনড় নয়। সভ্যতার জয়যাত্রা ভাষ্য রচনা করতে চান যে ঐতিহাসিক তাঁর অন্তরে অতুলচন্দ্রের মতো প্রতি মুহূর্তে বিস্ময়ের বোধ থাকা চাই, যেহেতু তাঁর উপজীব্য অফুরন্ত সম্ভাবনাময় মানব-জীবন—সর্বাধিক ব্যাখ্যার পরও যাকে ঘিরে থাকে অসীম রহস্য। অতীতের পাঠ প্রাণের অভাবনীয় প্রকাশ লীলায় বারেবারে আশ্চর্য ক'রে অহমিকা ও সংকীর্ণতার থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে বলেই ইতিহাস সম্পর্কিত অতুলচন্দ্রের ভাবনার শিরোনাম 'ইতিহাসের মুক্তি'। তাঁর ভাষাতেই বলি—

'যেসব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চায়, জীবন তাদের চেয়ে অনেক জটিল। তাই কোনো ঐতিহাসিক তত্ত্বই ইতিহাসের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এবং এক আংশিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঐতিহাসিকেরা অন্য এক আংশিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। ইতিহাস জ্ঞানের চরম লাভ, মানবসমাজের গতি ও পরিণতির এই রহস্যলীলার সঙ্গে পরিচয়। যে ইতিহাস পাঠকের মনে এই রহস্য বোধকে জাগিয়ে তোলে সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। বাকি সব হয় গল্প নয় প্রপাগাণ্ডা।' ('ইতিহাস', **ইতিহাসের মুক্তি**, পৃঃ ১০৬০)

# জমি দখলের লড়াই ঃ সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সমর কুমার মল্লিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর আদিবাসী ইতিহাসচর্চার যে বিষয়টির প্রতি অধুনা গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, তা হল আদিবাসী এলাকায় অগ্রসর হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের এক অসম সংঘর্ষ যার অনিবার্য পরিণতি আদিবাসী সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙ্গন। আদিবাসী এলাকায় হিন্দু ও অন্যান্য উন্নত জাতির জমিদার, মহাজন, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের ফলে আদিবাসীরা তাদের শোষণের শিকার হয় এবং তাদের অজ্ঞতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত জমি তারা কঠোর মেহনত ও যত্ন সহকারে কৃষির উপযুক্ত করে তুলেছিল, তা দখল করে নিতে থাকে। এইভাবে জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে আদিবাসীরা ভাগ্যের অনুসন্ধানে নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে অনত্র্য বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় এই ধরণের জমি দখলের ঘটনা ছাড়া আরও এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জমি দখলের সকল প্রচেষ্টার উদাহরণ পাই। তা হল অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এক উপজাতি কর্তৃক অর্থনীতিতে পিছিয়ে থাকা আর এক উপজাতির জমি দখলের প্রবণতা। এইভাবে এক উপজাতির জমি অন্য উপজাতির দখল করার ঘটনা বিরল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাহাড়িয়াদের জমি সাঁওতালরা দখল করে এই বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

## সংঘর্ষের এলাকা

সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পার্বত্য অঞ্চল ছিল এই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল, রাজমহল পার্বত্য অঞ্চল উত্তরে গঙ্গাতীরে সকরিগলি থেকে দক্ষিণে ব্রাহ্মণী নদী ও বীরভুম জেলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ছিল ১০০ ফুট থেকে ২০০ ফুট পর্যন্ত এবং সমগ্র অঞ্চলটি দৈর্ঘ্যে ৮০ মাইল ও প্রস্থে ৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাহাড়িয়ারাই হল

রাজমহলের আদি বাসিন্দা, পাহাড়িয়ারা মোট তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল—(১) সাওবিয়া বা মালের যারা মূলত রাজমহল পাহাড় ও গোন্দার অধিবাসী ; (২) কঁয়ার ভাগ যাদের আস্তানা ছিল সুলতানাবাদ পাহাড়ে ; এবং (৩) মাল পাহাড়িয়া যারা দুমকা ও নাকুড়ের পার্বত্য অঞ্চল ও সমভূমি উভয় স্থানেই বসবাস করতো।

## পাহাড়িয়া উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

## কুরাও আবাদ

পাহাড়িয়াদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের এক বিস্তৃত এলাকা ছিল পুরোপুরি শক্ত পাথরে ঢাকা এবং স্বভাবতই তা ছিল কৃষি কার্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কেবলমাত্র পর্বত শিখরেই নয়, কোথাও কোথাও সমভূমিতেও ছিল এই একই অবস্থা। কিন্তু কোন কোন এলাকায় পাথর আর মাটি একত্র মিশ্রিত ছিল ; এসব অঞ্চলে লাঙ্গলের ব্যবহার সম্ভব ছিল। বর্ষার জলে সিক্ত এইসব জমিতে চাষবাস করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তবে পাহাড়িয়া এলাকার অধিকাংশ জমিই ছিল অনুর্বর এবং বৃষ্টি ও ঝর্ণার জলের উপর চাষবাস পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য সমভূমি অপেক্ষা পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল বেশী। কিন্তু বৃষ্টির জল পাহাড়ের ঢালু পথে গড়িয়ে যেত বলে জল ধরে রাখার কোন সুযোগ ছিল না, তাই জলসেচন ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। ১৮৯৭ সালের এক সরকারী বিবরণে জানা যায় যে মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির (২৭১·৩১ একর) মধ্যে মাত্র ·৯৮ শতাংশ জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা ছিল।

এই অবস্থায় পাহাড়িয়ারা ঝুম ও অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর পরিভাষায় "ক্ষেত্রান্তরী" প্রথায় চাষবাস করতে বাধ্য হত। প্রথমে পাহাড়ের উপরে জঙ্গলের একাংশে আগুন লাগিয়ে দেয়া হত। আগুন নিভে গেলে ছাই চাপা পড়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পূর্ণ হত, তখন "চাগি" বা "খুন্তি" নামে এক ধরণের যন্ত্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে বীজ বপন করা হত। পাহাড়িয়ারা এই পদ্ধতির চাষকে বলত "কুরাও"। ("কুরো" শব্দের অর্থ খনন।) কিন্তু এই পদ্ধতিতে একই জমি বছরের পর বছর চাষ করা যেত না, কয়েক বছর চাষ করার পর জমি আবার কয়েক বছরের জন্য ফেলে রাখতে হত। যাতে তার উৎপাদিকা শক্তি নিঃশেষ না হয়ে যায়, সেই সময় অন্য জমিতে চাষ করতে হত। তাছাড়া

বার বার এই প্রথায় চাষ করলে জঙ্গল সাফ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। সে ক্ষেত্রে ভূমি ক্ষয়ের ঝুঁকি দেখা দিত। অন্যদিকে বৃষ্টিপাতের ঘাটতির আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু পাহাড়িয়াদের কাছে কুরাও চাষের কোন বিকল্প ছিল না, এই প্রথায় চাষবাসের ফলে খাদ্য উৎপাদন ছিল খুবই অনিশ্চিত। তাছাড়া অনুর্বর জমিতে উচ্চ শ্রেণীর কোন ফসল ফলত না। প্রধানত বজরা, কোদো, গুণ্ডলী প্রভৃতি অপ্রধান শস্য উৎপন্ন হত এ সব জমিতে, এক কথায় পাহাড়িয়ারা খাদ্যে স্বনির্ভর ছিল না। ফলে খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে বন্য ফলমুল ও লতাপাতার উপর তাদের অনেকটা নির্ভর করতে হত। তাছাড়া জঙ্গলের যারতীয় পশুপক্ষীর মাংস ছিল তাদের নিত্য খাদ্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু এত করেও তাদের অভাব মিটত না। ফলে প্রায়ই তারা পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে আসত লুটপাটের উদ্দেশ্যে। সমভূমির পথঘাট ছিল পথিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে ত্রাসের কারণ।

কুরাও চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে এর ফলে কৃষিযোগ্য ভূমির এলাকা সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যেত না কেননা এক এক বছর এক এক জায়গায় চাষবাস করা হত। ফলে পাহাড়িয়ার জমির উপর তাদের স্বত্ব প্রমাণ করতে পারত না, তাই সাঁওতালরা যখন তাদের জমি দখল করতে সুরু করলো, তখন তাদের পক্ষে সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব ছিল না যে তাদের এলাকা কতটুকু এবং সাঁওতালরা তাদের কি পরিমাণ জমি দখল করে নিয়েছে। এই সমস্যা সাঁওতাল পাহাড়িয়া দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

## সাঁওতালদের আগমন

পাহাড়িয়ারা আগাগোড়া রাজমহল পার্বত্য এলাকায় বসবাস করলেও সাঁওতালরা ছিল এই এলাকায় নবাগত। এই অঞ্চলে তাদের প্রথম আসতে দেখা যায় সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। তখন এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। বন কেটে বসতি স্থাপন ও অরণ্যাঞ্চলকে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতালদের। ১৮৩৩ সালে সরকার দামিন-ই-কো গঠন করলে সাঁওতাল বসতির ইতিহাসে তা এক নবযুগের সূচনা করে। পাহাড়ের সানুদেশে এই দামিন-ই-কোর উর্বর জমিতে চাষবাস করার জন্য কোম্পানী পাহাড়িয়াদের পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে আসার জন্য আবেদন করলে, পাহাড়িয়ারা তা অগ্রাহ্য করে। কারণ পাহাড়িয়াদের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যমের মানসিকতা

ছিল না। তাছাড়া তারা কুরাও পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন প্রথায় চাষবাস করতে জানতো না। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে সরকার সাঁওতালদের উৎসাহিত করেন বন কেটে বসতি স্থাপন করতে। এই সুযোগ তারা সানন্দে গ্রহণ করে। ফলে এই এলাকায় দ্রুতগতিতে সাঁওতাল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই সাঁওতাল পরগণায় দুই উপজাতির সহাবস্থান ঘটে—সাঁওতালরা সমভূমিতে ও পাহাড়িয়ারা পার্বত্য এলাকায়।

## সাঁওতাল কৃষি ব্যবস্থার স্বরূপ

কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলে সাঁওতালদের খ্যাতি ছিল এবং দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে ও বন্য জন্তুদের আক্রমণ মোকাবিলা করে তারা যে ভাবে গ্রাম স্থাপন করতো তা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রথমে দুটি কিংবা তিনটি সাঁওতাল পরিবার জঙ্গল সাফ করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতো। তারপর জঙ্গল কিছুটা পরিষ্কার হয়ে গেলে তারা অন্যান্য সাঁওতালদের বসতি স্থাপন করতে আহ্বান জানাতো। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে তারা ধাপে ধাপে আল বেঁধে চাষের জমি তৈরী করতো। নিচের ধাপের স্যাঁতস্যাঁতে জমিতেই কেবলমাত্র ধান চাষ করা যেত। উপরের ধাপের জমিতে যেখানে জল দাঁড়াতো না। সেখানে বিচ্ছিন্ন অপ্রধান শস্যের চাষ করা হত। বর্ষার আগে বারংবার জমিতে লাঙ্গল দিয়ে সাঁওতালরা চাষের ক্ষেত তৈরী করে নিত। এইভাবে নির্জন অরণ্যভূমিতে যখন কিছু সংখ্যক সাঁওতাল বসতি স্থাপন করতো, তখন একটা দুটো করে সাঁওতাল গ্রাম গড়ে উঠত। যিনি এই বসতি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন বা নেতৃত্ব দিতেন, সাঁওতাল গ্রাম-বাসীরা তাকে গ্রাম প্রধান বা মাঝি বলে মেনে নিতেন এবং নিজেদের প্রতিটি কাজকর্মে বা বাইরের লোকের সঙ্গে আদানপ্রদানে তিনিই গ্রামের মুখপাত্রের কাজ করতেন। তিনিই স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে খাজনার পরিমাণ স্থির করতেন ও পরে তা সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে সমান-ভাবে ভাগ করে নিজে তা আদায় করে জমিদারের হাতে তুলে দিতেন, গ্রামের সমস্ত জমিও এইভাবে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত। সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তি মালিকানার কোন স্থান ছিল না। সমস্ত জমিই ছিল গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। সাঁওতালদের যৌথ গ্রামীন জীবন তাদের একতা নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের পরিচায়ক। এ দিক দিয়ে বিচার করলে সাঁওতালরা পাহাড়িয়াদের থেকে অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন করতো। তাদের জমি ছিল

পাহাড়িয়াদের থেকে অনেক বেশী উর্বর। তাদের লাঙ্গল চাষ পদ্ধতি পাহাড়িয়াদের কুরাও পদ্ধতি থেকে ছিল অনেকাংশে উন্নত। এবং খাদ্যের যোগানে ঘাটতি তো ছিলই না, উপরন্তু কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকতো যা থেকে তারা খাজনা দিত, মহাজনের ঋণ শোধ করতো এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতো। সুতরাং সাঁওতাল পাহাড়িয়া দ্বন্দ্বে তারাই যে ছিল প্রবলতর প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

১৮৩৩ সালে দামিন-ই-কো গঠনের সময় থেকে ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত সাঁওতাল পাহাড়িয়া বিরোধের কোন সুযোগ ছিল না, কেননা এই সময় জমি ছিল পর্যাপ্ত এবং অরণ্য অঞ্চল ছিল বহু বিস্তৃত। সুতরাং পাহাড়ের উপরে পাহাড়িয়ারা ও নীচে সাঁওতালদের সহাবস্থানে কোন অসুবিধা ছিল না, সাঁওতালদের জমি হিন্দুরা দখল করে নিলেও এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরণ্যের আরও গভীরে তারা প্রবেশ করলেও পাহাড়িয়াদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের সংযোগ ছিল না, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে। ১৮৬০ ও '৭০-এর দশকে সাঁওতালরা জমিদারদের অত্যাচারের শিকার হয় এবং তাদের উপর বিপুল পরিমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। যা চাষীদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তারা সমস্ত গ্রামবাসীসহ জমি ছেড়ে আরও পিছু হঠতে থাকে নতুন বসতির সন্ধানে ও বাঙালী ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা তাদের জমি দখল করে নিতে থাকে। এই পরিস্থিতিই অবশেষে সাঁওতালদের বাধ্য করে পাহাড়িয়া এলাকায় প্রবেশ করতে। প্রথমে পাহাড়িয়ারা এই বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু সাঁওতালরা যখন স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে ও চাষবাস করতে সুরু করলো, তখন সংঘর্ষ হ'য়ে উঠল অনিবার্য। অবশ্য দুর্বল পাহাড়িয়াদের পক্ষে সাঁওতালদের অগ্রগমন প্রতিহত করা সম্ভব হ'ল না।

## সংঘর্ষের প্রসার ও উডের জমিবন্দোবস্ত

এদিকে সাঁওতালরাও ক্রমবর্ধমান করের বোঝা মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠে এবং সরকার এই পরিস্থিতি সামলাতে তৎপর হতে বাধ্য হয়। এরই ফল সাঁওতাল পরগণায়

উডের জমি ব্যবস্থা (১৮৭২-৭৯)। উড জমি বন্দোবস্ত করতে গিয়ে দেখলেন যে সাঁওতালরা পাহাড়ী এলাকায় বেশ কিছু গ্রাম দখল করে নিয়েছে। তিনি এই গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের অধিকার স্বীকার করে নেন ও তাদের সঙ্গে জমি ব্যবস্থা করে পাকাপোক্তভাবে সরকারী স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেন। দুর্বল পাহাড়িয়ারা সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়।

তবে উডের জমি ব্যবস্থা সাঁওতাল-পাহাড়িয়া দ্বন্দ্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং স্বয়ং উড ১৮৭৯ সালে পাহাড়িয়াদের সংরক্ষণের জন্য তাদের গ্রামগুলিতেও জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার ওল্ডহামের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটিও গঠন করেন। ১৮৮২ সালে ওল্ডহাম তাঁর রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁর রিপোর্ট প্রমাণ করে যে সাঁওতালরা দামিন-ই-কো ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চল থেকে মাল পাহাড়িয়াদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দিয়েছিল। রামগড় পাহাড়ের দুটি গ্রাম ছাড়া বাকী সমস্ত এলাকাই সাঁওতালরা দখল করে নিয়েছিল। সাঁওরিয়া পাহাড়িয়া এলাকায় যে সমস্ত জমিতে লাঙ্গল চাষ সম্ভব ছিল সেখানেই সাঁওতালরা পাহাড়িয়াদের হটিয়ে দেয়! এই পরিস্থিতিতে পাহাড়িয়াদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি পাহাড়িয়া গ্রামগুলিকেও ভূমি ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব সরকার ও পাহাড়িয়া কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। পাহাড়িয়াদের বিরোধিতার কারণ কর প্রদানে তাদের অনীহা, অপরপক্ষে সরকার হিসাব করে দেখেন যে, পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা আদৌ লাভজনক হবে না। পাহাড়িয়াদের স্বার্থ নয়। লাভ লোকসানের বিচার করেই সরকার পিছিয়ে যান।

সরকারের এই উদাসীনতার ফল কিন্তু পাহাড়িয়াদের পক্ষে শুভ হয় নি। কেননা পার্বত্য এলাকায় সাঁওতালদের অগ্রগমন রোধ করা পাহাড়িয়াদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এদিকে উডের ভূমি ব্যবস্থাও সাঁওতালদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম না হওয়ায় ধনী মহাজনেরা তাদের জমি দখল করে নিতে থাকে। আর সাঁওতালদের জমি হারানোর অর্থই পাহাড়িয়া এলাকায় সাঁওতালদের অনুপ্রবেশ (অন্যদিকে জমিদারেরাও অরণ্য সম্পদের আর্থিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বসতি স্থাপন করতে বাধা দেন) ফলে বেপরোয়া হ'য়ে সাঁওতালরা নতুন জমির সন্ধানে পাহাড়িয়া এলাকায় হানা দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে পাকুড়ের পাহাড়িয়ারা নিরুপায় হ'য়ে সরকারের কাছে জমি

বন্দোবস্ত করার জন্য আবেদন করে। পাকুড়ের মহকুমা শাসক স্মিথ তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন সাঁওতালদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে। তিনি ১০৫ জন সাঁওতালকে বহিষ্কার করেন ও প্রায় ২১৯ একর পাহাড়িয়া জমি উদ্ধার করেন। এদিকে সরকার পাহাড়িয়াদের আমাদনে সাড়া দিয়ে ১৯৪৭ সালে পাকুড়ের ৮৭টি পাহাড়িয়া গ্রামে জমি বন্দোবস্ত করেন। এর ফলে পাহাড়িয়াদের অধিকার স্বীকৃত হয় ও কোন সাঁওতাল মাঝি পাহাড়িয়া এলাকায় বে-আইনী ভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

## পাহাড়িয়া প্রতিক্রিয়া

**সাঁওতাল-পাহাড়িয়া দ্বন্দ্ব দুই আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।** অবস্থার চাপে এই অবিরত সংগ্রাম রাজমহল পার্বত্য এলাকায় অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সাঁওতালদের ক্রমাগত আক্রমণ ঠেকাতে ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পাহাড়িয়াদের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। (১) অনেকেই জমিজমা ছেড়ে রেলে অথবা কারখানায় মজুরের কাজ নিতে বাধ্য হয়। এমন কি কেউ কেউ পাড়ি দেয় সুদূর ডুয়ার্স অঞ্চলে চা বাগানে কাজ করার জন্য। (২) অনেকেই জমিজমা হারিয়ে অরণ্য সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে জীবনরক্ষার তাগিদে। জঙ্গলের কাঠ বিক্রী করে তারা কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা বজায় রাখতে বাধ্য হয়। (৩) অনেকেই আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাঁওতালদের মতো লাঙ্গল চাষ করতে সুরু করে। এরাই সরকারের কাছে আবেদন করেছিল একটা পাকাপোক্ত জমি ব্যবস্থার জন্য।

## পাহাড়িয়াদের ব্যর্থতার কারণ

সাঁওতালরা যেভাবে অতি সহজেই পাহাড়িয়াদের জমি দখল করতে সক্ষম হয়, তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করলেও এর কারণগুলি অনুসন্ধান করা দুরূহ নয়। সাঁওতালরা কেবলমাত্র গায়ের জোরেই পাহাড়িয়াদের হটিয়ে দিয়েছিল এটা মনে করার কোন কারণ নেই। অথবা কুরাও প্রথায় চাষবাস করার দরুন পাহাড়িয়া গ্রামগুলির সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেত না বলেই সাঁওতালরা সহজেই তা দখল করে নিতে পারে—এ ব্যাখ্যাও সর্বাংশে গ্রহণ-

যোগ্য নয়। আসলে পাহাড়িয়াদের ব্যর্থতার কারণ আরও গভীরে নিহিত ছিল। পাহাড়িয়াদের ব্যর্থতা ও সাঁওতালদের সাফল্যের মূল কারণ খুঁজতে হবে দুই উপজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈষম্যের মধ্যে। সাঁওতালরা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ একটি সম্প্রদায় ও মাঝির নেতৃত্বে তাদের ঐক্যবোধ ছিল অটুট। তাদের কৃষি অর্থনীতির কাঠামো ও উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ছিল তাদের শক্তির প্রধান উৎস। অন্য-দিকে পাহাড়িয়াদের অনুন্নত অর্থনীতি ও উৎপাদন পদ্ধতি এবং উদ্যমের অভাব ও পরিশ্রম বিমুখতা তাদের ব্যর্থতা ডেকে আনে। পাহাড়িয়াদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ও উপজাতিগত ঐক্যবোধ ছিল খুবই শিথিল। পাহাড়িয়া সর্দার ও গ্রামপ্রধানের ( টিকরি মাঝি ) ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও দায়িত্বহীন। মজার কথা এরাই মাঝে মাঝে কিছু অর্থের বিনিময়ে সাঁওতালদের ইন্ধন জোগাতো পাহাড়িয়াদের গ্রাম দখল করতে। কখনও কখনও তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রামের স্বত্ব ত্যাগ করতো। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা অনেকক্ষেত্রেই পাহাড়িয়াদের সর্বনাশের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য পাহাড়িয়াদের নিজেদের দুর্বলতা ছিল অনেকাংশে দায়ী।

# চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্যাপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ইসলামপুর মহকুমার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও কৃষক বিক্ষোভ এবং ট্রেন্সফার্ড অঞ্চলজনিত বর্তমান সমস্যা

পার্থ সেন

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিহারের অন্তর্ভূক্ত ছিলো, এবং মোঘল আমলে সূর্যাপুর পরগণার অধীনে ছিলো। সূর্যাপুর পরগণার সৃষ্টি হয় মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের আমলে। হেভিলি, দুলালগঞ্জ, কিষানগঞ্জ, উদরাইন এবং অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সামান্য কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় তৎকালীন সূর্যাপুর পরগণা। সূর্যাপুর পরগণা আবার তাজপুর সরকারের অধীনস্থ ছিলো। সম্রাট আকবরের আমল পর্যন্ত এই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো এবং সিকিমী ও ভূটিয়া দ্বারা অধ্যুষিত ছিলো। বুকানিণের তথ্য থেকে জানা যায় যে হুমায়ুন যখন ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত ছিলেন তখন জনৈক সৈয়দ খান দস্তুর সম্রাট হুমায়ুনকে সাহায্য করেন। সেই সুবাদে সম্রাট হুমায়ুন সৈয়দ খান দস্তুরকে সূর্যাপুর পরগণা দেন। বুকানিণের ভাষায় 'In the year 1545, when Humayun returned back his empire Syed Khan Dastur deputed to Pargana Surzapur by him ."[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বে সূর্যাপুর পরগণায় যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিলো তাকে বলা হয় গছাবন্দী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি গছাদারকে দেওয়া হতো। বিনিময়ে গছাদার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতো। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিকে বলা হতো গছ। গছের মালিককে বলা হতো গচ্ছাদার এবং গচ্ছাদারের অধীনস্থ কৃষককে বলা হতো গছবন্দী।[২] বর্তমান ইসলামপুর মহকুমায় গছ দিয়ে প্রচুর নাম পাওয়া যায়। যেমন 'গোয়ালগছ' 'সুফলগছ' 'কালাগছ' ইত্যাদি।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নবাব আতা হোসাইনের সময় সূর্যাপুর পরগণায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় এবং গছবন্দী ব্যবস্থার অবসান ঘটে।[৪] সূর্যাপুর পরগণার মূল জমিদার খাগড়ার নবাব ব্যতীত অন্যান্য স্বত্বাধিকারীও ছিলো। নীচে সূর্যাপুর পরগণার স্বত্বাধিকারীদের নামের তালিকা দেওয়া হলো[৫] পূর্ণিয়ার পৃথ্বীলাল চৌধুরী ছিলেন ২ আনা এগারো গণ্ডা দুই কড়া ২ ক্রান্তি পরিমাণ জমির মালিক। পাটনার নবাব সৈয়দ মেহেদী ছিলেন ৪ গণ্ডা ২ কড়া ১ ক্রান্তি জমির মালিক। কিষানগঞ্জের সূরয রতন খিরানীর ছিলো ৪ গণ্ডা ২ কড়া ১ ক্রান্তি জমির মালিকানা স্বত্ব। পাটনায় মেহেদী তুনাশা বেগমের ছিলো ১ গণ্ডা ১ ক্রান্তি জমির মালিকানা সত্ব। পাটনার বিবি লতিফউন্নিসার বেগমের ছিলো ৩ গণ্ডা ৩ কড়া ১ ক্রান্তি পরিমাণ জমির মালিকানা সত্ব। পাটনার বাকীপুরের নবাব জাহেদী বেগমের ছিলো ৪ গণ্ডা ২ কড়া ১ ক্রান্তি জমির মালিকানা সত্ব। কলকাতা ডালহৌসি স্কোয়ারের জাহেদী আখতার বেগমের ছিলো ১৬ গণ্ডা ১ ক্রান্তি জমির মালিকানা স্বত্ব। এ ছাড়াও রহতপুর মৌজার এবং গোয়ালপোখার থানার কিছু অংশ নিয়ে ছিলো বেনালী ষ্টেটের জমিদারী। ১৯৩৭-৩৮ সালে বেনালী ষ্টেট পূর্ণিয়ার চম্পানগর ষ্টেটের কাছ থেকে এই অংশ ক্রয় করে। বেনালী ষ্টেটের জমির পরিমাণ ছিলো ৩৭৯ বিঘা ১৩ কাঠা ৪ ধূর। ঐ অংশের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিলো ৪৪০ টাকা ১০ আনা।[৬] তবে সূর্যাপুর পরগণাতে একাধিক মালিকানা স্বত্ব থাকলেও বর্তমান ইসলামপুর মহকুমাতে মূলত বগড়ার নবাব, পূর্ণিয়ার নবাব, বেনালী ষ্টেট এবং কিষানগঞ্জের সূরয রতন খিরানীর জমিদারী ছিলো।

জমিদারের অধীনে ছিলো অসংখ্য পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, খেবরদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী। তৎকালীন সূর্যাপুর পরগণার অধীন বর্তমান ইসলামপুর অঞ্চলে তিনজন বড় পত্তনিদার ছিলো। পত্তনিদাররাও বিভিন্ন সময়ে কিছু জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন বলে জানা যায়। এ ছাড়াও আরও এক জাতের মধ্য কৃষকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় সূর্যাপুর পরগণায়। যাদেরকে বলা হয় সিকমিদার। সিকমিদাররা যখন জমি লাভ করতো তখন তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নজরানা দিতে হতো। সূর্যাপুর পরগণায় আর এক জাতের জমি ছিলো, যাকে বলা হতো মিলিথ-লাথে-লাজ। ঐ জমির জন্য জমিদারকে কোন খাজনা দিতে হতো না। প্রতি পত্তনিদার এবং খেবরদারদের হাতে তাদের ভরণপোষণের জন্য বাক্‌স বা খাস জমি থাকতো। ইসলামপুর অঞ্চলে মাটিকুণ্ডা, গোয়ালপোখর, রামগঞ্জ, চাকুলিয়ায়

ছিলো জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের কাছারি।[৭] তৎকালীন ইসলামপুরে ফাঁসিদেওয়ার ১৯টি মৌজা নিয়ে মোট মৌজার সংখ্যা ছিলেন ৭৭৯টি।[৮]

সূর্যাপুর পরগণার মোট আয়তন ছিলো ৪৮৪০২০ একর। এর মধ্যে বিহারের অংশ ছিলো ১৯৭৯৭৭ একর এবং বাংলার ( বর্তমান ইসলামপুর মহকুমা ও ফাঁসিদেওয়ার ১৯টি মৌজা নিয়ে ) অংশ ছিলো ২৮৬০৪৩ একর। জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র সূর্যাপুর পরগণার রাজস্ব ছিলো ১,২৪,১৪৬৮৩ টাকা। ঐ পরিমাণটা ছিলো পরগণার জমিদারদের কাছ থেকে সরকারের প্রাপ্য। পরগণার সেস বাবদ সরকারকে দিতে হতো ৯৩,৭৬৩২১ টাকা। সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী ৩১শে চৈত্রের সূর্যাস্তের আগে সরকারকে খাজনা দিতে হতো জমিদারদের। সেই সময়কার কৃষকের খাজনার পরিমাণ বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া হলো। ১৯০৬ সালের Record of Rights থেকে জানা যায় যে ৪৫ একর ৪৫ ডেসিমিল জমির জন্য ২২ টাকা খাজনা দিতে হতো এবং সাথে ১১ আনা সেস্ হিসেবে দিতে হতো।[৯]

শুধু অবাধ কৃষক শোষণই নয় এখানকার জমিদারেরা ১৭৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন। সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সূর্যাপুর পরগণার জমিদারদের ভূমিকা ইংরেজদের সহায়ক ছিলো। ১৮৫৭ সালে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে পূর্ণিয়াতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবং ঢাকা থেকে বিদ্রোহী সৈন্য-দল যাতে জলপাইগুড়ির বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে যুক্ত হতে না পারে তার জন্যও ইউলি দাহকের নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য কিষাণগঞ্জ থেকে ইসলামপুরের তৎকালিন দার্জিলিং রোড ধরে তেঁতুলিয়ার দিকে যান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় খাগড়ার নবাব এবং পত্তনিদারেরা যে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন তা Omally-এর লেখা থেকেই জানা যায়। Omelly-এর ভাষায় The Khagra branch are discended from Didan Hunsain, who left five sons of whom four died. The fifth Syed Enayet Hunsain, succeeded to property and rendered good service during the montiny of 1857 and the Bhutan war of 1864."[১০]

ইংরেজদের সহযোগিতা ব্যতীত জমি থেকে রায়ত উচ্ছেদ, রসিদ না দেওয়া এবং বলপূর্বক অত্যধিক রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অত্যাচার ছিলো

পরগণার জমিদার এবং পত্তনিদারদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি এখানকার অংশীদারেরাও জাল রসিদের মাধ্যমেও খাজনা আদায় করতো। এরকম বহু জাল রসিদও ইসলামপুর মহকুমার কৃষকের কাছে পাওয়া যায়। এবং মিলে মামলায় জড়িয়ে কৃষককে হয়রানি করাও হতো। ১৯৩৬ সালে পত্তনিদার নিজাবউদ্দিন বেতকারির দুই এক জন দরিদ্র কৃষক সামসিং এবং লবিত সিং এর বিরুদ্ধে খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা মামলা রুজু করা এবং জমি জায়গা ও হালগরু ক্রোক করে থোকরাবাড়ীর পৃথিলাল চৌধুরীর কাছারিতে নিয়ে আসে। এদের উপর প্রকাশ্য দিবালোকে নির্যাতন শুরু করলে ফলে আশে পাশের গ্রামের লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫০০ লোক কাছারী ঘিরে ফেলে। উত্তেজিত কৃষক সম্প্রদায় ক্রোক করা সম্পত্তি সহ ধৃত দুই কৃষককে ছিনিয়ে আনতে গেলে জমিদারের লাঠিয়ালদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। মারমুখী কৃষকদের সম্প্রদায়ের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ক্রোক করা সম্পত্তি ফেরত দিয়ে পত্তনিদার নিজাবুদ্দিন ও তার লোকজন রক্ষা পায়। তাৎক্ষনিক হার স্বীকার করে নিলেও জমিদার ও পত্তনিদার কিষাণগঞ্জ ও ইসলামপুর এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসে এবং ১০৪ জন কৃষককের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। কিষাণগঞ্জ কোর্টের মামলায় অবশ্য সকলেই নির্দোষ প্রমাণিত হয়।[১১] ১৯০৮-৩৯ সালে সোনাপুরে পৃথিলাল চৌধুরীর কাছারীতে রায়তকে দাঁড় দিয়ে খড়ের গাদায় বেঁধে রাখলে কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়।[১২] রায়ত উচ্ছেদ যে এই অঞ্চলের জমিদার পত্তনিদারদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপায় ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ মে মাসের দুই তারিখে এখানকার কৃষক নেতা বিধুভূষণ নাথকে লেখা, সতীনাথ ভাদুড়ীর চিঠি থেকে। ঐ চিঠিতে তিনি এখানকার কৃষকনেতাদের পরামর্শ দেন যে যাতে তাঁরা জমিদারের অত্যাচারের কাছে মাথা নত না করেন এবং প্রয়োজনে আদালতে দ্বারস্থ হন। প্রচলিত আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই কৃষক আন্দোলনকে ধরে রাখার চেষ্টা তৎকালীন নেতৃত্ব মূলত করতেন ঐ চিঠি তার প্রমাণ।[১৩]

১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনের সময় চোপড়া ইসলামপুর এবং গোয়ালপোখর থানার বড় বড় জোতদারেরা, গুণ্ডা লাঠিয়াল দিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যথা আটোয়ারী বালিয়াডাঙি এবং রাণীশঙ্কাইল থানার (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব দিনাজপুর জেলা) দমন করতে সাহায্য করেছিল।[১৪] পাশাপাশি দাসপাড়া, ধামনীগছ, চোপড়া,

প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকদের উপর তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এবং ধামনীগড়ে সংগঠিত না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো।[১৫] এবং বর্তমান পূর্ব বাংলার ঐ তিন থানার তেভাগা আন্দোলনের বেশ কিছু কৃষক নেতা দেশ বিভাগের পর ইসলামপুর চলে আসেন। এবং ১৯৫৮ সালে সোনাপুরার প্রেমচাঁদগঞ্জে এক মিটিংয়ে, ইসলামপুরে তৎকালীন অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির ইসলামপুর শাখার জন্ম দেন।[১৬] ১৯৪৬ সালের পর থেকেই ইসলামপুর মহকুমার কৃষক আন্দোলনও ভিন্ন পর্যায়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

১৯৫৬ সালে ইসলামপুর মহকুমাকে বিহার থেকে নিয়ে বাংলার সাথে সংযুক্ত করা হয়। ফলে ইসলামপুর মহকুমা transferred areaতে পরিণত হয় এবং transferred area হওয়ার ফলে ইসলামপুর মহকুমার ভূমি সমস্যা এক জটিলতর রূপ ধারণ করেছে। জমি সংক্রান্ত অধিকাংশ কাগজপত্র পূর্ণিয়া থেকে না আসার ফলে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে ১৯৬৪ সালে যে জরীপ হয় তাতে নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে। জোতদারেরা নামকাবাস্তে বহু জমি ২৩ কলমে অনুমতিদং করে রেখে দিয়েছে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমতিদং জমিগুলি বড় বাধা। আবার Behar waste land reclamation Act Sec 4 অনুযায়ী আদিবাসী এবং অনুন্নত সমাজের লোকেদের তৎকালীন বিহার সরকার ১৯৫১ সালে কিছু জমি পুনরুদ্ধার করে চাষ আবাদ করতে দেয়। ঐ সমস্ত জমি চাষের মেয়াদ ছিল নয় বৎসর। নয় বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার বিহার সরকার ঐ সমস্ত জমি আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের খতিয়ান করে দিলেও কিন্তু transferred area হওয়ার ফলে ইসলামপুর মহকুমার আদিবাসীরা ঐ সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। যেহেতু Behar Weste land reclamation Actতে repeal করার জন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নি তাই ঐ আইন এখনো চালু আছে বলে ধরে নিতে হবে।[১৭] আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কিছু ঐ সমস্ত ভেষ্ট করলে সমস্যা আরও জটিলতর রূপ ধারণ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, গুনাবাড়ী মৌজার কুতাই লিং, হাইকোর্টে আবেদন করলে, ১৯৭৪ সালে হাইকোর্ট রায় দেয় "There will be no settlement of the suit land, by the State of West Bengal. So long as the petitioners is not evicted from the Suit lands in due course of law. Libery is however granted to the State Government to take appropriate steps for evictory the petitio-

ners from the Suit lands. I make it clean that 1 have not expressed any opinion to the right of the petitiners to remain in possession of the Suit lands in competent cannot of land. There will be no order as to conts"[১৮] ঐসব জমির পরিমাণ দিলে নয় একর পরিমাণ। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এক একর জমি পাট্টাদারদের বিলি করা হয়। ফলে কৃষকসমিতি ভেল্ট করার জন্য চাপ দিচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিচ্ছে সমিতিগুলির স্বার্থে ঐ সমস্ত রায়তদের বিরোধ।

আবার ১৯৫৬ সালে বিহারে আসার ফলে ইসলামপুর থানা শ্রীকৃষ্ণপুর অঞ্চলের রিফিউজিদের কিছু নাকি বিহারে পড়ে যায়। ঐ সমস্ত আবাদী জমিগুলি যে ভেস্ট জমি তাই বিহার সরকার রিফিউজিদের allot করলে লিজ দেয়ালো এমনকি ঐ সমস্ত জমিতে বিহার সরকার আদিবাসীদের বসাতে শুরু করে। ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে রিফিউজিদের বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৮১ সালে পার্লামেণ্টে দার্জিলিং কেন্দ্রের এম. পি শ্রীআনন্দ পাঠক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে জানানো হয় যে বিহার সরকার ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের সরিয়ে দিয়েছে এর ইসলামপুরে মোট ৫৮০টি পরিবারকে ৪১১০ একর জমি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো রিফিউজিরা এখনো ঐ সমস্ত জমি ফেরৎ পায়নি।[১৯]

কাগজপত্র ঠিকমতো না আসার ফলে ১৯৬৪ সালে যে সার্ভে হয় তাতেও ত্রুটি থেকে যায়। এবং ঐ জরিপে বহু আদিবাসীদের জমিতে রিফিউজিদের নাম রেকর্ড করা হয়েছে। এমন কি Bihar tenancy Act অনুসারে বহু আদিবাসী পরিবার সিক্কী স্বত্ব পাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও ১৯৬৪ সালের জরীপে বঞ্চিত হয়।[২০] যার ফলে সমস্যা জটিলাকার ধারণ করেছে।

ঐ সমস্ত অসুবিধার জন্য এক দিকে যেমন জমি সংক্রান্ত বিরোধ প্রচুর, অপর দিকে ভূমি সংস্কারসূচী গ্রহণেও নানা রকম অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। অপারেশন বর্গার কর্মসূচী এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৮১ সালে পাঞ্জী পাড়ায় জি. এল. আর. অফিস সিদ্ধান্ত করে অপারেশন বর্গা কর্মসূচী বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।[২১] তাই অবিলম্বে সরকার নতুন করে জরিপ শুরু করে এবং জরুরী ভিত্তিতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা নচেত ভুল সার্ভের ফলে এক দিকে যেমন জমির অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব

দেখা দেয় আবার ঐ গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। যা প্রকৃত কৃষক আন্দোলনকে করে ক্ষতিগ্রস্ত।

সূত্র :


১ Account of the district of Purnea (1809-10)—Bukanin, Page 484

২ Purnea Gazattee, P. C. Roy Chowdhury, Page 501

৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্যার পরগণার মালিকানা স্বত্ব ও রাজস্ব সংবর্তিকা (পার্থ সেন ও উতথ্য বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ইসলামপুর, শারদ সংখ্যা, ১৩৯১

৪ Aspects of the Land Revenue System of West Dinajpur with special reference to Islampur. Partha Sen, paper presented in the Seminar on Early Historical perspective of North Bengal held at Balurghat College on 4. 2. 1982, Organised by North Bengal University Akshaya Kumar Maitreya Museum.

৫ Records of Rights of Fanzi 7 issued in the year 1907 from Purnea

৬ Ibid, 4

৭ Do

৮ Ibid, 3

৯ „ 5, 6

১০ Bengal District Gazatteer, Purnea, Omalley page 195

১১ চোখ, শিশির ঘোষ সম্পাদিত, বালুরঘাট, ১৫ই মে ১৯৮৫ সংখ্যা

১২ 'ইসলামপুর মহকুমার' ভাষা ও সংস্কৃতি, পার্থ সেন, পশ্চিম দিনাজপুর, জেলা যুব উৎসব স্মরণিকা, ১৯৮৫

১৩ ১৯৪২-এর মে মাসে লেখা সতীনাথ ভাদুড়ির চিঠি, লেখকের সংগৃহীত

১৪ 'উত্তরবঙ্গের অধিকার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১২৪

১৫ দিনাজপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন ও আন্দোলনের কিছু গান, পার্থ সেন, অনীক. ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫

১৬ 'দিনাজপুর জেলার প্রথম শ্রেণীর তেভাগা আন্দোলনের কর্মীর আত্মকথা, তুফান, শারদ সংখ্যা ১৩৯১ রায়গঞ্জ, লেখক পার্থ সেন

১৭ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও ইসলামপুরের সোনা ওরাঁও, পার্থ সেন, অনীক, মার্চ ১৯৮৫

১৮ Civil Revinian cases No 1079(w) 1080(w) and 1082 (w) 74 of 1974

১৯ সংবর্তিকা ( পার্থ সেন ও উত্থ্য বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) পঞ্চদশ সংখ্যা, ১লা জুন, ১৯৮৫ ইসলামপুরের সাক্ষাৎকার কৃষকনেতা স্বপন সেনের সাহায্যে

২০ Ibid 17

২১ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ইসলামপুরের J. L. R. O-র সাথে ।

# অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার শহরতলী পঞ্চান্নগ্রাম—কিছু তথ্য

সৌমিত্র শ্রীমানী

আমাদের আলোচ্য সময়ে নগর কলকাতার চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারার কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলা যেতে পারে। আজ থেকে দু'শ বছর পূর্বের যে কলকাতার রূপ আমরা সরকারী দলিল দস্তাবেজ এবং গবেষকদের রচনা থেকে লাভ করি, তাদের মধ্যেই সে সময়ের কলকাতার শহরতলীর মোটামুটি একটা ছবি আমাদের নজরে আসে। কলকাতার নগরায়ণ ঘটে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে সেই হিসাবে তার একটা বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, ঠিক তেমনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই শহরকে ঘিরে যে শহরতলী গড়ে উঠে ছিল তারও। আজ আমরা মোটামুটিভাবে সেই শহরতলী সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৪-তে তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ কলকাতার সীমা সরকারীভাবে ঘোষণা করেন[১]। একেই আমরা কলকাতা শহর বলছি। কিন্তু ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের কলকাতার সঙ্গে ১৭৯৪-র কলকাতার মিল বড় একটা ছিল না। তবে ১৬৯৮-র পর থেকেই যে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত তথা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল তাঁর যথেষ্ঠ প্রমাণ আমরা পাই। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ কোম্পানীকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের চারপাশে যে ৩৮টি গ্রাম ক্রয় করার অধিকার দেন, সেগুলির মধ্যে আমাদের আলোচ্য ১৫টি ডিহির অনেককেই পাওয়া যায়[২]। আবার ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মারাঠা-খালের বহির্প্রান্তে ৬০০ গজ পরিমাণ এলাকা ছেড়ে দিলে[৩] কলকাতার শহরতলী গড়ে ওঠার অবকাশ বৃদ্ধি পায়।

এখন প্রশ্ন হল এই শহরতলীর ১৫টি ডিহি বা ৫৫ গ্রাম বলতে আমরা কোন্ কোন্ এলাকাকে বুঝব। সরকারী দলিলগুলির সর্বত্র ১৫টি উল্লেখিত হলেও রেভারেণ্ড লভের হিসাব অনুসারে ছিল ১৫টি ডিহি ; যথা, ভবানীপুর, চক্রবেড়িয়া, মনোহরপুর, বিরজি, শ্রীরামপুর, তোপসিয়া, শুঁড়া, কুলিয়া, এণ্টালী, উল্টাডাঙ্গা, বাগজোলা, চিৎপুর, সিঁথি এবং দক্ষিণ পাইকপাড়া[৪]। অপরদিকে এ. কে. রায়ের হিসাব অনুযায়ী ডিহির সংখ্যা ছিল ১৫। লভের সঙ্গে তাঁর আরও একটি বিষয়ে অমিল হল, এলাকার ক্ষেত্রে। লভ্ যে নামের তালিকা দিয়েছেন, রায়ের তালিকায় তার মধ্যে ডিহি বিরজি অনুল্লেখিত। রায়ের তালিকায় আছে সিমলা ও শিয়ালদহ[৫] এবং অন্যান্য ডিহির নামের মধ্যে লভের দেওয়া তালিকার মিল আছে।

এ কে রায়ের তৈরী ১৫টি ডিহির অন্তর্গত ৫৫টি গ্রাম ঃ

১। ডিহি সিঁথি
- ১। সিঁথি
- ২। কাশীপুর
- ৩। পাইকপাড়া

২। ডিহি চিৎপুর
- ১। চিৎপুর
- ২। টালা
- ৩। বীরপাড়া
- ৪। কালীদহ

৩। ডিহি বাগজোলা
- ১। দক্ষিণ দাঁড়ি
- ২। কাঁকুড়িয়া
- ৩। নয়াবাদ

৪। ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়া
- ১। বেলগাছিয়া

৫। ডিহি উল্টাডাঙ্গা
- ১। উল্টাডাঙ্গা (অংশ)
- ২। বাগমারি
- ৩। গৌরীবাড়ী

৬। ডিহি সিমলা
- ১। বাহির সিমলা
- ২। নারিকেলডাঙ্গা

৭। ডিহি শুড়া
- ১। শুড়া
- ২। কাঁকুড়গাছি
- ৩। কোটান
- ৪। দত্তাবাদ

৮। ডিহি কুলিয়া
- ১। মল্লিকাবাদ
- ২। কুলিয়া

৯। ডিহি শিয়ালদহ
- ১। শিয়ালদহ
- ২। বেলিয়াঘাটা

১০। ডিহি এণ্টালী
- ১। এণ্টালী
- ২। পাগলাডাঙ্গা
- ৩। নিমকপোতা
- ৪। গোবরা
- ৫। কামারডাঙ্গা
- ৬। ট্যাংরা

১১। ডিহি তোপসিয়া
- ১। তোপসিয়া

২। তিলজলা

৩। বেনিয়াপুকুর

১২। ডিহি শ্রীরামপুর

১। চৌনগ

২। লেণ্ডা

৩। সাপকাটি

৪। অন্তাবাদ

৫। নোনাডাঙ্গা

৬। বণ্ডেল উলুবেড়িয়া

৭। বেদিয়াডাঙ্গা

৮। কুস্টিয়া

৯। পুরাননগর

১০। ঘুঘুডাঙ্গা

১১। শ্রীরামপুর

১৩। ডিহি চক্রবেড়িয়া

১। বালীগঞ্জ

২। গুড়সা

৩। চক্রবেড়িয়া

১৪। ডিহি ভবানীপুর

১। ভবানীপুর

২। নীজগ্রাম

১৫। ডিহি মনোহরপুর

১। বেলতলা

২। কালীঘাট

৩। মনোহরপুর

৪। মুদিয়ালী

৫। সাহানগর

৬। কৈখালি

অর্থাৎ এই ১৫টি ডিহির অন্তর্গত ছিল এই ৫৫টি গ্রাম। কিন্তু একটি সরকারী দলিলে পাওয়া তালিকায় দেখা যাচ্ছে ১৫টি ডিহি হল, যথাক্রমে ভবানীপুর, চক্রবেড়িয়া, বিরজি, সিঁথি, চিৎপুর, তোপসিয়া, শুঁড়া, বাহির সিমলা, কুসিয়া বীরপাড়া, উল্টাডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, মনোহরপুর, ইন্টালী ও দক্ষিণ পাইকপাড়া[৬] নামের তালিকা সব অভিন্ন না হলেও একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ১৫টি ডিহির অবস্থান ছিল মারাঠাখালের পাশেই—কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের বাইরে।

৫৫ গ্রামের প্রতি কোম্পানীর একটা বিশেষ নজর ছিল। কারণ তাদের কেন্দ্র কলকাতাকে সুরক্ষিত করার জন্য (মনে হয় ১৭৫৬-র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে) কোম্পানী ৫৫ গ্রামের জলপথকে কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরই, অর্থাৎ ২৭শে জুলাই ১৭৫৭ ক্লাইভ ও কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কলকাতার উত্তরে বাগবাজার থেকে লবণ হ্রদ হয়ে দক্ষিণে কুলপী নদী পর্যন্ত একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরীর পরিকল্পনা প্রকাশ করেন[৭] অতএব বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় এই শহরতলীর গুরুত্ব সে যুগে কতখানি ছিল।

কিন্তু এই শহরতলীকে শাসন করা হত কিভাবে—স্বভাবতই এ প্রশ্ন

আমাদের মনে জাগে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য সময়ে ইংরেজ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল ছিল না। ভারতের অভ্যন্তরে সে যেমন নানা যুদ্ধে জড়িত, ঠিক তেমনি সে প্রাচ্যে তার বাণিজ্য বিস্তারে ব্যগ্র। এবং এ সবের সঙ্গেই জড়িত ছিল বিপুল পরিমাণে অর্থ। পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫-তে বাংলার দেওয়ানীলাভ—এই দুই ঘটনার মাধ্যমে কোম্পানী বাংলায় যেমন রাজস্ব আদায়কারীর অধিকার লাভ করে, ঠিক তেমনি এখানকার অর্থব্যবস্থাতেও তার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। মুঘল শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য অনুসারে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাতেও রাজস্ব আদায়ের ভূমিকা ছিল প্রধান[৮] কোম্পানী বাংলার রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ায় খুশী ছিল না। ১৭৫৭-র ২৬শে জুলাই ক্লাইভ নিজে এই আদায় ব্যবস্থায় অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন[৯]। ফলত, ৫৫ গ্রামের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাও কোম্পানীর মনমত ছিল না। এরই সূত্র ধরে ১৭৫৮-৫৯-এর বৎসরে কোম্পানী এই এলাকার যাবতীয় জমিদারদের অপসারিত করে[১০]।

৫৫ গ্রামের রাজস্ব কয়েকটি বিভাগে সংগৃহীত হত। যেমন পাগলাডাঙ্গা সেয়ার, রাজাবাজার, শুঁড়ি বাজার এবং বাগিচাগুলির রাজস্ব। এদের উপরে ছিল ভূমি রাজস্ব। যেহেতু কোম্পানী সন্দেহ করত যে যথাযথ রাজস্ব আদায় হয় না, সেইহেতু কিছুকাল অন্তর জরিপ করার ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে চালু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম জরিপ এখানে হয় ১৭৫৮-৫৯এ, তারপর ১৭৬৪-৬৫তে এবং পুনরায় ১৭৮১-৮২তে। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে জমির পাট্টা প্রথম দফায় বিলি করা ১৭৬৩-৬৪তে এবং পুনরায় ১৭৭৪-৭৫-এ[১১]। এইভাবে প্রতি দশ বছরে কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

কোম্পানী তার কলকাতার কালেক্টরের মাধ্যমে স্বহস্তে এখানকার শাসনভার নেওয়ার সময়ে ৫৫ গ্রামের 'মালগুজারী' জমির পরিমাণ ছিল মোট ২৬৮০৩ বিঘা ৭ কাঠা ১০ ছটাক।[৮] আলোচ্য সময়ে জরিপ ইত্যাদি অন্তে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় মোট ৩১৫৪৭ বিঘা ১৮ কাঠা ৬ ছটাক। এর সঙ্গে সানাবিধ 'বাজে জমি' যুক্ত করে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৩০৫ বিঘা ২ কাঠা ১০ ছটাক[১২]।

জরিপের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও ১৭৫৮-৫৯-এর জরিপের কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে পরবর্তী কালে ৮০ হাতে (দলিলের ভাষায় Cubit) এক শিকল পরিমাপ করে, সেই

হিসাবে সমস্ত জমি জরিপ করার ব্যবস্থা হয়[১৩]। কিন্তু জমির দখল নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিত। এবং এইসব পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষ সর্বদা তুষ্ট হতেও পারত না। তারা তাদের 'খামার' জমিগুলিকেও একই পদ্ধতিতে পরিমাপ করিয়ে নিজ নিজ পাট্টায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করে[১৪]। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের মনে পরবর্তী জরিপে জমির দখল হারাবার মত একটা সঙ্গত আশঙ্কা ছিলই। ঠিক পাশাপাশি কোম্পানীর জরিপ করাবার মূল উদ্দেশ্য কি—তাও পরিস্কারভাবে অনুভব করা যায়।

তবে এই পরিমাপ নিয়েও যথেষ্ট গোলমাল ছিল। জমির জরিপের পরও সাধারণ মানুষ সেই জরিপ নিয়ে শঙ্কিত থাকত। আন্দাজ করা যায় যে, যাদের কাছে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হত, তারাই নানাবিধ কারচুপি করে হিসাবের গোলমাল সৃষ্টি করত। রায়তরা এবিষয়ে একদা অভিযোগও দায়ের করেছিল। তাদের ভাষায় জরিপের সময়ে খাজনা আদায়কারী ইজারাদার জমির সঠিক পরিমাণ লুকোয় এবং পরবর্তীকালে জরিপ করা নয়, এমন জমির ওপর থেকেও খাজনা দাবী করে [১৫]।

এক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে, কোম্পানী ৫৫ গ্রামের শাসন নিজের হাতে রাখলেও এখানকার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হত একজন ইজারা-দারকে। বার্ষিক নিলামে যে ব্যক্তি সর্বাধিক খাজনা জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত, তাকেই এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ৫৫ গ্রাম সমর্পণ করা হত।

ক্রমাগত জমি খুঁজে বের করে তাদের বিলি করার পশ্চাতে কোম্পানীর ছিল অনলস প্রচেষ্টা। ১৭৮২তে জরিপের পর দেখা গেল যে ৪৬৩৯ বিঘা ৫ কাঠা জমি 'বেশী'। এই 'বেশী' জমি কিন্তু কোম্পানী নিজের কাছে রাখেনি। তৎক্ষণাৎ তা বার্ষিক ১৫০০ টাকা অতিরিক্ত 'জমা'য় তদানীন্তন ইজারাদারকে সমর্পণ করা হয়[১৬]। এইভাবে জমি বিলি করতে গিয়ে অবশেষে এমন হল যে মাত্র ৪৮ বিঘা বন্দোবস্ত করার মত অবস্থাও কোম্পানীর ছিল না[১৭]।

৫৫ গ্রামের ইজারাদারী ব্যবস্থা কিন্তু খুব সহজভাবে চলেনি। কোম্পানী সর্বদা খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধিতে ব্যগ্র হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার সাফল্য সবক্ষেত্রে আসত না। আমরা ১৭৭১-৭২'এর ঘটনাটা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি। সেই বছরের জন্য 'জমা' কার্য হয় ৭১৫৬৮ টাকা ৫ আনা ১৭ গণ্ডা। কিন্তু বিপুল পরিমাণে বকেয়া দেখে এই অর্থ কমিয়ে করা হয়

৫০৫৪৮ টাকা ১৫ আনা এবং তা একজন নতুন ইজারাদারের দায়িত্বে দেওয়া হয়[১৮]। ১৭৭৩এর পূর্বেকার প্রথা রদ করে তাকে টানা পাঁচ বছরের ইজারা দেওয়া হল। পূর্বে বার্ষিক ব্যবস্থা ছিল, এক্ষেত্রেও কোম্পানীর উদ্দেশ্য আমরা অনুমান করতে পারি, তারা দীর্ঘকালীন মেয়াদে নির্দিষ্ট খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইজারাদার রামগোপালও বেশ কিছু খাতে ছুট দাবী করায় তার বার্ষিক 'জমা' হ্রাস করে করা হল ৪৮৮৩৪ টাকা ৬ আনা ১৬ গণ্ডা। এরপরও ইজারাদার সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে অপসারিত করে ২৫ গ্রাম 'খাস' করে নেওয়া হয়[১৯]।

অতএব দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর সঙ্গে ইজারাদারদের সম্পর্ক ছিল ভীষণ-ভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত। ইজারাদারদের কোম্পানী কখনো বিশ্বাস করতে পারে নি। তাই এমন নির্দেশ দেওয়া হল যে, ইজারাদারকে অবশ্যই ৫৫ গ্রামের আদিবাসী হতে হবে[২০]। অর্থাৎ যদি তার দেয় অর্থ বকেয়া থাকে, তাহলে তাকে বা তার স্থাবর সম্পত্তি আটক করা যাবে।

অবশ্য ইজারাদারদেরও বকেয়া পড়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ৫৫ গ্রামে বহু ইউরোপীয় তথা ধনী ভারতীয়র বাগানবাড়ী ছিল। এই সব ব্যক্তিরা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী। যথা সময়ে নিজ নিজ খাজনা দিতে তাদের ছিল প্রবল অনীহা। ইজারাদাররা বার বার এইসব ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল[২১]। কোম্পানী এই অবস্থায় এক বৈষম্যমূলক পদ্ধতি চালু করল। ভারতীয়দের আটক করার বা অনাদায়ী খাজনার জন্য তাদের বাগানের ফসল ক্রোক করার নির্দেশ দেওয়া হয়[২২]। কিন্তু একই অপরাধের জন্য ইউরোপীয়দের কি করা হবে, তার কোন নির্দেশ ছিল না দেখে, আমরা কোম্পানীর ঔপনিবেশিক চরিত্রের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এক্ষেত্রে বসাচ্ছি। বাগানগুলি থেকে খাজনা আদায়ে ইজারাদার বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিলে ১৭৭৮-এ ৫৫ গ্রাম এই সব বাগানগুলিকে বাদ রেখে বার্ষিক ৩৭০০০ টাকায় মানিকরাম দাসকে ইজারা দেওয়া হয়। এই সময়ে বাগানগুলির খাজনা ছিল বার্ষিক ৫০৯৫ টাকা ৭ আনা ৩ গণ্ডা[২৩]।

৫৫ গ্রামের খাজনা আদায় নিয়ে কোম্পানীর ব্যগ্রতা দেখে এখানকার ক্রমবর্ধমান জনবসতির একটা আঁচ পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্রম-বর্ধমান হারে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৫৫ গ্রামেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কলকাতায় জনবসতি বিস্তারের প্রভাব এই এলাকাতেও অনুভূত হয়। তার ফলে এই এলাকায় বন-জঙ্গল সাফ হয় ও জনবসতি গড়ে

ওঠে[২৪]। ওয়ারেন হেস্টিংস লণ্ডনে কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটি পত্রে তার উল্লেখও করেছিলেন[২৫]। পাশাপাশি কিছু সরকারি ব্যবস্থাতেও এই জনবসতি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়। প্রথমত, সরকারী নির্দেশ মত কলকাতার কোন নাগরিক শহরের বাইরে ১০ মাইলের গণ্ডি অতিক্রম করতে সহজে পারত না[২৬]। ফলত, ৫৫ গ্রামে তাদের যাতায়াত অনায়াস ছিল। দ্বিতীয়ত কলকাতায় যাবতীয় খড়ের বাড়ী উৎখাতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে[২৭] বহু লোক কলকাতার সীমা ছেড়ে এই ৫৫ গ্রামে বসতিগড়ে তোলে। তৃতীয়ত, দীর্ঘ দিন যাবৎ চালু 'মেৎরিফা' (দলিলের ভাষায় (Mutuherefeh) নামক এক ধরনের পেশাভিত্তিক কর (যেমন একজন ধোপাকে তার কাপড় ধোয়ার পাটার জন্য দেয় কর) ১৭৯০-তে সরকার ৫৫ গ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে নেয়[২৮]। এই সব ব্যবস্থার ফলশ্রুতি স্বরূপ ৫৫ গ্রামের জনবসতি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আবার উত্তরে চিৎপুর অঞ্চলে জনবসতি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানী একদা 'তকাভী' ঋণদানের ব্যবস্থা করে এবং সেক্ষেত্রে চিৎপুরে সেনাছাউনি তৈরীর সময় অধিবাসী উদ্বাস্তু হয়েছিল, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়[২৯]। এইভাবে একদিকে যেমন শহর কলকাতা থেকে জনবসতি ঠেলে তা নগরের সীমায় বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক তেমনি অপরদিকে ৫৫ গ্রামে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হয়। এসবের ফলেই ৫৫ গ্রামের বসতি প্রসারিত হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়।

কোম্পানী অবশ্য একেবারে দাতব্য ব্যবস্থা চালু করেনি। চিৎপুরের সেনাছাউনী ভেঙে দেওয়ার পর ১৯শে জুলাই ১৭৭৫ রেভারেণ্ড জনসন নামক একজন, ইউরোপীয় বসতির স্বার্থে ঐ খালি জমি বিঘা প্রতি ৮ আনা বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে ইজারা নেওয়ার প্রস্তাব করেন[৩০]। কিন্তু কলকাতা কমিটি এই প্রস্তাব স্বীকার করে নি কারণ জনসনের প্রস্তাবিত 'জমা'য় জমি বিলি করলে বার্ষিক মাত্র ৮২০ টাকা আদায়ের সম্ভাবনা ছিল। অপরদিকে পূর্বতন বসবাসকারীদের সেই জমি প্রচলিত রাজস্বে বরাদ্দ করলে বার্ষিক আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২০ টাকা ৩ আনা ১৯ গণ্ডা[৩১]।

তবে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিৎ যে ৫৫ গ্রামে বহু ইউরোপীয় বাগানবাড়ী তৈরী করে বসবাস করার প্রথা চালু করে[৩২]। কারণ শহর কলকাতার পরিবেশ ও জলবায়ু ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের পক্ষে ছিল হানিকর[৩৩]। এটা যে শুধুমাত্র ইউরোপীয়রা মনে করত, তা' নয়, বহু

ধনী ভারতীয়ও যে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছিল, তা আমরা জানি। ১৭৮৮-র হিসাবে জানা যাচ্ছে যে, এইসব বাগানবাড়ীগুলির অধীনে মোট জমির পরিমাণ ছিল ২৪৮৩ বিঘা ১ কাঠা ৪ ছটাক, যা কিনা ৫৫ গ্রামের মোট জমির আট শতাংশ[৩৪]। এইসব বাগানবাড়ীর মালিকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় যে কতখানি কষ্টসাধ্য ছিল, সে ঘটনাও আমরা জানি। কিন্তু বিঘা প্রতি এইসব বাগানবাড়ী থেকে ঠিক কত খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা ছিল, তা' বড় একটা জানা যায় না।

বাগানবাড়ীগুলির খাজনার অনুপুঙ্খ না জানা গেলেও ৫৫ গ্রামের সাধারণ রায়ত কিভাবে খাজনা প্রদান করত, তা' আমরা জানি। প্রতিটি রায়তকে একটি করে 'পাট্টা' দেওয়া হত। বিনিময়ে রায়ত 'পাট্টা সেলামী' ও 'রসম' প্রদান করত। ১৭৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টর মিঃ বেলার্স প্রতিটি পাট্টার ক্ষেত্রেই ২ টাকা ৪ আনা এই পরিমাণ ধার্য করেন। এই পরিমাণের মধ্যে 'পাট্টা সেলামী' ছিল ১ টাকা ৪ আনা এবং 'রসম' ১ টাকা। ১৭৭৪-৭৫-এ এই ব্যবস্থা বদল করে ক্ষুদ্র রায়তদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। নতুন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিতহারে 'পাট্টা সেলামী' ও 'রসম' সংগৃহীত হত[৩৫]:

| জমির পরিমাণ | সেলামী | রসম | মোট অঙ্ক |
|---|---|---|---|
| ১ থেকে ৫ কাঠা | ১ টাঃ ৪ আনা | ৮ আনা | ১ টাঃ ১২ আনা |
| ৬ ,, ১০ ,, | ১ টাঃ ৪ আনা | ১ টাঃ | ২ টাঃ ৪ আনা |
| ১১ ,, ১৫ ,, | ১ টাঃ ৪ আনা | ১ টাঃ ৮ আনা | ২ টাঃ ১২ আনা |
| ১৬ কাঠা ও তদূর্ধ্বে | ১ টাঃ ৪ আনা | ২ টাঃ | ৩ টাঃ ৪ আনা |

মোটামুটিভাবে কলকাতার শহরতলীর খাজনা আদায়ের এই ছিল ব্যবস্থা। আলোচ্য সময়ে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন যেমন হয়েছিল নামমাত্র, ঠিক তেমনি চেহারা ছিল এই ৫৫ গ্রামের। শহরকে ঘিরে এই শহরতলীতে ইউরোপীয়রা বাগানবাড়ী গড়ে তুললেও এই সব অঞ্চলের পরিবেশ ও সাধারণ স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না। আমাদের আলোচ্য সময়ের বেশ কিছু বছর পরেও এই দুরবস্থা বজায় ছিল[৩৬] এবং সে ঘটনাই প্রমাণ করে যে কোম্পানী পৌর উন্নয়ন তথা সুস্থ নগরায়ণের কথা আদৌ চিন্তা করে নি। কলকাতার রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরতলীরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেহেতু এইসব পরিবর্তনের পশ্চাতে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না, সেইহেতু সে

শহরতলী গড়ে উঠে ছিল অবৈজ্ঞানিক পথে। এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবত আজও হয় নি।

## আকরপঞ্জী :


১ 'A Short History of Calcutta' (কলকাতা ১৯৮২) লেখক এ কে রায়, পৃঃ ১১৬-১৯

২ প্রাগুক্ত ; পৃঃ ৭৫-৭৬।

৩ 'Calcutta & Its Neighbourhood···' (কলকাতা ১৯৭৪ ; শঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত) লেখক জেমস্ লঙ্, পৃ ২০৭।

৪ Selections from Unpublished Records of Government···' (কলকাতা ১৯৭৩, মহাদেব প্রসাদ সাহা সম্পাদিত) লেখক জেমস্ লঙ্, সংখ্যা ৮৫৬

৫ 'A short History of Calcutta', পৃঃ ১১১-১২,

৬ Board of Revenue Misc. Proceedings (এর পর থেকে B.O.R Misc.) ২৭. ৫. ১৭৯৪.

৭ 'Affairs of the East India company, ১ম খণ্ড (দিল্লী ১৯৮৪) লেখক—ডবল্যু কে ফার্মিঙ্গার, পৃঃ XCVIII—XCIX.

৮ প্রাগুক্ত, পৃঃ iii

৯ প্রাগুক্ত, পৃঃ XCVII

১০ Calcutta Committee of Revenue Proceedings ( এর পর থেকে Cal. C.O.R) ১. ৭. ১৭৭৮

১১ B. O. R. Misc, ২৯. ৪. ১৭৮৮

১২ B. O. R. Misc. ২৯. ৪. ১৭৮৮

১৩ Committee of Revenue Proceedings ( এর পর থেকে C.O.R) ১৯. ১১. ১৭৮১

১৪ C.O.R. ৫.১১.১৭৮১

১৫ Revenue Board consisting of Whole Council Proceedings ৩০.৩.১৭৭৩

১৬ C.O.R. ১১.৮.১৭৮৩

১৭ C.O.R. ২৭.৭.১৭৮৩

১৮ Cal. C.O.R. ১৯.৬.১৭৭৭

১৯ Rev. Board. Consisting of Whole Council Proceedings, ৩.১২.১৭৭৩

২০ Cal. C.O.R. ২৮.৭.১৭৭।

২১ Cal. C.O.R. ১৩.১২.১৭৭৩

২২ Cal. C.O.R. ১৩. ৯. ১৭৭৫

২৩ Cal. C.O.R. ১৭.৬.১৭৭৮

২৪ Rev. Board Consisting of Whole Council Proceedings ১৫.১০.১৭৭২

২৫ 'Affairs of the East India Company…' ১ম খণ্ড পৃ: CCXXXI

২৬ 'Selections…' লেখক লঙ্, সংখ্যা ৮৪৫

২৭ C.O.R. ৩.১০.১৭৮১

২৮ B.O.R. Sayer Proceedings, ৩০.৬.১৭৯০

২৯ Cal. C.O.R. ২৭.৭.১৭৭৫

৩০ Cal. C.O.R. ২৪.৭. ১৭৭৫

৩১ Cal. C.O.R. ২৭.৭.১৭৭৫

৩২ 'Parochial Annals of Bengal…' (কলকাতা ১৯০১) লেখক হেনরি বেরী হাইড, পৃ ১৪১-৩

৩৩ 'The Nabobs…' (লণ্ডন ১৯৬৩) লেখক পি স্পিয়ার, পৃ: ৩৭

৩৪ B.O.R. Misc ২৯.৪.১৭৮৮

৩৫ C.O.R. ১৭.১২.১৭৮৪

৩৬ 'Topography & vital Statistics of Calcutta' in 'Calcutta keepsake' (কলকাতা, ১৯৭৮, অলোক রায় সম্পাদিত) লেখক এফ পি ষ্ট্রং, পৃ: ১১২-১৪৯।

# অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন : নেপথ্য কথা

প্রসূণ মুখোপাধ্যায়

## এক

বিগত শতকের 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বা অভিনয় হিতকারী আইন সম্পর্কে (Act No. XIX of 1876) নতুন করে বলবার কিছু নেই। এই কালাকানুন যে স্বৈরাচারী শাসকের অবিরাম শোষণের একটা দিক সে বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত। ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গালয়ে'র প্রতিষ্ঠা; আর ঠিক চার বছর এক সপ্তাহের মাথায় এই আইন প্রযুক্ত হয়। এর থেকে প্রমাণ হয়, সরকার মনে করেছিলেন যেমন করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা উচিৎ, ঠিক তেমনি করে নাটকের কণ্ঠরোধ কণ্ঠরোধ করা আশু প্রয়োজনীয়। কারণ—নাটক সজীব সংবাদপত্রের কাজ করে চলেছিল। সেকালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনকে কেন্দ্র করে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল। ছবিটাতে ছিল—কামান দেগে মশা মরা হচ্ছে। খুব মজা করেছিলেন কার্টুনিস্ট। ছবিটি সাদরে সংরক্ষিত হয়েছিল, অভিনন্দন পেয়েছিল অজস্র। আজ একশ দশ বছর পর মনে হচ্ছে সেদিনের নাট্য আন্দোলনকে শাসকগোষ্ঠী 'মশা' বলে ভাবতে পারেন নি—যদিচ এতদ্দেশীয়'দের ধারণা ছিল নাট্য আন্দোলন ব্যাপারটা মশার সামিল।

অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন যে কতটা সুপরিকল্পিত এবং একটা নাট্য আন্দোলনের কতটা শক্তি বা গতিবেগ থাকতে পারে সে সম্পর্কে বিগত শতকের এলিট'রা খুব একটা সচেতন ছিলেন না। ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ছিল তার প্রমাণ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র একটি প্রতিবেদন :

"গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর এইরূপ শাসন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর দীর্ঘকাল আমাদের এই আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।" (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬)

১৯০১-এ 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সেই প্রতিবেদন পাঠ করলে—একজন ইতিহাসের গবেষক বিপথগামী হতেই পারেন।

"কি কুক্ষণে 'গজদানন্দ' অভিনয় করা হইয়াছিল। সেই দুষ্ট মুহূর্তে যে ব্যক্তিগত শ্লেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহার পরিণামে আজ থিয়েটারে দেশের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত সকল লোকেরই লাঞ্ছনা করা হইয়া থাকে।...

থিয়েটারে সামাজিক ব্যাধির ঔষধ দিবার সুবিধা আছে বলিয়া কি ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে ব্যক্তিগত নির্বুদ্ধিতা, দোষ, পাপ এবং কুকার্য্য লইয়া থিয়েটারে সঙ দিতে হইবে?"

'রূপ ও রঙ্গে'র প্রতিবেদক মনে করেছিলেন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' বা 'হনুমান চরিত্র' রচনার জন্যই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রতিবেদকের এই অনুমান একজন বিশুদ্ধ ভাববাদীর অনুমান। অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের নেপথ্যে বুর্জোয়া আন্দোলনের জটিলতা বর্তমান। বুর্জোয়া আন্দোলনের দুটো দিক সত্যি। তার একদিকে আমরা দেখি অজস্র বৃষ্টি-ধারার মত নেমে আসে নতুন চিন্তা, মনন, প্রগতিমূল কর্মকাণ্ড; অন্যদিকে এই আন্দোলনের একটা পর্যায়ে দেখা যায় জ্ঞানের আলোগুলো ঘর ধরাবার মশালে পরিণত হয়েছে। অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের নেপথ্যে এই দ্বি-মুখী মনোভাব কাজ করেছে। আজকের গবেষক'দের কাছে সেই দ্বৈধতত্ত্ব খোলা ছাড়িয়ে বলবার দিন এসেছে।

## দুই

ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) স্থাপিত হবার আগে থেকেই বাংলা নাটকের প্রতিবাদীকণ্ঠ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের 'দি পার্সিকিউটেড' বাংলায় লেখা নাটক নয়, নাটকাটি শেষ পর্যন্ত অভিনীতও হয়নি—তবু এই 'বিতাড়িত' নামক ক্ষুদ্র নাট্য পুস্তকটি থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল বাঙালী নাট্যকারেরা নাট্যমাধ্যমে অতঃপর কি বলতে চাইবেন। ১৮৩১-এর পর ১৮৫২ এই সময়ে নাটকের চাষ শুরু হয়। সে সময়ের নাটকে বেশ কিছুদিন আত্ম পাষণ্ড পীড়ন চলেছিল। রামনারায়ণ প্রমুখের কাল বিগত হলে ডাক বিভাগের কর্মী দীনবন্ধু লিখলেন 'নীলদর্পণ'। 'পার্সিকিউটেড'-এ যার শুরু, নীলদর্পণে তার ঋদ্ধি। নীলদর্পণের দেখাদেখি, গড়ে উঠল একাধিক দার্পণিক নাটক। মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণের' কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

'জমিদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

"আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।" ( বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র )

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে বিগত শতকের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কটের চেহারা প্রকট হয়ে যায়। বিগত শতকের মহান শিল্পীরা যে এক প্রবল দ্বৈধতার মধ্যে দিনরাত অতিবাহিত করেছেন তার প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে আছে। এই দ্বৈধতা অসম্পূর্ণ বিপ্লবের ফল। বর্তমান প্রাবন্ধিকের প্রতিপাদ্য—অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইনের নেপথ্যে বিগত শতকের এলিট'দের দ্বৈধতা, মান-অভিমান, প্রতি আক্রমণ অনেকাংশে দায়ী। স্বৈরাচারী শাসক এলিট'দের এই দ্বৈধতাকে নিজের প্রয়োজনে সযত্নে লালন করে থাকেন। যুযুধান দুইপক্ষকে সমান মদত দিয়ে জনসাধারণকে বিহ্বল করেন। অতঃপর অত্যন্ত ভালো মানুষের মত সমাজ হিতৈষীর নির্মোকটি পরে জনগণকে বলেন—'অবশেষে আইন করতেই হল লোকলক্ষ্মীর করুণ আবেদনে।' জনগণ বিষয়টিকে হিসেব করে দেখবার আগেই আইন পাশ হয়ে যায়। এইটাই আমাদের দীর্ঘ দিনের ফলিত অভিজ্ঞতা। তবে অবশ্যই এলিট'দের দ্বৈধতা বুর্জোয়া আইনের একমাত্র উপাদান নয় ; এই কথাটিও ইতিহাস বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বদা স্মরণীয়।

## তিন

"The event is of national importance"—নবগোপাল মিত্র।

মহা ধুমধামে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনালের অস্থায়ী মঞ্চে নীল-দর্পণের অভিনয় হল। গিরিশচন্দ্র তখন দলের বাইরে। এই অভিনয় যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল সর্বস্তরে তার অবিসংবাদী তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ২০ ডিসেম্বর 'সুলভ সমাচার' সমাচার লিখল ঃ

"কলিকাতা ন্যাশনেল থিয়েট্রিকেল সোসায়িটির সভ্যেরা গত শনিবার রাত্রে নীলদর্পণের অভিনয় করিয়াছেন, ইহা উত্তম হইয়াছিল। সভ্যতা যতই বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ আমোদ সকলের সৃষ্টি হইবে।"

নবগোপাল মিত্র সগর্বে ঘোষণা করলেন--

"The event is of national importance". অমৃতবাজারে ( ১২ ডিসেম্বর ১৮৭২ ) নীলদর্পণের অভিনয় বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট বের হলো। দুটি রিপোর্টের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(ক) "নবীন মাধব বলিলেন যে, আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্বনাশ' বাক্য কয়েকটি উচ্চারিত হইবা মাত্রেই দর্শকমণ্ডলী মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।

(খ) "যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

'কলিকাতাবাসী দর্শকমণ্ডলী মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল'—এই তথ্যটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। বিগত শতকে গ্রাম এবং শহরের মানুষের মধ্যে যে কতটা ব্যবধান ছিল তার প্রমাণ রয়েছে উদ্ধৃত প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদন থেকে আরওস্পষ্ট হয় জঘন্য শোষণকে শহরের মানুষ তর্জনী সংকেত করে সনাক্ত করতে পারেননি। যদি সনাক্ত করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা ক্রন্দন করতেন এবং বিগত শতকের শ্রেষ্ঠ নট নীলদর্পণের অভিনয়কে স্বাগত জানাতেন। কিন্তু আদৌ ব্যাপারটি অন্য দিকে চলে গেল। ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭২ এবং ২৭ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' দুটি চিঠি প্রকাশ করলেন। এই চিঠি দুটি ঐতিহাসিক নাট্যানুষ্ঠানকে বিরুদ্ধাচরণ করল প্রকারান্তরে। সম্ভবত গিরিশ লিখিত প্রথম চিঠির দৃষ্টে ১০ ডিসেম্বর 'ইংলিশ ম্যান' নীল দর্পণের দ্বিতীয় অভিনয়ের পূর্বে লিখল—

"একটি স্বদেশীয় পত্রিকা থেকে জানতে পারলাম যে খুব শীঘ্রই জোড়াসাঁকোর ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ অভিনীত হতে চলেছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নাটকটি অনুবাদের জন্য ( যাতে ইংরাজ চরিত্রের নানাবিধ দোষত্রুটি দেখানো হয়েছে ) রেভাঃ মিঃ লঙ সাহেবের এক মাসের কারাদণ্ড হয়। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে—কি করে এর সংশোধনের পূর্বে সরকার নাট্যাভিনয়ের অনুমতি দিচ্ছেন! এই নাটকটিতে সরকার বিরোধী প্রচুর উত্তেজক দৃশ্যাবলী আছে।"

'ইংলিশ ম্যানে' প্রকাশিত এই প্রতিবেদন প্রমাণ করে নীল দর্পণের অভিনয় সরকার পক্ষের হিতৈষী'দের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। দেশীয় নট ও

নাট্যকারেরা এই দিকটির প্রতি মনোযোগী না হয়ে ঠিক সেই সময় পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি এই শতকের পাঁচের দশকে—ষাটের দশকের গোড়াতে। গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় অনুগামীরা ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সৎনাট্য, ঠিক নাটক, নবনাট্যের জিগির তুললেন। আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, এই ঘটনাগুলি আসলে ঐতিহাসিক মধ্যস্বত্বভোগীর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উদ্ভুত।

সে যাই হোক, ন্যাশনালের উদ্যোগে 'নীল দর্পণের' দ্বিতীয় অভিনয় হয়ে গেল। দলের স্বার্থে নীল দর্পণের নাম আর কেউ উচ্চারণ করলেন না। মঞ্চে এল লীলাবতী, প্যান্টোমাইম, নবীন তপস্বিনী, নয়শো রূপেয়া, 'ভারত-মাতা' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। এই শেষোক্ত দৃশ্য কাব্যটি প্রতিবাদী চেতনার গৈরিক কেতন। হিন্দুমেলার আঁচ লেগেছিল এই নাটিকাটির গায়ে।

১৮৭৩-এর ৭ মার্চ পর ন্যাশনাল থিয়েটার দু'ভাগ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনালে অভিনীত হল 'হেমলতা'। এটি রোমাণ্টিক নাটক হলেও চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পরাধীনতার বেদনা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে—

"স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হবার আগে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণ ত্যাগ করুক।"

লক্ষণীয়, যে গিরিশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান মিরারে, নীলদর্পনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন এবং যাঁর পত্র দুটি শাসকের পক্ষে গিয়েছিল তিনিই আবার 'হেমলতা'র মত নাটককে মঞ্চে নিয়ে এলেন। ধনবাদের অভ্যুদয়ে যে অসম্পূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হয় উপযুক্ত ঘটনা তারই অভ্রান্ত সাক্ষী।

ইতিমধ্যে শরৎ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটার চালু হয়েছিল। এরা কিছু দিন মোহন্ত-এলোকেশী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততা থেমে গেলে মঞ্চে এল 'পুরুবিক্রম।' এর তিন মাস পরে 'বঙ্গের সুখাবসান।' উভয় নাটকের জনয়িতা সেই হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়। 'বঙ্গের সুখাবসান' সরকার পক্ষকে বিচলিত করেছিল। তার প্রমাণ রয়েছে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণায়ঃ

"১৮৭৫ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হই। ইহাতে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের নিমন্ত্রণ করা

হইয়াছিল।…সকল গ্রন্থবার্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন।…হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত "বঙ্গের সুখাবসান" নাটকের কথা পড়িয়া ছোটলাট তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলাল বাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন।" ( হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত', ১৩৫৪, পৃঃ ১১১ )

## চার

বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে ১৮৭৩-এর ২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বা ভুবনমোহন নিয়োগীর থিয়েটার শুরু হয়। গ্রেট ন্যাশনালে নীলদর্পন ও হেমলতার অভিনয় হয়। অভিনীত হয়—'ভারতে যবন'। হরলাল রায়ের 'বুদ্র পাল'। ১৮৭৫-এর উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' খুব আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল দলের একটা বড় অংশ পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন অতঃপর। এই দলটিতে ছিলেন ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দু শেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্র মণি, বিনোদিনী। গ্রেট ন্যাশনাল ভ্রমণ করে কত অর্থ উপার্জন করলেন সে বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের অম্বিষ্ট নয়। আমরা শুধুমাত্র দেখাতে চাই 'নীল দর্পণের' অভিনয়কে লক্ষ্ণৌ-এর শাসক গোষ্ঠী কী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নটী বিনোদিনী লিখেছেন—'অভিনয় জমে গিয়েছিল।'

"ক্রমে সেই দৃশ্য'টা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম রক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে—'ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে।'… সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়ালো, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফ্লুট লাইটের কাছে জমা হতে লাগল—সে একটা কি কাণ্ড। কতকগুলো লালমুখো গোরা তরোয়াল না খুলে স্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের ধরে রাখতে পারে না।"

গ্রেট ন্যাশনালের ডাইরেক্টার হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। হীরকচূর্ণের পর মঞ্চে এল 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রতিবাদের বিজয় কেতন উড়িয়ে দিল। তারপর জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী'। ক্রমে অভিনীত হল 'ভারতমাতা'। এই ভারতমাতা নাটকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি আনুগত্য থাকলেও

বর্ণচোরা দেশপ্রেম ছিল। গ্রেট ন্যাশনাল যখন উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ একটা নতুন জায়গায় চলে গেছে সেই সময় দক্ষিণা চ্যাটার্জী লিখলেন 'চা-কর দর্পণ'। সরকার গ্রেট ন্যাশনালের ওপর যে কড়া দৃষ্টি রেখেছিলেন, 'চা-কর দর্পণ' নাটকটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। এই সঙ্গে স্মরণীয়, সমসাময়িক ব্রাহ্ম সমাজ এবং হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ উপেন্দ্রনাথ দাস তথা গ্রেট ন্যাশনালের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। শরৎ সরোজিনী'র এক জায়গায় উপেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের আক্রমণ করে লিখেছিলেন—

'আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও'।

ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডের বাসিন্দা জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ঠিক এই সময়ে রানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র এডওয়ার্ডকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ জানালেন। এই ঘটনায় ছি-ছিক্কার পড়ে গেল দিকে দিকে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখল—

যে মূল্যে ইনি রাজ সম্মান ক্রয় করিলেন, তাহাতে সমস্ত জাতির সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইয়াছে।

অমৃতবাজারের প্রতিবেদন ঃ

"যে পাষণ্ড পরিবারের মর্যাদা এইভাবে ধূলিসাৎ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, সে দেশের জাতি ও সমাজের ব্যধি স্বরূপ, ঘোর কলঙ্ক।"

শুধু পত্র পত্রিকা নয়, বুর্জোয়া আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকেরা অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র প্রমুখেরা বার কাউন্সিলে এই ঘটনার নিন্দায় পঞ্চমুখ হলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'বাজিমাৎ' কবিতা।

"ধন্য হে মুখুজ্যে ভায়া বলিহারি যাই,
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব সি. এম. আই ॥"

এডওয়ার্ডের আগমনে শহর কলকাতায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে, ধনীমানী মানুষদের মধ্যে পরিষ্কার দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদল ঝুঁকে পড়লেন শাসকের পক্ষে ; অন্যদল পরোক্ষ প্রতিবাদ বা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু করলেন।

মঞ্চে এল 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' ১৯-এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬। কানাঘুষা হতে লাগল যে বড়লাট 'গজদানন্দের' উপর খড়্গহস্ত। শেষ পর্যন্ত ২৬-এ ফেব্রুয়ারি 'গজদানন্দ' বদলে নামকরণ করতে হলো 'হনুমান চরিত্র'। ১ মার্চ ১৮৭৬, গ্রেট ন্যাশনালে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র সঙ্গে 'গজদানন্দের' পুনরাবৃত্তি-কালে পুলিশ সুপার ল্যাম্ব, ডেপুটি কমিশনার লেমবার্ট ও শ্যামপুকুর থানার ও. সি. থিয়েটারে উপস্থিত হন। 'হনুমান চরিত্র' বদলে অভিনীত হলো—

'দি পুলিশ পিগ্ এণ্ড দি সিপ'। কিন্তু গেস্ট ন্যাশনালের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে নর্থব্রুক অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। ৪ মার্চ, ১৮৭৬ গেপ্তার হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর প্রভৃতি আটজন। অভিযোগ : অশ্লীল নাটকের অভিনয়। কিন্তু মজা এই আদালতে মিঃ অ্যালেন, চার্লস ওয়েন ( দোভাষী ) শ্যামাচরণ সরকার—কেউই নাটকটির মধ্যে অশ্লীলতা খুঁজে পেলেন না। বিচারপতি ফিয়ার জানালেন—

'সুরেন্দ্র বিনোদিনীকে অশ্লীল আখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নেই'। এই দুঃসাহসিক রায় দেওয়ার জন্য ফিয়ারকে স্বদেশে ফিরতে হল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং রেভাঃ কৃষ্ণমোহন সমস্বরে বললেন—'সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে অশ্লীলতা নেই।' বিশেষ করে শেষোক্তজন উপেন্দ্রনাথকে পত্রে জানালেন—

"I am bound to say, I have not detected any passage either obscene in itself or likely to suggest obscene ideas to the readers mind."

কিন্তু সমস্ত আইন-কানুন, দেশী-বিদেশী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের আবেদন নিবেদনকে অগ্রাহ্য করে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হল। দশটি অনুচ্ছেদে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল—'তিন মাস জেল হবে অথবা জরিমানা আদায় করা হবে অথবা দুটিই বলবৎ হতে পারে।' আর যাত্রা বা কোনো ধর্মীয় উৎসবের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হবে না।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি একশ' দশ বছর আগের একটি কালা আইন। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এই আইনটির নানা দিক পুনর্বিবেচনা পেতে পারে—এই ভরসায় নেপথ্য কথা ব্যক্ত হল। এই নেপথ্য কথার দ্বারা এইটাই প্রমাণ করতে চাইছি—বারংবার মধ্যবিত্তের আন্দোলনে একটা ফাটল দেখা যায়। শাসক গোষ্ঠী এই ফাটলটিকে অতি যত্নে লালন করে রাতারাতি অর্ডিন্যান্স জারি করে। অত্যন্ত চতুর উপায়ে একটা bad name ছড়িয়ে দেয়। তারপর kill করে। একেই বলে—'give him a bad name and kill him theory.' এই theory খুব পুরনো। মধ্যবিত্ত এই theory জানেন; তবু এই নিদারুণ ফাঁক থেকে সরে আসতে পারেন না। বিগত দশকে উৎপলবাবু যখন একা সংগ্রাম করছিলেন মিনার্ভা মঞ্চে তখন শম্ভুবাবুরা ব্যস্ত ছিলেন 'অয়াদিপাউস' নিয়ে। মঞ্চে বারবার উচ্চারিত হয়েছিল 'মানুষ কি অসহায়!' একাধিক নাট্যদল নবনাট্য, সংনাট্য, ঠিকনাট্য প্রভৃতির বর্ম এঁটে শ্যাম ও কুল

রক্ষার ভেল্‌কি দেখাচ্ছিলেন। মধ্যবিত্তের ভেক ও ভেল্‌কি দেখানোর সুযোগে গণনাট্য আন্দোলনের স্রোত মুদ্রিত দল পদ্মের ভিতরে আবদ্ধ ভ্রমরীর মত ছট্‌ফট্‌ করছিল। এইটাই হল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও মর্মান্তিক ট্র্যাজাডি।

# রজনীকান্ত গুপ্ত—মহাবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চা

স্নিগ্ধা সেন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ এবং তার গতিপ্রকৃতি সমসাময়িক কালে এবং তার পরেও বহুল পরিমাণ রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। ঊনিশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত অর্থাৎ বিদ্রোহের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এ বিষয় নিয়ে প্রায় তিনশত রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[১] এইগুলির মধ্যে ভারতীয়দের রচনার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। ১৮৬৯ সালে ভোলানাথ চন্দ্রের The travels of a Hindu to various parts of Bengal and Upper India প্রকাশিত হয়েছিল।[২] এটি মহাবিদ্রোহের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। চণ্ডীচরণ সেনের 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে এটিও কোন ইতিহাস নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৫৮-১৯০০ এই সময়ের মধ্যে আরো কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] কিন্তু কোনটিই মহাবিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। এই দিক থেকে রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'কেই ঊনিশ শতকে লেখা একটি মহাবিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে ধরা যেতে পারে।[৪]

একই সময়ে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী[৫] ও কিশোরীচাঁদ মিত্র[৬] একই বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছিলেন কিন্তু তাঁদের রচনাগুলি খুবই একপেশে অর্থাৎ এগুলিতে আছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এ রচনাগুলি একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ শক্তির নিকট নিজ সম্প্রদায়ের রাজভক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাস লেখনের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কিছু থাকবে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য যখন স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে বিষয়বস্তুকে বলি দেয় তখন সে রচনা কতটা ইতিহাস সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে বই কি। এই দুই বাঙলী মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে লিপিবদ্ধ করেছেন। "দুইজনেই 'Hindu' এই কথার অন্তরালে নিজেদের নামকে গোপন রেখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন মুসলমান বা অ-হিন্দুদের কাজ এবং হিন্দুরা বিদ্রোহ বিরোধী।[৭]

এই দুজনের বিপরীত মেরুতে রয়েছেন স্যার সৈয়দ আহ্মদ খান যিনি তাঁর লেখায়[৮] ইংরাজরাজের ওপর মুসলমানদের রাজভক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল দুটি। এক, ঊনিশ শতকে যেখানে গড়ে বছরে দুটি করে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ভারতীয় রচনার সংখ্যা এত নগণ্য কেন? দুই, আবার যে বাংলাদেশে "মহাবিদ্রোহ সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন সেই বাংলাদেশের মানুষ মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চায় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলো।"[৯] বাংলাদেশের এই ভূমিকা কেন?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর ইংরেজ জাতের স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি চেতনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের ছিল এক আত্মিক যোগ—শশিভূষণ চৌধুরী যাকে বলছেন 'deep emotional involvement of the British public in the nineteenth century in the fortune of the 'Empire', the existence of which was threatened by the rising of the sepoys[১০]

এই 'deep emotional involvement'-ই ইংরাজদের রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই তাদের রচনাগুলিতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদেরই জয়গান যেখানে ছিটেফোঁটা সহানুভূতি বা সমর্থন ভারতবর্ষের বিদ্রোহীরা পায় নি। যারা নিজেদের স্বাধীনতা, স্বধর্ম ও স্বাধিকারের জন্য লড়াই করেছিল, জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল, তারাই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের কাছে 'ডাকাত' 'গুণ্ডা', বদমাশরূপে চিহ্নিত হয়েছিল।[১১]

কোন কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মহাবিদ্রোহের ইতিহাসকে ব্রিটিশ শৌর্যের এক অমর কাহিনীরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁদের কাছে মহাবিদ্রোহের ইতিহাস ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র যে অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ব্রিটিশ সেনাপতিদের গৌরবগাথা।[১২]

রাজনীকান্ত গুপ্তও কিন্তু এক স্বজাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস লেখায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এর পঞ্চম ভাগে তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরছেন। "ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয়ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।"[১৩] এই স্বদেশ ও সমকাল সচেতনতা

ও স্বাজাত্যবোধ ঊনিশ শতকীয় বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিকদের উপেক্ষিত বাংলাদেশই কেন মহাবিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় অগ্রণী হয়েছিল।

নিঃসন্দেহে এটুকু বলা যায় যে ঊনিশ শতকের বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সাহিত্য, রাজনীতি এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক অগ্রসর ভূমিকা নিয়েছিলো। এক নূতন জীবন ও মনন দেখা গিয়েছিলো বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে। "ঊনিশ শতকের বাঙালী কেবল যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েছিল তাই নয়, নব যুগের এক বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনর্জীবন ও প্রসার এবং সেই অমূল্য ভাণ্ডার হতে অনুপ্রেরণা লাভ।"[১৪]

বাঙালীর এই ইতিহাসচেতনা পূর্ণতা লাভ করেছিলো রজনীকান্তের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "...আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব? আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এর আশা করি না, কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশী নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।"[১৫]

রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সেই জাতের লেখা যাতে আমরা স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তৃত্ব দেখতে পাই। তাঁর ইতিহাস চর্চার পিছনে ছিল এই জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবোধ এবং ইতিহাস চর্চা এই দুইয়ের মিলন আমরা প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রে দেখতে পাই। বাংলা ও ভারতের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে এই বোধকে তিনি প্রখর করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশী দৃষ্টিতে না দেখে স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখতে হবে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অভিপ্রায়[১৬] ছিল'।

রজনীকান্ত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই সাহিত্য শিষ্য। ঊনিশ শতকের স্বাজাত্যবোধের বাতাবরণের মধ্যে তাঁর জন্ম। তাঁর কর্মের বিস্তৃতি খুব একটা বেশী ছিল না কিন্তু তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যেই এই একই মানসভঙ্গীর প্রকাশ। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহ্যস' ছাড়া তিনি অন্যান্য যা কিছু রচনা করেছিলেন সমস্ত রচনাই স্বাজাত্যবোধের একক উৎস থেকে রস আহরণ করেছে। রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে আর্যকীর্তি (৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ), ভারতকাহিনী, ভীষ্ম, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, ভারত প্রসঙ্গে, আমাদের জাতীয়ভাব ও আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়। এই গ্রন্থগুলি "আলোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয়তা-বাদের উন্মেষকালীন যে সব বৈশিষ্ট্য একে বিশিষ্টতা দান করে রজনী-কান্তের মধ্যে তার অনায়াসলক্ষ্য অভিব্যক্তি।"[১৭]

ঊনিশ শতকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-সাধন। রজনীকান্ত আজীবন এই ব্রতে ব্রতী হয়ে জাতীয় ভাষায় ইতিহাস চর্চা করে গিয়েছেন। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এর মতো এত বড়ো গ্রন্থ তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করে বাংলা ভাষার শক্তির ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। ইতিহাস রচনার আধুনিকতম পদ্ধতির সাথে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' রচনাকালীন তিনি প্রসিদ্ধ পুস্তক রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্তা প্রভৃতি থেকে ইতিহাসের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। স্বদেশীয়দের লেখা স্বদেশের ইতিহাসের অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন। অথচ স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর। এই কথাটি হৃদয়ের একেবারে অন্তঃস্থলে বুঝেছিলেন বলেই তিনি স্বদেশের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন কর্তব্য নহে। ইংরেজ চিত্রকরের হস্তে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অরঞ্জিত, কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা যেরূপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ অতি-বর্ণিত বা অবর্ণিত ইতিহাস পড়িলে ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না।"[১৮]

একটু অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ভারতবাসীর লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে "কিন্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশী বিকৃত করে।"[১৯]

বিদেশীদের ওপর ভরসা না করে নিজেদের দেশের ইতিহাসকে রচনা করার যে প্রয়াস ঊনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তার প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন—

"এক্ষণে আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যে যে একটি ইতিহাস উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে সার্বজনীন সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাকে আমরা আকস্মিক এবং ক্ষণস্থায়ী একটা বিশেষ ধরণের রচনাকাণ্ড বলিয়া স্থির করিতে পারি না। আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের

মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটি স্বাভাবিক ফল।"[২০]

এই ইতিহাসক্ষুধা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় যাদের মধ্যে ছিল রজনীকান্ত গুপ্ত তাদের অন্যতম। শুধু যে সুদূর অতীতের গৌরবগাথাই তাকে আকৃষ্ট করেছে তাই নয় সমকালীন ঘটনাও তাকে ইতিহাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' এই প্রেরণাবশেই তিনি লিখেছিলেন।

যে সময় ও যে কালে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্যত হয়েছিলেন সে সময় ও সে কাল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এক সন্ধিক্ষণ। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি অন্যদিকে এক মোহভঙ্গের পর্যায় শুরু। "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়।"[২১]

এই মাহেন্দ্রক্ষণে রজনীকান্তের আবির্ভাব এবং এই যুগ সন্ধিক্ষণের সকল গুণেই[২২] যথা স্বাজাত্যবোধ, তথ্যনিষ্ঠা, সামাজিক সচেতনতা এবং কোঁতের দর্শনের প্রভাব তার রচনার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।[২৩] "স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির স্বাক্ষর ও ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ বর্ণনা বর্তমান যুগের নিরাসক্ত নির্মম যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে হয়তো ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের যুগে এই গ্রন্থ যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল।"[২৪]

এই প্রসঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পর্কে ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরীর উক্তি স্মরণযোগ্য। "If the purpose of history is to stir a nation to action Vinayak Damodar Savarkar was a historian."[২৫]

রজনীকান্তের গ্রন্থ জাতীয় আন্দোলনের যুগে যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল এখানেই তার সার্থকতা। রজনীকান্তের ইতিহাসচর্চা বা দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝতে গেলে তাঁর সমকালকে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে হবে। যে বিদ্রোহ ইংরাজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, যে বিদ্রোহকে ইংরেজ চার্টিস্ট নেতা আর্নেষ্ট জোন্স "The Revolt of Hindustan"[২৬] নামে অভিহিত করেছেন ইংরেজ শাসনে সেই বিদ্রোহের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে তিনি অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। "ইংরাজ আমাদের ক্ষমতাশালী প্রভু। সেই ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, অন্যায় ও অত্যাচারও যদি ঘটে তথাপি তাহা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ আসক্তিতে অভিভূত করিয়া রাখে।"[২৭] রজনীকান্ত এই ভয়, বিস্ময় এবং অন্ধ

আসক্তির ঊর্ধ্বে তাঁর মানসিকতাকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং অবলীলা-ক্রমে ব্রিটিশ দমননীতির সমালোচনা করতে পেরেছেন। সাভারকরের মতো তিনি মহাবিদ্রোহকে হয়তো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে পারেন নি কিন্তু সিপাহীরা যে স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহমাত্র ছিল না। তিনি যে শুধু অকুণ্ঠচিত্তে সিপাহীদের এই আত্মদানের কথা উল্লেখ করছেন তাই নয় এই প্রসঙ্গে ভারতের ইতিহাস চর্চার দীনতা তাকে আহত করেছে।[২৮] এমন কি তিনি এ কথাও অনুভব করেছিলেন যে "ঐতিহাসিক যদি উহার ( সিপাহী যুদ্ধের) উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে তাহার উদ্বোধন হইবে যে এ মহাবিপ্লব কেবল সৈনিকে আবদ্ধ থাকে নাই।"

অবশ্যই এ উপলব্ধি তাঁকে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে অন্য কোন ব্যাখ্যায় বা সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় নি এবং তাঁর কাছে ১৮৫৭র উত্থান সিপাহীদেরই যুদ্ধ ছিল—গ্রন্থখানির নামকরণই তার পরিচয় বহন করে।

'একথা অবশ্য স্বীকার্য যে রজনীকান্ত যে সময়ে ইতিহাস লিখেছিলেন তখন পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত রচনাবলী এতদূর তথ্য নির্ভর ছিল না যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনাসমূহের পশ্চাতে যে জনগণের অংশগ্রহণ ও সমর্থন ছিল তা স্পষ্ট প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং এটা আশা করা যায় না যে তাঁর অব্যবহিত পরের গ্রন্থকার সাভারকরের মতো তিনি সিপাহী যুদ্ধের একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।[২৯]

এর দুটি কারণ থাকতে পারে। এক, রজনীকান্ত এবং সাভারকরের প্রকৃতিগত পার্থক্য। রজনীকান্ত ছিলেন একান্তভাবেই সাহিত্যসেবী। সাহিত্য এবং ইতিহাস চর্চার মধ্যেই তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে সাভারকর সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। অতএব এই দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই পার্থক্যই যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের পার্থক্যের মূল কারণ। দুই, রজনীকান্তের গ্রন্থখানি একান্তভাবেই Sepoy War কে আশ্রয় করে লিখিত হয়েছে। কে-র গ্রন্থে তাঁর পূর্বের গ্রন্থকার Charles Bali-এর কোন উল্লেখ নেই[৩০] যিনি কিনা এই বিদ্রোহে একটি জাতীয় চরিত্র দেখতে পেয়েছিলেন।

রজনীকান্ত অবশ্য তাঁর গ্রন্থে চার্লস বল-এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু মনে হয় বল-এর বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে উপলব্ধি তাঁকে খুব প্রভাবিত করতে পারে নি।[৩১] তাই বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে রজনীকান্ত খুব স্পষ্ট নন যদিও

গ্রন্থের অনেক স্থানেই বিদ্রোহের প্রতি জনসমর্থনের কথা তিনি উল্লেখ না করে পারেন নি।[৩২]

এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে রজনীকান্ত যদি ১৮৫৭-র বিদ্রোহে জনসমর্থনের কথা উপলব্ধি করতেই পেরেছিলেন তবে এর গণচরিত্র সম্পর্কে তিনি স্পষ্টাস্পষ্টভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি কেন? এখানে তাঁর ভূমিকা কিন্তু পরিষ্কার।

এক, তিনি বিদ্রোহের কারণ, সিপাহীদের বীরত্ব বিদ্রোহের নায়কদের শৌর্য বীর্য এবং ইংরাজ শাসকদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ইত্যাদির সঠিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার মতামত সর্বত্র প্রকাশ করেন নি।[৩৩]

দুই, গ্রন্থের মধ্যে তিনি 'বিপ্লব', 'মহাবিপ্লব' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন কিন্তু নিজপ্রণীত গ্রন্থের নাম দিয়েছেন "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", সিপাহী বিদ্রোহও নয়।

তিন, তিনি তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের শেষে ভারতবাসী বিশেষ করে হিন্দু বাঙালী যে রাজভক্তি শূণ্য নয় তার প্রমাণ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। একই খণ্ডে তিনি ইংরাজদের প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও অবিবেচনা এবং লর্ড ক্যানিং-এর মহানুভবতায় জোর দিয়েছেন।[৩৪] এই খণ্ডের পরিশিষ্টে গভর্ণর জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে বাঙালী বিশিষ্টজনদের লেখা দুটি নিবেদন পত্র প্রকাশ করেছেন।[৩৫] এই নিবেদনপত্রটি সম্পর্কে বিলাতের টাইমস্ পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তারও উল্লেখ তিনি করেছেন।[৩৬]

রজনীকান্তের গ্রন্থ সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে যে সততা অবলম্বন করেছিলেন, তার একটি নিশ্চিত ফল তিনি পেয়েছিলেন। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' "শুধু যে বাজেয়াপ্ত হয়নি তা নয়, গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য গ্রন্থ বলে ১৯১২ সালের ২রা অক্টোবর সরকারী গেজেটে অনুমোদিতও হয়েছিল।"[৩৭]

এই প্রসঙ্গে আমরা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'[৩৮] গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পরই বইটিকে ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।[৩৯]

বাঙালীদের রাজভক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে রজনীকান্ত যে উচ্ছ্বাস ও আবেগের পরিচয় দিয়েছেন "সমগ্র গ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে এটা এত বেমানান যে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে লেখক রজনীকান্ত কেন এমন স্ববিরোধী কথা বললেন।"[৪০]

এইখানেই রজনীকান্ত তাঁর শ্রেণীস্বার্থকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এই স্ববিরোধিতা ঊনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একদিকের শাসকগোষ্ঠীর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফত তাঁরা পেয়েছিলেন মানবতাবাদ ও বিপ্লবের শিক্ষা, অন্যদিকে ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় তাঁরা লাভ করেছিলেন প্রতিষ্ঠা, প্রাচুর্য, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। অতএব মতবাদের দিক থেকে প্রগতিশীল হলেও ইংরাজবিরোধী দেশের অভ্যন্তরীণ গণসংগ্রামকে তাঁরা সমর্থনের চোখে দেখতে পারেন নি। এদিক দিয়ে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এবং এখানেই বঙ্গীয় রিনাসান্স বা নবজাগৃতি আন্দোলনের স্ববিরোধিতা।

সংক্ষেপে ঊনিশ শতকের কয়েকজন দিকপালের স্ববিরোধিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের প্রগতি-শীলতা সন্দেহাতীত। "কিন্তু রামমোহনই আবার নীল চাষের দ্বারা কৃষকের মহা উপকার সাধিত হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া নীলকর দস্যুদের প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।"[৪১]

আনন্দমঠের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।"[৪২]

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহ চলাকালীন ইংরেজদের নৃশংস অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন কিন্তু বিদ্রোহীদের কার্যকে সমর্থন করতে পারেন নি।[৪৩] দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণের মতো নাটকেও বিদ্রোহের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি। 'নীলদর্পণ' বিদ্রোহের দর্পণ নয় অত্যাচারের দর্পণ। 'নীলদর্পণ' নাটকে তিনি ইংরাজরাজের প্রতি আস্থা হারান নি বরং অত্যাচারের জন্য গুটিকয়েক নীলকরকে দায়ী করেছেন।

ঊনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের স্ববিরোধিতার দৃষ্টান্ত আরো অজস্র। এই স্বল্প পরিসরে সকল কিছু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থ 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'-এ এই বিষয়ে মোটামুটি বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন।[৪৪]

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হলেও রজনীকান্ত রাজভক্তিকেই মহৎ গুণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ইংরাজদের বিজয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই স্ববিরোধিতা তাঁর শ্রেণী চরিত্রেরই প্রকাশ

এবং নিজের এই দ্বন্দ্বকে কিছুটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়তো তাঁর গ্রন্থে স্বীকারোক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন।

"আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল হইল, এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক সংকল্প সাধনে পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সংকল্পসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে দেশকালের অনিবার্য গতিও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই।"[১৫]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন তাঁর 'রজনীকান্ত গুপ্ত' নিবন্ধে। "বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহী যুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এ দেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য বোধ করে নাই।...দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ।"[৪৬]

এই 'দুঃসাহসের কাজে' তিনি ব্রতী হয়েছিলেন এখানেই তার সার্থকতা। বাংলায় ১৮৫৭র মহা বিদ্রোহের একটি তথ্য বহুল প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রথম প্রণেতা হিসাবে তাঁর সর্বাধিক সাফল্য।

## • নির্দেশিকা

১ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও জ্যোৎস্না সিংহরায় সম্পাদিত **রজনীকান্ত গুপ্ত: ব্যক্তিত্ব ও মনীষা** গ্রন্থে শশিভূষণ চৌধুরী: "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে।" পৃঃ ৮৭

২ এই গ্রন্থটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। "ভারতের ইতিহাস প্রণেতা জে. ট্যালবয়েড হুইলার গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের এল. ট্রুবনার এণ্ড কোং কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভোলানাথ

তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেন তৎকালীন বড়লাট স্যার জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্সকে। সুকুমার মিত্র, "১৮৫৭ ও বাংলাদেশ" পৃ ১১০

৩ "১৮৬০-এ ক্যাপ্টেন ডবল্যু. এন. লীস অনূদিত সার সৈয়দ আহম্মদ খানের উর্দু ভাষায় লিখিত রচনায় ভারতীয় বিদ্রোহের কারণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা আছে"—শশিভূষণ চৌধুরী, ঐ পৃঃ ৮৮

মহম্মদ জাফর খানেস্রীর "তারিখি-ই-কালাপানি মুসাম্মিবা" (১৮৮৫)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "তারিখি-সুবা-ই-বিহার (Tarikhi-Suba-i-bihar) শশিভূষণ চৌধুরী, ঐ পৃঃ ৮৮।

১৮৫৮-১৯০০ এই সময়ের মধ্যে লেখা আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের পাদটিকায় দিয়েছেন। (পৃঃ ৮৮) সেগুলি হল পাঁচকড়ি ব্যানার্জীর সিপাহী বিদ্রোহ ভুপতলাল, বীরঙ্গনা রাস্থ: গোলাম নবী, তারিক-ই-জাইতিয়ার (Tarikhi-Jhai Tiar) ইমতিজামউল্লা, গদর কি চান্দ, কল্যাণ সিং, লক্ষ্মীবাইকি রাস্থ।

৪ তাহলে দেখা যাচ্ছে রজনীকান্ত গুপ্তই ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ভারতীয় ভাষায় বিস্তারিত বিবরণমূলক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছিলেন এবং সে কারণেই 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সমস্ত ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেও ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে পথপ্রদর্শক গ্রন্থ"। শশিভূষণ চৌধুরী, ঐ পৃঃ ৮৮।

৫ 'The Mutinies and people, or, A statement of native Fidelity exhibited during the outbreak of 1857 58., By a Hindu.

৬ The Mutinies, the government and the People. By a Hindu.

৭ রণজিৎ সেন—'১৮৫৭র মহাবিদ্রোহ ও ভারতীয় উদাসীনতা'—রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় ১৩৮৮-৮৯।

৮ সৈয়দ আহমদ খান—রিসালা আসবাব-ই-ভগয়ৎ-ই-হিন্দ। (Rissalah Asbab-i-Bhagawat-i-Hind. Agra 1903.)

৯ রণজিৎ সেন, ঐ পৃঃ ৩৭

১০ 'English Historical Writings on the Indian Mutiny', 1857-59—S. B. Choudhury P 2.

১১ T. Rice Holmes—'A History of the Indian Mutiny' গ্রন্থে

যত্রতত্র বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য করে 'budmashes', 'gangs of marauders', 'Plunderers', 'ruffians' 'savage mob' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

১২ শশিভূষণ চৌধুরী ঐ পৃঃ ৭-৮

১৩ রজনীকান্ত গুপ্ত—'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ৫ম ভাগ পৃঃ ৬।

১৪ **রজনীকান্ত গুপ্ত : ব্যক্তিত্ব ও মনীষা** গ্রন্থে নিমাইসাধন বসু—'মনীষী রজনীকান্ত' পৃ ১৭।

১৫ **রবীন্দ্র রচনাবলী**—জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ত্রয়োদশ খণ্ড ৪৭০-৭১ পৃঃ

১৬ '**রজনীকান্ত গুপ্ত—ব্যক্তিত্ব ও মনীষা**' গ্রন্থে ভবতোষ দত্ত 'ইতিহাস সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত' পৃঃ ৪১।

১৭ অরবিন্দ পোদ্দার—'জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি : রজনীকান্ত গুপ্ত', ঐ, পৃঃ ২৬।

১৮ রজনীকান্ত গুপ্ত—ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন,' ঐ, পৃঃ ১১৯।

১৯ রবীন্দ্র রচনাবলী, ঐ পৃঃ ৪৮২।

২০ ঐ পৃঃ ৪৭৯।

২১ **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**—শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭ সালের সংস্করণ, পৃঃ ২০২।

২২ "The nineteenth century was a great age for facts"—E. H. Carr, 'What is History' ? P 8.

"First ascertain the facts, said the Positivists, then draw your conclusions from them." Ibid P 9

২৩ বিনয় ঘোষ 'রজনীকান্তের ইতিহাসবোধ' **রজনীকান্ত গুপ্ত—ব্যক্তিত্ব ও মনীষা**—গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃঃ ৮৩।

২৪ 'মনীষী রজনীকান্ত' নিমাইসাধন বসু—ঐ পৃঃ ৯৯।

২৫ English Historical writings on the Indian Mutiny 1857-59—S. B. Choudhury P 170

২৬ India's struggle for freedom—Hiren Mukherjee, P. 62.

২৭ 'ইতিহাস' রবীন্দ্রনাথ, **রবীন্দ্র রচনাবলী**, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫।

২৮ 'ইহারা ( সিপাহীরা ) স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে,

বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহীদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের বীরত্বকীর্তি উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের কীর্তিকাহিনী আবার ইতিহাসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই। বিদেশী ঐতিহাসিক অনেক স্থলে, বিদেশীয়ের বিপক্ষের জ্বলন্ত কীর্তির পরিচয় দিতেও বিমুখ হইয়াছিল।

ইউরোপে হইলে এইসকল বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্তি ঘোষিত হইত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"—রজনীকান্ত গুপ্ত, **সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**—তৃতীয় ভাগ পৃঃ ৩৩।

২৯ শশিভূষণ চৌধুরী—'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে'—**রজনীকান্ত গুপ্ত—ব্যক্তিত্ব ও মনীষা** গ্রন্থে প্রকাশিত—পৃ ৯৬।

৩০ S. B. Choudhuri—English Historical writings on the Indian Mutiny, P. 93.

৩১ 'Ball was convinced that the march to Delhi by the Meerut troops and the occupation of the city gave the movement a political significance and a national character'.—S. B. Choudhuri, Ibid P. 72

also see, Charles Ball, History of the Indian Mutiny, Vol 1 P 69.

'The movement now assumed a more important aspect. It became the rebellion of the whole people··· sustained in their delusion by hatred and fanaticism,' —Ball, Ibid. vol. I, pp. 644-45 quoted by S.B. Choudhuri, Ibid. P. 81.

৩২ 'যদি কেবল সিপাহিগণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ইংরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন···কিন্তু ভারতের অধিকার-ভ্রষ্ট ভূস্বামী ও জনসাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপন ইংরেজেদের সুসাধ্য ছিল না·· অধিকারচ্যুত ভূস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই বিপ্লব তাড়িতবেগে সর্বস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহিদিগের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত না।" —রজনীকান্ত গুপ্ত, '**সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**' ৩য় ভাগ, পৃঃ, ১২৯-৩০

৩৩ সুকুমার মিত্র—**১৮৫৭ ও বাংলাদেশ**—পৃঃ ৮৪।

৩৪ "কিন্তু বাঙালী কখনও রাজভক্তিশূন্য নহে। সুশিক্ষিত বাঙালী

উপস্থিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের জয়লাভে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। দিল্লী যখন পুনরধিকৃত হয় তখন বাংলার অধিবাসিগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে বিমুখ হয় নাই। লর্ড ক্যানিঙের সমদর্শিনী নীতিতে পুলকিত হইয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রকাশ্য সভায় গভর্ণমেন্টের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাঙালীর সংবাদপত্রও উপস্থিত বিপ্লবের গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নাই।"—রজনীকান্ত গুপ্ত—**সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২২।

৩৫ প্রথম চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ বাহাদুর, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরো আড়াই হাজারের মত বাংলার অধিবাসী।

দ্বিতীয় চিঠিটিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় এবং বাংলা, বিহার উড়িষ্যার অধিবাসিবৃন্দ।

৩৬ Times, February 4, 1858, quoted in the statements c, pp. 145-147.

রজনীকান্ত গুপ্ত—**সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৩৩।

৩৭ সুকুমার মিত্র, **১৮৫৭ ও বাংলাদেশ** পৃঃ ৮৪।

৩৮ **সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস** প্রথম খণ্ড—১৩১৬ সালের হিতবাদীর পরিচালকদের উদ্যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

৩৯ সুকুমার মিত্র **১৮৫৭ ও বাংলাদেশ**—পৃঃ ১০৭।

৪০ ঐ, পৃঃ ৮৪।

৪১ সুপ্রকাশ রায় - **ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম**, পৃঃ ১৯৩।

৪২ **বঙ্কিম রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩। যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত 'উপন্যাস প্রসঙ্গ'।

৪৩ '১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ষ সমালোচনার উপলক্ষে হরিশচন্দ্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সারবান সুদীর্ঘ বিশদ প্রবন্ধ ইংরেজীতে লেখেন তার কিছু অংশের মর্ম রামগোপাল সান্যাল তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। বিদ্রোহ হইলে যে অরাজকতা হয় সেই অরাজকতার জন্য যে সকল অত্যাচার হয়, সেই সকলের জন্য যে বিদ্রোহীরা দায়ী তাহা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু একথা স্বীকার করিনা যে একটি সমাজের কতগুলি অপদার্থ নরাধম লোকে কৃতকার্যের জন্য সেই সমগ্র সমাজ দায়ী হইবে।—রামগোপাল সান্যাল—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ১৮৮৭ খ্রীঃ এক্ষণ, ১৩৮৭ খৃঃ, ( অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ) পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত. পৃ ২৭।

৪৪ 'উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রিনাসান্সের আত্মবিরোধ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে এই উভয় অংশই ইংরেজ শাসনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াও সেই শাসনের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ভ হইলেও উভয় অংশই ছিল ১৮৫৬-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী।'—সুপ্রকাশ রায়, **ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম**, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩

৪৫ রজনীকান্ত গুপ্ত—**সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস**, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩২৮।

৪৬ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত—**রজনীকান্ত গুপ্ত—ব্যক্তিত্ব ও মনীষা** গ্রন্থে প্রকাশিত, পৃঃ ১১১।

# বম্বেতে মূলধন সঞ্চয়ে কয়েকটি দিক সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান

শমিতা সেন

পশ্চিম ভারতের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত চিরাচরিত আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং দেশীয় মূলধন সঞ্চয়ের প্রসঙ্গে সেগুলির সম্ভাব্য তাৎপর্য বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একটি দীর্ঘ গবেষণার বিষয়বস্তু। এখানে কেবল অল্প সংখ্যক তথ্যের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রাথমিক এবং পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত উপস্থাপনা করা হয়েছে।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু কেন্দ্রীভূত দেশীয় পুঁজি ছিল। এ বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার সময়ে এ কথাও দেখাতে হবে যে দেশীয় বাণিজ্য ও মূলধনের চিরাচরিত পথগুলি ভারতের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য উপাদান রূপে উপস্থিত ছিল। আমার বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বম্বেতে দেশীয় মূলধন সঞ্চয় এবং তুলনামূলকভাবে কলকাতায় তার ব্যর্থতা।

শিল্পায়ণের চরিত্রের দিক থেকে কলকাতা ও বম্বের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পার্থক্য হল অর্থনীতির উপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা। তার প্রধান কারণ হয়ত এই যে, ইংরেজরা বঙ্গদেশ জয় করেছিল অনেক আগে এবং তার ফলে বৃটিশ অর্থনীতির দখল বঙ্গের উপর অনেক গভীর ছিল। কলকাতায় ভারতীয় সহকারীরা পুরোপুরি অধস্তন অবস্থায় ছিল, এবং কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা ছিল দালাল, দাদনের কারবারি, বা বানিয়ান। বম্বেতে, ভারতীয় সহযোগীদের অনেক বেশী স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং তারা ব্যবসাতে সহযোগীরূপেই থাকতে পারত। যে পার্সী ও গুজরাটি বানিয়ারা পর্তুগীজদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে বম্বে অর্পণের এবং গুজরাটের বন্দরগুলির অধঃপতনের সময়ে বম্বেতে হাজির হয়, এ কথা তাদের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে

যে কটি মারাঠী গোষ্ঠী ব্যবসায়িকভাবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল, তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল পাঠারে প্রভুরা। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে পাঠারে প্রভুদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষায় তাদের একচেটিয়া দখল। অন্যান্য গোষ্ঠীরা ইংরেজী শিক্ষালাভ করার পর তারা এই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

বম্বে ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ না করার জন্য বিকল্পের আকর্ষণ (Pull factor) বাংলাদেশে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আকারে। জমি নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি থেকে লাভের হার ছিল চড়া। তা ছাড়া, জমিদার শ্রেণীর সামাজিক প্রথা ও জীবনযাপনের প্রক্রিয়া ছিল এমন, যে তারা নিজেদের অর্থ উড়িয়ে দিয়ে দেনা করত। অন্যদিকে, বম্বে তথা পশ্চিম ভারতে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ফলে ব্যাপক হারে মূলধন বিনিয়োগের দিক থেকে জমি খুব লাভজনক ক্ষেত্র ছিল না। তদুপরি, এই ব্যবস্থার ফলে জমিদার ধাঁচের অন্তর্বর্তী শ্রেণী বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই pull factor-এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়ে মূলধন বিনিয়োগের চরিত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কম হলেও, কিছু পরিমাণে দেশীয় মূলধন কেন বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগ করা হল না? মহাজন, বা ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা, কেন আদৌ শিল্পের দিকে পদক্ষেপ নিল না? অর্থাৎ, মূলধন শিল্পে বিনিয়োগ করায় কি কোনো রকম প্রত্যক্ষ বাধা ছিল বা সমস্যা ছিল?

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। তবে দুটি আংশিক উত্তর দেওয়া সম্ভব। প্রথমত, যে যুগের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেন বম্বেতে শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল চিরাচরিত বণিকগোষ্ঠীগুলি। একই সময়ে বঙ্গদেশে তাদের সমান্তরাল গোষ্ঠীগুলি জাতিগত অবস্থানের আনুষ্ঠানিকতা স্থাপন ও বিকাশের প্রশ্নে এত উদ্বিগ্ন ছিল, এবং এ জন্য জমি কেনা ও মন্দির স্থাপনে এত অর্থ ব্যয় করছিল, যে মূলধন বিনিয়োগের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, বম্বের জাতিভিত্তিক পেশা কাঠামোর মধ্যে ব্যবসায়িক একক হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে উল্লেখযোগ্য হল এই দুটি এলাকার সম্পত্তি হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের চারিত্রিক পার্থক্য।

হিন্দু সম্পত্তির আইন দু' রকম—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা। বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল দায়ভাগ। ভারতের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক প্রচলন ছিল মিতাক্ষর ব্যাবস্থার। এই ব্যাবস্থায় সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় বিদ্যমানতা (surviversliip) অনুযায়ী, আর দায়ভাগে তা হয় উত্তরাধিকার সূত্রে। বম্বে, উত্তর কঙ্কন এবং গুজরাটে মিতাক্ষর ব্যবস্থার যে বিশেষ রূপ বিদ্যমান ছিল, তা ছিল সপ্তদশ শতকের নীলকণ্ঠ ভট্ট রচিত ব্যবহার ময়ূখ ভিত্তিক। মারাঠারা ময়ূখ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও তারা তা গুজরাটে নিয়ে যায়। সেখানে দীর্ঘকাল মুসলিম আধিপত্যের ফলে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। ফলে সেখানে ময়ূখ পূর্ণাঙ্গভাবে গৃহীত হয়। ইংরেজরা ময়ূখের তাৎপর্য বুঝতে ভুল করে, আংশিকভাবে কারণ বারবার তার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ময়ূখের যুক্তি মেনে নিত। ফলে ময়ূখ যা সবচেয়ে "উদার" হিন্দু আইন বলে পরিচিত, তা বম্বে প্রেসিডেন্সিতে প্রাধান্য লাভ করে। উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে ময়ূখ ও মিতাক্ষরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উত্তরাধিকার ও স্ত্রীধনের প্রসঙ্গে ময়ূখ মেয়েদের অধিকার স্বীকার করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উদার। "Coparcenary" সম্পত্তি বিভাজন প্রসঙ্গে ময়ূখে ও মিতাক্ষরে কিছুটা ফারাক আছে। বাবা যদি ঠাকুর্দা এবং কাকা-জ্যেঠাদের সঙ্গে একত্রে সম্পত্তির মালিক হয় তবে ছেলে এই সম্পত্তি ভাগ করার দাবী করতে পারে না। তবে বাবা যদি স্বতন্ত্র থাকে, তবে ছেলে ঐ দাবী করতে পারে। মিতাক্ষর ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যে কোনো সময় নিজের ভাগ চাইতে পারে। কিন্তু যেহেতু coparcenary সম্পত্তিতে অধিকার জন্মের সঙ্গেই দেখা দেয়, এই দাবী সর্বদা করা হত না। কিন্তু ভাগ করার অধিকার পারিবারিক ব্যবসার কাঠামোতে ব্যক্তি স্বার্থের রক্ষা কবচ ছিল। মিতাক্ষর ব্যবস্থা উদ্যোগী তরুণদের নিজের পথে যাওয়ার জন্য পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তির কিছুটা অংশকে পুঁজি করতে দিত। মিতাক্ষর ও ময়ূখের সাধারণ নিয়ম, যা হল জন্মের সময়ে পারিবারিক সম্পত্তির হস্তান্তর, এবং তা করা বিদ্যমানতার ভিত্তিতে, যৌথ পরিবারের শক্তিকে দৃঢ়তর করত এবং ব্যাপকতরভাবে মূলধন ব্যবহারের সুযোগ দিত। দায়ভাগ ব্যবস্থায় ছেলে সম্পত্তি পেত বাবার মৃত্যুর পরে। তদুপরি, তিনি সম্পত্তি অন্যদের দিয়ে যেতে পারতেন। এই অবস্থায় তার ক্ষমতা বেশী থাকলেও উৎপাদনে পারিবারিক উদ্যোগে ব্যক্তির অধিকার রক্ষিত হওয়ায় যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা ছিল বেশী; এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই থাকত, এবং যে কোনো সময় গড়ে ব্যাপকতর বিনিয়োগযোগ্য মূলধন পাওয়া যেত।

## BIBLIOGRAPHY


1. Pamela Nightingale : Trade and Empire in Western India, OUP, 1970.
2. C. Dobbins : Urban leadership in Western India, 1972.
3. R. E. Enthovan : Tribes and Castes of Bombay, Vols. II & III.
4. Douglas C. North : Institutional Change and Economic Growth, Journal of Economic History. Vol. 30-33 (1970-1973)
5. Ravinder Kumar : Western India in the Nineteenth Century.
6. Ravinder Kumar : Indian and the Persian Gulf.
7. The Gazetter of Bombay City and Island, Vol. I, 1909.
8. R. S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India 1851-1900, OUP, 1970.
9. Jayakar : Story of My life.
10. M. C. Setalvad : Common Law of India.
11. Pande : History of Kayasth Prabhus.
12. Mulla : Hindu Law (ed. Desai & Tripathi) IV Edition
13. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোম্বাই চিত্র

# বাঙলার পোড়ামাটির মন্দির-শিল্প ও শিল্পীসম্প্রদায়ের অবনতি

সুদীপ্ত সেন

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে পোড়ামাটির মন্দিরের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। অথচ এই শিল্পের অবনতি ও পোড়ামাটির শিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিণতির সম্বন্ধে বাংলার ইতিহাস অনেকাংশে নিরুত্তর। এই নিবন্ধে মন্দির নির্মাণ শিল্প ও শিল্পীদের লুপ্তি সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই শিল্প কবে থেকে অবনতি ও ক্রমবিলুপ্তির পথে পা দিয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে এই প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও দু একটি মন্দির নির্মাণের নজির পাওয়া যায়। এই শিল্পটির অবলুপ্তির পিছনে একটি সাধারণ মতৈক্য আছে। কোম্পানির আমলে জমি সংক্রান্ত কিছু সংস্কারের ফলে, বিশেষতঃ পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্টের কৃপায়, "দেশীয় ভূস্বামী শ্রেণীর একটা বৈপ্লবিক গোত্রান্তর" হয়।[১] এইসব কোম্পানি-অধিষ্ঠিত জমিদারদের সঙ্গে গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। ফলত এঁরা এক বর্ণসঙ্কর ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির বশবর্তী হয়ে পড়েন, এবং মন্দির স্থাপনের মতো সামাজিক ক্রিয়াকর্মের কর্ণধাররা একে একে বিদায় নেবার পর, এঁরা পৃষ্ঠপোষকতার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।[২] কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার পর, বাংলার সামাজিক জীবনের বিবর্তনের মূলে পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্টের ভূমিকা সম্বন্ধে মতান্তরের যথেষ্ট অবকাশ দেখা দিয়েছে। তাই মন্দির-শিল্পের অধোগতির সঙ্গে এর কার্যকারণ সম্পর্কে বোধ হয় খুব স্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে মনে হয় বাংলায় কোম্পানির আমলের প্রথম দিকটা মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল। এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মন্দির নির্মাণ শিল্পের একটা সমান্তরাল অবনতি হয়। অতএব শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকতার অপসারণ নয়, মন্দির শিল্পের অবনতির যথার্থ কারণ খুঁজতে গেলে, গোটা ঔপনিবেশিক সংক্রমণটাকে নানা দিক থেকে দেখা উচিত।

মন্দির নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অনেক মন্দিরের লিপিফলক থেকে জানা যায় যে গ্রামীণ বণিক সম্প্রদায় ও অনেক ধনী নাগরিক সামাজিক প্রতিপত্তির জন্যে মন্দিরের সেবায়েৎ হতেন।[৩] ১৯ শতকের গোড়ায় অনেক বৃহৎ জমিদারীর সুদিন শেষ হয়ে এলেও মন্দির তৈরীর কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় নি, বরঞ্চ তার ক্রমাবনতির ইতিহাস সারা শতাব্দী ধরে ছড়িয়ে আছে। এই অবনতি শুধু মন্দিরের সংখ্যায় বা আয়তনে নয়, পোড়া মাটির ফলকের কারুকার্যের মানেরও অবনতি। ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকেই দেখা যায় অনেক জায়গায় মৃন্ময় প্রতিকৃতির পুরাতন সজীবতা বা সাবলীলতা লোপ পেয়েছে। পোড়া মাটির শিল্প বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচায়ক : মধ্যযুগে পোর্তুগীজ বা ওলন্দাজ জাহাজ, ক্রীতদাস রপ্তানি, ইয়রোপীয় পল্টনের কুচকাওয়াজ, সমস্তই মন্দির পাদদেশ চিত্রিত হয়েছে। এর থেকেও মন্দির শিল্পের অধঃপতন সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন ওই বিষয়বস্তু থেকে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথমত, কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রথম পর্বের বণিক ও ব্যবসায়ীদের পর, নতুন শাসক সম্প্রদায়ের কোন প্রতিকৃতি পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, ভারতে ব্যাপকভাবে রেল ব্যবস্থা চালু হওয়া সত্ত্বেও তার কোন প্রতিফলন পোড়ামাটিতে দেখা যায় না, যদিও তৎকালীন কাঁথা শিল্পে, বা বালুচরী শাড়িতে রেলগাড়ি এক নতুন বিষয়বস্তু ছিল। ১৯ শতকের শেষের দিকের মন্দিরগুলিতে অবশ্য পোড়া মাটির কাজ ক্রমেই সংকুচিত হয়েছে, অনেক জায়গায় মন্দিরভিত্তির লৌকিক চিত্রপটগুলি অন্তর্হিত। তাই মনে হয় মন্দির ভাস্কর্যের এই ক্রমাবনতির পেছনে অন্তর্নিহিত আছে শিল্পীগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়।

মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণের জন্যে বাংলার সূত্রধর সম্প্রদায় ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন। এঁদের শিল্পের মাধ্যম চার ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা, কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র।

ঐহিক জীবনের প্রয়োজনীয় গরুর গাড়ী থেকে আরম্ভ করে বাংলায়

চালা কুটিরের নির্মাণ তাঁদের হাতে ছিল, তার সঙ্গে মন্দির বা রথের উচ্চ রুচিসম্পন্ন কারিগরির উদ্ভাবনও তাঁরাই করেছিলেন। এই সূত্রধর সম্প্রদায় এক সময় মেদিনীপুরে, বর্ধমানে ও হাওড়ায় জনসমাজের বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিলেন। অঞ্চল ভেদে বা বৃত্তির তারতম্যে তাঁরা বিভিন্ন 'থাক্' বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—যেমন মেদিনীপুরে বাগড়ি অঞ্চলে ঃ বর্ধমান থাক, মান্দারণ থাক, খড়িপেত্যা থাক ও ভাস্কর থাক ; বর্ধমানে ঃ কাষ্ঠকার, ভাস্কর, চিত্রকর ও মৃত্তিকার। পেশাগত তারতম্য থাকলেও, সামগ্রিকভাবে এঁরা যে যথেষ্ঠ বর্ধিষ্ণু ও সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন তা অনস্বীকার্য। মন্দির গাত্রের লিপি থেকে জানা যায় যে আট থেকে বারোজন সুদক্ষ সূত্রধর শিল্পী মন্দির স্থাপনে অংশগ্রহণ করতেন ও যথেষ্ট উপার্জন করতেন।[৫] অনেক বিখ্যাত সূত্রধর শিল্পীরা পেশাদারী ও ভ্রাম্যমাণ ছিলেন—যেমন মেদিনীপুরের ঠাকুরদাস শীল।[৬] এঁদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের প্রচ্ছদপট আঁকতেন। বিষ্ণুপুরের সূত্রধরদের মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে দশাবতার তাস তৈরী করতেন ও তার জন্যে রাজবাড়ী থেকে 'ফৌজদার' উপাধি অর্জন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে সূত্রধরদের স্বাভাবিক সচ্ছলতা কমে যায় ও তাঁদের পেশাগত সঙ্কট দেখা দেয়। রথযাত্রার ধূমধাম কমে আসে ; বটতলার ছাপা বই ও ছাপাখানার ক্রমবিকাশ। হাতে আঁকা প্রচ্ছদকে অবান্তর করে তোলে। মন্দির স্থাপনের সংখ্যা ও আয়তন হ্রাস পায়। এর ফলে সূত্রধরদের সামাজিক অবনমন হয়, সূত্রধর হয়ে যান হীনবংশ 'ছুতার'। সূত্রধররা নিজেদের বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ[৭] বলে পরিচয় দিতেন, আর ১৮৯১ সালে ডাল্টন ছুতারদের "Semi-clean Castes" বলে অভিহিত করছেন। এই প্রক্রিয়ার পেছনে শহরের, বিশেষত কলকাতার একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে বলে মনে হয়।

অর্থনৈতিক দুর্বিপাকে অন্ন সংস্থানের আশায় প্রচুর সংখ্যাক সূত্রধর এক সময় কলকাতায় চলে আসেন। মন্দির শিল্পের অবনতির অব্যবহিত আগেই এই অভিপ্রয়াণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে হয়। কলকাতার গোড়াপত্তন ও গৃহ নির্মাণ শিল্পে যে স্বদেশজাত দক্ষতা ব্যবহৃত হয়েছিল তাতে সূত্রধর ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের অবদান আজ অস্বীকৃত হলেও নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য। কিছু বৃত্তিমূলক নামের মধ্যেও সূত্রধরদের প্রাচীন পরিচয় লুকিয়ে আছে যেমন 'রাজমিস্ত্রী' বা 'ঘরামি'।

কলকাতা শহরে এদের উপস্থিতির প্রথম আভাস পাওয়া যায় পলাশীর যুদ্ধের সময়, ফোর্ট উইলিয়মের পুনর্নির্মাণের কাজে কোম্পানির কর্মকর্তাদের রিপোর্টে।[৮] এ সময় ফোর্টের ভিতর নতুন বুরুজ তৈরী হয়, এবং দক্ষ-শ্রমিক ও রাজমিস্ত্রীদের চাহিদা দেখা দেয়। এই অভাবের কথা জানিয়ে তত্ত্বাবধানকারী ক্যাপ্টেন বার্কার (Surveyer of works) কলকাতা কাউন্সিলে চিঠি লেখেন ; তাতে জনৈক প্রধান মিস্ত্রীর কথা বলা হয়েছে যিনি ১০০ জন রাজ-মিস্ত্রীকে আশেপাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন। এঁদের অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে একই পারিশ্রমিকে কাজ করানো হয়। এঁরা যে কোম্পানির পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ ছিলেন তা বার্কারের চিঠি থেকে বোঝা যায়। " . at the Expiration of the month the Mestry himself went for his pay but was Denied the result of which thus will be the Mestry will go off and his 'People of Consequence' will follow. so that from not having a number near sufficient we shall have still less". ওই চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে স্থানীয় কোন ধনী গৃহস্থের বাড়িতে তিনি এই ধরনের দক্ষ রাজমিস্ত্রীদের কাজ করতে দেখেছিলেন। "......Counting more Bricklayers on his Veranda than we had at work on the Bastion,.. the Buxey who had such Authority made very little use of it, in not being able to collect Bricklayers, for so material a work when private Gentlemen can fit up their Houses with such case". এই ধরণের ' People of Consequence" যাঁদের অন্য জায়গায় "Masters of chunam"[৯] বলা হয়েছে, সম্ভবত সূত্রধররা, যাঁরা কোম্পানির কাজে বড একটা আগ্রহী ছিলেন না। তার কারণ বোধ হয় স্থানীয় গৃহ নির্মাণের জন্যে বেশী পারিশ্রমিক পেতেন। এরপর ১৭৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিয়মের কাজ শুরু হওয়ার পরে আবার শ্রমিক-সমস্যা দেখা দেয়। ১৭৬২ সালে গভর্মেণ্ট থেকে কলকাতা অঞ্চলের সমস্ত রাজমিস্ত্রীকে বলপূর্বক দখল করবার আদেশ আসে ; কিন্তু তাও পরবর্তী চার বছরের মধ্যে কোম্পানি নিয়োজিত ১০০০ জন মিস্ত্রীর মধ্যে ২৩ জন ছাড়া অন্যান্য সবাই কাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়[১০]। কোম্পানির এঞ্জিনিয়র ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়র (Capt. Brohier) কাউন্সিলে প্রেরিত পত্রে লেখেন "Seduced by private persons who gave greater wares". ১৭৭০ সালে প্রায় ১০০০ জন মিস্ত্রীকে রেজিস্ট্রি-ভুক্ত করে কোম্পানির ধার্য মাইনেতে কাজ করানো হয়। এঁদের মধ্যে কতজন সূত্রধর শিল্পী ছিলেন তা জানা যায় না।

ফোর্ট উইলিয়মের এই ইতিহাস বোধ হয় আরেক বৃহত্তর প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস; তা হল কলকাতা শহরের আয়তনগত বৃদ্ধি। ১৮০৬ সাল থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে কলকাতার পাকাবাড়ির সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে শতকরা ৩৩৬ ভাগ বেড়ে যায়[১১]। ওই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুগত ও প্রসাদধন্য শেঠ, মল্লিক, দে, বসাক, ঠাকুর ও ঘোষরা তাঁদের কলকাতার বাসাগুলিকে পাকা বসতবাড়িতে পরিণত করেন। কালা শহরে বা ব্ল্যাক টাউনে তাঁদের গ্রীসিয়-ইতালীয় রীতিতে গঠিত দো-আঁশলা বাড়িগুলির স্থাপত্যে বহু সূত্রধরের অবদান ছিল, যা আজও মুষ্টিমেয় কিছু পুরাতন বাড়ির ভঙ্গুর দেয়ালে বা কার্ণিশের ধারে পঙ্খের (stucco) কাজ থেকে বোঝা যায়।

১৮০৬ সালে ইণ্টালীর কাছে, চাঁপাতলায় ও ছুতারপাড়ায় কমপক্ষে ৬৬ ঘর ছুতোরের বাস ছিল[১২]। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বিখ্যাত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনা করতে গিয়ে ছুতারদের কথা লিখেছেন। শেরুড (Sherwood) কোম্পানির গুরুদাস গুঁই চাঁপাতলায় থাকতেন ও মৌ-মিস্ত্রির হিসেবে তাঁর মাসিক আয় ছিল ৩০ টাকা। এও জানতে পারি যে ম্যাকিণ্টশ, বার্ণ কোম্পানি (১৮৩৭ সালে স্থাপিত) পৌর-নির্মাণের কাজে অথবা গৃহ-নির্মাণের কাজে অনেক হিন্দু ছুতারকে ইয়ার্ডে নিয়োজিত করেছিল। ১৯ শতকের শেষার্ধে ছুতারদের দৈন্য আরও প্রকট হয়ে পড়ে—কলকাতার বিরাট মজুরির বাজারে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক কাঠের মিস্ত্রী ও বিহারের রাজমিস্ত্রীরা ভীড় করে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৮২% কাঠের মিস্ত্রির মুসলমান ছিলেন[১৩]। শহরের বৃদ্ধির ফলে ক্রমে শহরবাসী ছুতারদের সূত্রধর পরিচয় লোপ পায়। মন্দির নির্মাণ শিল্পের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, ব্যবহারের অভাবে তাঁরা বিস্মৃত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত কিছু মন্দির থেকে বোঝা যায় যে একই শিল্পী শহরে ও গ্রামে কাজ করেছেন। এই ধরণের মন্দিরগুলিতে প্রথাগত স্বদেশীয় ধাঁচের ওপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও বিদেশীভাব আরোপিত হয়েছে। অনেক জমিদার বাড়ির সংলগ্ন সমতল চালের মন্দির তৎকালীন Neo classical রীতিতে বানানো যেমন বরানগরে। হেতমপুরের চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরে দোলমঞ্চটিতে Baroque ঢঙের শিখর দেখতে পাওয়া যায়। হুগলীর হরিপালে রাধা-

গোবিন্দের যে চালাকৃতি মন্দির আছে তা আনুমানিক ১৬০৪ সালে প্রস্তুত, কিন্তু ১৯১০-২০ সালে সংস্কারার্থে তাতে দ্বার সংলগ্ন একটি গ্রীসিয় থামযুক্ত বারান্দা জোড়া হয়েছে[১৪]। নিশ্চয় শহরবাসী সূত্রধরদের বংশধরেরা এইসব মন্দিরে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বার্ণ কোম্পানি যখন বেলুড় মঠ তৈরী করেন তখন স্থাপত্যের কাজে ছুতারদের ব্যবহার করা হয়েছিল কি? পরিশেষে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে মন্দির শিল্প বিশেষতঃ পোড়া মাটির মন্দির শিল্প নির্বাপিত হল দুটি প্রধান কারণে। একটি হল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের কিছু অবদান অন্যতম পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট, যার সামাজিক উৎক্ষেপের ফলে জমিদারী পৃষ্ঠপোষকতার একটা অবধারিত সঙ্কোচন দেখা দেয়। অন্যটি হল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার প্রসার ও সমৃদ্ধি। তার সঙ্গে নানা আকৃতি ও প্রকৃতির বাসস্থান নির্মাণের চাহিদা। সূত্রধর সম্পর্কিত কোন নৃবিদ্যা বা সমাজবিদ্যাশ্রয়ী গবেষণা করা হয় নি, কিন্তু এই গ্রামীণ শিল্পী-গোষ্ঠীর উপর শহরের প্রভাব, তাদের সামাজিক দৈন্য ও গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণের (Migration) ধারা নিঃসন্দেহে গবেষণার উপযুক্ত বিষয়বস্তু। গ্রাম বাংলায় হাওড়ার থলিয়া-ঝিখিরা[১৫] অঞ্চলে বা মেদিনীপুরের দাসপুরে এখনো যে কয় ঘর ছুতারের বাস আছে তাঁরাও এই প্রক্রিয়ার ফলে পিতৃ-পুরুষ লব্ধ সহজাত শিল্পবোধ ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলেছেন বা ফেলবেন। আর মন্দির বানাতে পারেন এমন সুদক্ষ সূত্রধর বোধ হয় তার অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

## সূত্রনির্দেশ

১। বিনয় ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৯৫৭।

২। এই মত পোষণ করেছেন বিনয় ঘোষ এবং সুধাংশুকুমার রায় ( অশোক মিত্র সম্পাদিত The Tribes and Castes of West Bengal, Census 1951 )

৩। হিতেশরঞ্জন সান্যাল: Social Aspects of Temple Building in Bengal, Man in India 48:3 1969.

৪। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন: The Impact of the Europeans on Temple Art and Architecture in Bengal, Quest, No. 54, 1967.

৫। বলরামপুরের সীতারামের মন্দিরের একটি মৃণ্ময় লিপিফলক থেকে জানা যায়: "শ্রীশ্রীসীতারাম চন্দ্র জিউ, শুন সর্বজন করি নিবেদন, মন্দির নির্মাণ কথা··· মিস্ত্রির সঙ্গে আটজন করিলে গঠন···"—তারাপদ সাঁতরা, : David McCutchion : Brick Temples of Bengal, edited by George Michell 1983.

৬। তারাপদ সাঁতরা : "মেদিনীপুরের একজন মন্দির স্থপতি" : চতুষ্কোণ, আশ্বিন, ১৩৭৭।

৭। Risley : Tribes and Castes of Bengal, Vol II.

৮। Extract from Bengal Public Consultations, Fort William 1757 ; Old Fort William in Bengal Vol II, edited by C. R. Wilson.

৯। Proceeding of the Committee of Fortifications laid before the Board : ঐ।

১০। H. E. C. Cotton : Calcutta Old. and New.

১১। A. K. Roy : A Short History of Calcutta—Census of India 1901.

১২। সৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জী : Calcutta Myth and History.

১৩। H. E. C. Cotton দ্রষ্টব্য।

১৪। ডেভিড ম্যাকাচিয়ন : "Impact of the Europeans on the Temple Art and Architecture in Bengal".

১৫। হিতেশরঞ্জন সান্যাল : "A group of Traditional Sutradhars in Bengal" : Art in Industry, Vol III, No. 4, 1967.

# বেঙ্গল প্যাক্ট ও বাঙালী মুসলমান

## চণ্ডীপ্রসাদ সরকার

বাঙ্গালী মুসলমানদের পশ্চাদমুখীনতার পটভূমিকায় এই শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার ক্রমবিকাশ লক্ষনীয়। বলা যেতে পারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা তাঁদের এই সচেতনতার বিকাশে সাহায্য করেছিল। প্রথমত, ১৯১১ সালে ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা; দ্বিতীয়ত, খিলাফৎ সংক্রান্ত মুসলিম অভিযোগের সুরাহা ব্যতিরেকেই ১৯২২ এর ফেব্রুয়ারীতে অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক প্রত্যাহার; তৃতীয়ত, ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে তুরস্কের পার্লামেণ্ট ফতে বের ঘোষণার পর খিলাফৎ আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তি ; সবশেষে ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক কনফারেন্সে বিপুল ভোটে বেঙ্গল প্যাক্টকে কার্যতঃ বাতিল করার প্রস্তাব গ্রহণ। চারটি ঘটনার প্রত্যেকটি মুসলমান সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। বৃটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি সদাশয়—বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণায় তাঁদের সে মোহ ভাঙতে শুরু করেছিল। স্বরাজ ও খিলাফৎ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার, গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থাহীন করে তুলেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তিতে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্রমবর্ধমান আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ইসলামিয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা এক অলীক কল্পনা। আর বেঙ্গল প্যাক্টের এক-তরফা অবসানে মুসলমানদের অভাব অভিযোগ দূর করার ব্যাপারে হিন্দুপ্রধান স্বরাজ্য তথা কংগ্রেসদলের আন্তরিকতায় তাঁদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল। বলা যেতে পারে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বাঙ্গালী মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সূত্রপাত হয়েছিল এই ঘটনা থেকেই।

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের একটা বেশ বড় অংশ কেন বেঙ্গল প্যাক্টে উৎসাহী হয়েছিলেন, ঐ প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা বাঙালী মুসলমানেরা

কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ প্যাক্ট কার্যতঃ বাতিল হবে তাঁদের মধ্যে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হয়েছে।

১

অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে সারা দেশ জুড়ে গো-কোরবানি ও মসজিদের সামনে বাদ্যগীতকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়। একদিকে আর্য সমাজীদের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন অপর দিকে গোঁড়া মুসলিমদের 'তবলীগ' ও 'তাঞ্জিম' আন্দোলন সারা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির করালগ্রাসে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির আশংকা একশ্রেণীর বাঙালী মুসলমানদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে।

"আমরা হিন্দু-মোসলমানের মিলনের বিরোধি নহি বরং উহার খুবই পক্ষপাতী কিন্তু সে মিলনের অর্থ যদি এই হয় যে, মোসলমান তাহার ধর্মকর্ম পরিহার করিয়া হিন্দুর সহিত মিলিত হইতে হইবে, তাহা হইলে সে মিলনকে আমরা দূর হইতে বিদায় দিতেছি" (ইসলাম দর্শন, ১৩২৮, শ্রাবণ, পৃঃ ১২২) মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার কথা মনে রেখেই আমাদের নীতি নির্ধারণ করা উচিত—এখন হিন্দুদের চেয়ে ইংরেজদের বন্ধুত্বই আমাদের কাম্য[১] —এই ধরণের চিন্তা ভাবনা অনেকের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। অবশ্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের সংযতশীল অংশ তখনও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উপর, পারস্পরিক সহনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। বাঙালী মুসলমান সম্পাদিত একমাত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি মুসলমানে' এই ধরণের মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে লেখা হয়—'It is to be borne in mind that Hindus will remain Hindus and the Musalmans still remain Musalmans, each community maintaining its individuality and distinctiveness and that unity which is sought for, is unity in diversity.'

ঐ পত্রিকায় আরও লেখা হল 'Indian unity to be real and lasting must be based on mutual toleration and love.'[২]

অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী খিলাফৎ নেতারা সরকারী স্কুল কলেজগুলিকে 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়ে ঐগুলি পরিত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩] এখন কেউ কেউ মনে করলেন ঐ নির্দেশের ফলে

বাঙালী মুসলমানেরা শিক্ষার ব্যাপারে আরও বেশী পিছিয়ে পড়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয়েছিল বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের স্বার্থে শিক্ষিত মুসলমানদের উচিত কাউন্সিলে প্রবেশ করে একদিকে মুসলমানদের শিক্ষার জন্যে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া অপরদিকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে শিক্ষিত বেকার মুসলমান যুবকদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের আরও বেশী সুযোগ সৃষ্টি করা। কেবলমাত্র শিক্ষিত মুসলমানরা নয়, গ্রাম বাংলার বর্ধিষ্ণু কৃষকেরা বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ১৯১১-এর শাসন সংস্কারের আইনের বলে ভোটাধিকার লাভ করেছিলেন তাঁরাও কাউন্সিলে তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণের কথা ভাবতে শুরু করেন। কারণ তাঁরা আশংকা করেছিলেন পরবর্তী কাউন্সিলে বর্গাদারদের স্বার্থে বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট সংশোধিত হতে পারে।[৪]

কিন্তু ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ্যদল গঠন করে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জনের জন্য কাউন্সিলে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ডায়ার্কি (Dyarchy)কে ব্যর্থ করতে চেয়েছিলেন। ঐ পরিস্থিতিতে শিক্ষা, সরকারী চাকরী, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয়ে বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে—এই আশংকা স্বাভাবিক কারণেই বাঙালী মুসলমান নেতাদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত ১৯১৬-র লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান স্বার্থ রক্ষিত হলেও বাংলা দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। তাছাড়া লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট যখন সম্পাদিত হয়েছিল সে সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভের সম্ভাবনাও অস্পষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে নিকট ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, বাঙ্গালী মুসলমান নেতারা লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের ভুল ভ্রান্তি নিরসন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁরা একথাও বুঝেছিলেন বাঙালী হিন্দু নেতাদের সংযতশীল অংশের সঙ্গে বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বোঝাপড়ায় আসতে না পারলে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা খুবই দুরূহ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, ডায়ার্কিকে বানচাল করতে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের সহযোগিতা কামনা করলে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংযতশীল অংশ নিজ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার বিষয়ে স্বরাজ্যদল তথা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের

কাছে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন।[৫] অবশ্য অর্থনৈতিক অধিকার বলতে তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অংশের কথাই ভেবেছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই তাঁরা সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর তাঁদের নেতৃত্ব বজায় রাখার কথা ভেবেছিলেন।

২

১৯২৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়-দের যৌথ সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৌলভী আবদুল করিম এই উদ্দেশ্যে একটা খসড়া দলিল উপস্থিত করেন এবং সামান্য কিছু রদবদলের পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ দলিলই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৮ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস ঐ দলিল সমর্থন করে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৬] ঐ প্যাক্ট অনুসারে স্থির হয়, বাংলা কাউন্সিলের সদস্যরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। বিভিন্ন স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হবে শতকরা ৬০ ভাগ আর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হবে শতকরা ৪০ ভাগ। সমস্ত সরকারী চাকুরীর প্রতিটি বিভাগ চাকুরীর শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানেরা লাভ করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত চাকুরীতে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী পদে শতকরা ৮০ ভাগ করে মুসলমান নিয়োগ করা হবে। কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে কাউন্সিল প্রস্তাব গ্রহণ কালে ঐ সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে। এছাড়া, গো-কোরবানি এবং মসজিদের সামনে বাদ্যগীত নিষিদ্ধ করা হবে বলেও স্থির করা হয়।[৭]

বলা বাহুল্য, ঐ প্যাক্ট বাঙ্গালী মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছিল। প্যাক্টের সমর্থনে 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদকীতে লেখা হয়েছিল, 'The Musalman as a community must be made to understand that Swaraj does not mean the predominance of any any one Indian community are another, but that it means freedom for all. Only a pact could make them so understand."[৮]
বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন, এমনকি উলেমাদের দুটি সংগঠন—জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই-বাংলা এবং আঞ্জুমান-ই-ওয়াজিন-ই-বাংলা ঐ প্যাক্টকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[৯]

শেষোক্ত উলেমা সংগঠনের মুখপত্র "ইসলাম দর্শন"-এর একটি প্রবন্ধে এই

সময়ে বলা হয়েছিল "আমরা কপট মিলনের বিরোধী···বর্তমানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে কঠিন সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সমাধান করিয়া উভয় জাতির প্রকৃত মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিকেই অকপট ও উদার ভিত্তির উপর ভর করিয়া জাতীয় মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। যে পিছে পড়িয়াছে, তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার মত উদারতা প্রকাশ করা যদি একান্তভাবে সম্ভবপর না হয়, তবে সে উঠিতে চাহিলে তাহাকে পথরোধ না করিয়া উহা ছাড়িয়া দেবার মত ত্যাগ স্বীকার একান্তই আবশ্যক"।[১০] ময়মনসিং জেলায় রায়তদের বেশ বড় একটা জমায়েত থেকেও ঐ প্যাক্টকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।[১১] বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হওয়ায় সে সম্ভাবনা দূর হয়েছিল।

কিন্তু অসহযোগী কংগ্রেস নেতা সহ বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু নেতারা ঐ প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। সমালোচনার মূল বক্তব্য ছিল—মুসলমানদের অহেতুক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা ঐ সুবিধা লাভের আদৌ যোগ্য নয়, মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে, সম্প্রদায় ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হলে সরকারী কাজকর্মে দক্ষতা হ্রাস পাবে ইত্যাদি।[১২] 'দি মুসলমান' ও অন্যান্য মুসলিম পত্র-পত্রিকায় ঐ সব সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছিল। আবদুল মতিন চৌধুরীর এক পত্র ঐ সময়ে 'দি মুসলমান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল; তিনি লিখেছিলেন যে বেশ কিছুকাল ধরেই বাঙ্গালী মুসলমানেরা লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের অন্যায় অসম সিদ্ধান্তে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন যে স্বরাজ্যদল বাঙ্গালী মুসলমানদের অহেতুক কোন সুবিধা দেননি। মুসলমানেরা এতকাল যে অন্যায় ক্ষতি স্বীকার করে এসেছিলেন স্বরাজ দল তার প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাত্র।[১৩] প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে সরকারী চাকুরীতে মুসলমান নিয়োগের ফলে সরকারী কাজকর্মের দক্ষতা হ্রাস পাবে—এই অভিযোগ নিরসন করে মৌলভী আবদুল করিম বলেছিলেন যে শিক্ষা কেবল ইংরেজি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তাঁর মতে 'If education means acquisition of knowledge, intellectual power and moral stamina, it can be achieved through the medium of any well-developed

language [১৪]। তা ছাড়া তিনি মনে করেন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষা প্রার্থীর পারিবারিক ঐতিহ্য, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, স্বাস্থ্য ও মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হলে সরকারী কাজকর্মে দক্ষতা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পাবে।[১৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মৌলভী আবদুল করিম সরকারী A.D.P.I পদে বেশ কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন।

'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি পত্রে বলা হয়েছিল, যতই ভারতীয়করণ করা হবে ততই সরকারী চাকুরীতে সম্প্রদায়গত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই ঐ ভারসাম্য যথেষ্ট পরিমাণে বাঙ্গালী হিন্দুদের দিকে ঝুঁকে রয়েছে কারণ হিন্দুরা নিজেদের আত্মীয় স্বজন এবং স্বজাতি বন্ধুবান্ধবদের জন্যই সরকারী চাকুরী সংরক্ষিত করে রেখেছেন।[১৬] এই পত্রে দাবী করা হয় যে, স্বায়ত্ব শাসনের সুষম বিকাশের স্বার্থে কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা সরকারী চাকুরী যেন পূর্ণ না করা হয়।[১৭]

'ন্যাশানালিস্ট ও 'নো চেঞ্জার' কংগ্রেসী নেতারা মুসলিম সংখ্যাধিক্য জেলায় লোকাল বোর্ডে শতকরা ৬০ জন মুসলমান নিয়োগের সম্ভাবনায় সমালোচনা মুখর হয়ে উঠলে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় পকাশিত আর একটি পত্রে তীব্র বিদ্রূপ করে বলা হয় : "Hindu hegemony must not be disturbed. Muslim pariah must always and everywhere remain content with sub ordinate position as hewers of wood and drawers of water only. Their services were required only to fill the Indian jails where inefficiency was no bar to the entrance. However local bodies and legislatures must be reserved for the Hindu 'efficients'only[১৮] 'দি মুসলমান পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে "If the much-talked of Indianisation of services meant merely the change of hands from foreign bureaucr ats to native ones, namely the Hindus, then good-bye to our Swaraj"[১৯]

হিন্দুদের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান অনেকেই স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বা ঐ আন্দোলনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলা কাউন্সিলের ৩৯ জন মুসলিম সদস্যদের মধ্যে অন্তত ২১ জন Dyarchy-কে অচল করতে স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। ১৯২৩-এর মার্চে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে একত্রে সরকারী ফিনান্স বিল প্রত্যাখান

করেছিলেন[২০] : ফজলুল হক প্রমুখ বাঙ্গালী মুসলমান মন্ত্রীরা ইসলামের স্বার্থ রক্ষার এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন বলে প্রচার চালাচ্ছিলেন। সেই প্রচারকে বাঙালী মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা, নিছক প্রতারণা মাত্র বলে তাঁরা নিন্দা করেছিলেন।[২১]

কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান নেতাদের সকলেই বেঙ্গল প্যাক্টের সমর্থক ছিলেন না। কারণ তাঁরা স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ বেঙ্গল প্যাক্টের যে সব ধারা মুসলমান স্বার্থানুকূল ছিল সেগুলির আশু কার্যকরী করানোয় যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন Dyarchy-র দৃঢ় সমর্থক ফজলুল হক এবং তাঁর অনুগামীরা। তাছাড়া ছিলেন আবদুল করিম গজনভী, নবাবালী চৌধুরী, খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ অনুরাগীরা। আর ছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেবের মতো বিশিষ্ট গোঁড়া উলেমারা। এঁদের শলা-মরামর্শে এবং কিছু ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের উস্কানীতে একজন সরকার ঘেঁষা মুসলমান সদস্য মুসারফ হোসেন, কাউন্সিলে সরকারী চাকরীতে মুসলমানদের সংখ্যা যত দিন না পর্যন্ত শতকরা ৫৫ ভাগ পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়োগের প্রস্তাব করলে[২২] স্বরাজ্য দল কাউন্সিলের ভিতরে-বাইরে বেশ কায়দায় পড়েন। বেঙ্গল প্যাক্টের মুখবন্ধে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ প্যাক্টকে কার্যকরী করা হবে বলে বলা হয়েছিল।[২৩] চিত্তরঞ্জন দাশ মুসারফ হোসেনের প্রস্তাবের উপর আলোচনা মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করেছিলেন এক বাঙ্গালী জনসাধারণকে ঐ প্যাক্টের যৌক্তিকতা বোঝাবার জন্যে সময় চেয়েছিলেন কারণ তাঁর মতে স্বরাজ্য দল ঐ প্যাক্ট রূপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তখনও পর্যন্ত প্যাক্ট ছিল 'merely a suggestion which might be adopted'.[২৪]

চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব কাউন্সিলে শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলেও মুসারফ হোসেনদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। স্বরাজ্য দলের আন্তরিকতা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কাউন্সিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মুসলিম সদস্য শা সৈয়দ ইমদাদুল হক স্পষ্টই বুঝেছিলেন। তাঁর মতে চিত্তরঞ্জন দাশ আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করলেই ভাল করতেন কারণ মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের প্রশ্নটি কোনভাবেই স্বরাজ লাভের লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে না।[২৫]

এ সময়ে স্বরাজ্য দল ও চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের বিষ ছড়াতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা। ঐ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বেঙ্গল প্যাক্টকে বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বরাজ্য-আন্দোলনে আকর্ষণ করার এক 'চমৎকার প্রলোভন ফাঁদ'[২৬] বলে বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ 'মিঃ দাশ যখন স্বীকার করেন যে মুসলমানেরা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে তখন তাহারা সেই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য পাইবার পূর্বে পাইবে না কেন? স্বরাজ যদি আরও শত বৎসরে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মুসলমানেরা ততদিন তাহাদের দাবী দাওয়া হইতে বঞ্চিত থাকিবে কোন যুক্তি বলে?'[২৭]

কাউন্সিলে চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতা মুসলিম মানসে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের প্রশ্নে স্বরাজ্যদলের দ্বিধা দোদুল্যমানতা এবং উদ্যোগের অভাব বাঙ্গালী মুসলমানদের বেশ হতাশ করেছিল। তাঁরা ক্ষীণভাবে হলেও তখনও আশা করেছিলেন যে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে স্বরাজ্য দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হলে বেঙ্গল প্যাক্টকে অন্তত কার্যকরী করা হবে। মুসলিম মানসের এই হতাশা সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণে মৌলানা আক্রাম খাঁ ব্যক্ত করে বলেছিলেনঃ 'আমাদের সর্বপ্রকার সহিষ্ণুতা, সর্বপ্রকার উদারতা ও বৃহৎ হৃদয়বত্তা কংগ্রেসে এক কনফারেন্সের বক্তৃতাতেই শেষ হয়ে যায়।'[২৮] এই ক্ষোভ ও হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ একই সময়ে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা মোসলেম কনফারেন্সে বিশিষ্ট অসহযোগী ও খিলাফৎ নেতা সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্বরাজ আন্দোলনের পরিবর্তে 'স্বজাতি' আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানে আহ্বান[২৯] করেছিলেন।

'দি মুসলমান' পত্রিকায় এখন আরও স্পষ্ট করে লেখা হলঃ 'Muslims must be convinced that Swaraj which they are called to strive for, is for them too and their present. position of object humiliation will not be perpetuated. But the present activities of the Hindus could not inspire any confidence in the minds of the Mussalmans that under the Swaraj government, the Mussalmans as equals would enjoy its blessings'.[৩০]

ইতিমধ্যে স্বরাজ্য দলে এককালের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'কর্মী' বলে পরিচিত ঐ বিপ্লবীরা কট্টর মুসলমান বিরোধী ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশাতেই এঁদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের বক্তৃতায় তীব্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।[৩১] পরিস্থিতির এই পরিবর্তন বাঙ্গালী মুসলমানদের সংযতশীল অংশকে শঙ্কিত করে তুলে ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা স্বরাজ্য দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বরাজ্য দলের গ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচী মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রজা কনফারেন্স সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন[৩২]। মুসলিম যুবকদের স্বরাজ্য আন্দোলনে সামিল করার উদ্দেশ্যে হুসেন শহীদ সুরাবর্দী ইয়ং মেন মুসলিম এসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হন।[৩৩] শুধু তাই নয় ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলে বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট বিল উত্থাপন করা হলে তা শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলে গৃহীত হতে পারেনি কারণ বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান সদস্য ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ সত্ত্বেও ঐ বিল সমর্থন করেন নি।[৩৪] এমন কি ১৯২৫-এর মার্চ মাসে বেশীর ভাগ মুসলমান সদস্যই তৃতীয় বারের মত Salary Bill প্রত্যাখ্যানে স্বরাজীদের সঙ্গে একত্রে ভোট দিয়েছিলেন।[৩৫]

কিন্তু ক্রমেই বাঙালী মুসলমানেরা উপলব্ধি করলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জমিসংক্রান্ত অসাম্য, শিক্ষা, চাকরী, সম্মানজনক বৃত্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগের তারতম্য এবং সবার উপরে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণাধিকারের তারতম্যের ফলেই বাঙালী মুসলমানেরা বাঙ্গালী হিন্দুদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়েছে। তাঁদের মধ্যে এখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে যতদিন মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা থাকবে ততদিন সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে একমাত্র পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দ্বারাই শক্তিশালী প্রতিবেশীর আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁদের আইনসংগত স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে। এই মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যায় এককালের মিশ্র নির্বাচক ব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে : 'The separate electorate is a necessary evil an evil to be allowed to continue as the two communities could not trust each other'[৩৬]

কিন্তু পৃথক নির্বাচনের বিরূপ সমালোচনায় জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারা

মুখর হয়ে উঠেছিলনে। তাঁদের সেই সমালোচনার কড়া জবাব দি মুসলমান পত্রিকায় দেওয়া হল : It is prepesterous to speak against communal representation when staunch Congressmen like Maulvi Tamizuddin Ahmed M. A. B. L, M. L.A of Jessore and Maulvi Ashrafuddin Ahmed Chaudhury B. A of Comilla could not be returned from mixed electorates as mere municipal commissioners···simply because they were Mussalmans'.[৩৭]

স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় দেশপ্রেমিক বাঙালী মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে 'rank communalism was no suitable substitute for nationalism nor synonymous with patriotism.'[৩৮] এই আক্রমণের জবাবে 'দি মুসলমানে' অত্যন্ত বিরক্তির সংগে লেখা হয় : এই প্রসংগে আরও লেখা হয় : 'We must say that we prefer rank communalism to pseudo communalism in the garb of nationalism which a very large section of our countrymen have been sedulously fostering.'[৩৯] এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় : Indian Mussalmans want to live as Mussalmans···They detest the idea of losing their identity and distinctiveness'.

বলা যেতে পারে যে শিক্ষিত মুসলমানদের আইনসংগত আকাঙ্ক্ষাকে যতদূর সম্ভব স্বীকৃতি দিয়ে বেঙ্গল প্যাক্ট বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির পরশপাথরের সন্ধান দিয়েছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানেরা এই প্রথম তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তাঁদের আশার ফানুষ বড় তাড়াতাড়ি নিভে গেল। হিন্দু প্রাধান্য পরিব্যাপ্ত কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক কনফারেন্সে বেঙ্গল প্যাক্টকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত যেন জ্বলন্ত অগ্নিশলাকার মত বাঙ্গালী মুসলমান হৃদয়কে বিদ্ধ করল। অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্তের পর পরই বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের একতরফা সিদ্ধান্ত বাঙ্গালী মুসলিম মানসে কঠিনতম আঘাত হানলো; যে আশার আলো বাঙালী মুসলমান সেদিন দেখেছিল প্যাক্ট বাতিলের সিদ্ধান্তে তা হতাশায় রূপান্তরিত হল। শুধু তাই নয় প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা সম্পর্কে তাঁদের আশংকা সন্দেহে পরিণত হল। সন্দেহ জন্ম দিল অবিশ্বাসের। আর অবিশ্বাস ক্রমেই অটল হল। যদিও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থে ছেঁড়া সুতোয় গিঁট মেরে কাজ চালানোর

চেষ্টা হয়তো আবার হয়েছে—কিন্তু ছিন্ন বীনার তারে সম্প্রীতির সুর বেজে উঠতে পারে না, বেজে উঠেও নি।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাই দেখা যায় যে ধর্মীয় বিরোধ নয়, শক্তিমান প্রতিবেশীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে ভীতিই ছিল মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্তর্নিহিত কারণ। সন্দেহ নেই যে ধর্মীয় বিরোধ এই পরিস্থিতিকে জটিলতর করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সেই ধর্মীয় বিরোধ সাম্প্রদায়িকতা-রূপ ক্যান্সারের কারণ নয় উপসর্গ মাত্র। গো-কোরবানি, মসজিদের সামনে বাদ্যগীত ইত্যাদির জিগীর তুলে মোল্লারা এই ভীতিকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করেছিল একথাও সত্য। কিন্তু মোল্লারা ঐ ভীতির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না তাঁরা জনমানসের বিমূঢ় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। বাঙালী হিন্দু নেতারা কিন্তু ওই বাস্তব সত্যকে সেদিন উপলব্ধি করতে পারেন নি।

সেদিন সেই কারণেই তারা ধর্মান্ধ মোল্লাদের জিগীর বা স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম রাজনীতিবিদদের মস্তিষ্কপ্রসূত কষ্ট-কল্পনা অথবা সরকারী উস্কানীর ফল ভেবে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দুনেতৃত্ব যার পুরোভাগে সেদিন ছিলেন স্বরাজ্য-কংগ্রেস দলের নেতারা, তাঁরা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভীতি ও আশংকার অন্তর্নিহিত কারণকে যথার্থ সহানুভূতির সংগে বিশ্লেষণের চেষ্টা করতেন এবং পারস্পরিক বোঝা-পড়ার সাহায্যে সেই ভীতি ও আশংকাকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করতে অগ্রসর হতেন তাহলে হয়ত ঘটনা পরম্পরায় ইতিহাসের স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত হত। বাস্তব পরিস্থিতির যথার্থ অনুধাবনে এই চরম অক্ষমতার মূল্য শেষ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল চরম হানাহানি, রক্তপাত এবং দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে।

## আকর নির্দেশিকা


১ দি প্রগ্রেস ( কলিকাতা ), ফেব্রু: ৬, ১৯২৩, বেঙ্গল নেটিভ প্রেস রিপোর্ট (১৯২৩)।

২ দি মুসলমান, ফেব্রু: ১৬, ১৯২৩ পৃ: ৪

৩ ঐ নভে: ৫. ১৯২০

৪ মোসলেম হিতৈষী, জুন ১৫, ১৯২৩-এ প্রকাশিত বেঙ্গল রায়ত সমিতির সম্পাদক খোস মহম্মদ চৌধুরীর বাংলার গভর্ণরের নিকট লেখা পত্র ; দি মুসলমান—এপ্রিল ৬, ১৭, ১৯২৩

৫ মৌলভী আব্দুল করিম, লেটার্স অন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট (কলি. ১৯২৪) পৃঃ ২৮

৬ এম. সেন—মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, নিউ দিল্লী ১৯৭৬, পৃঃ ৫২ পাদটীকা ৫৮

৭ মৌলভী আবদুল করিম : লেটার্স অন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট ( কলি, ১৯২৪) ; এ্যাপেনডিক্স-এ

৮ 'দি মুসলমান'—জানু ১১, ১৯২৫, পৃঃ ৪

৯ দি মুসলমান ফেব্রুঃ ২৯, ১৯২৪ পৃঃ ৩ ; ইসলাম দর্শন. আষাঢ় ১৩৩০ বি, এস,

১০ 'ইসলাম দর্শন' ফাল্গুন ১৩২৯, পৃঃ ২১৯

১১ সাপ্তাহিক মোহাম্মদী অগাষ্ট ২৪, ১৯২৩, বেঙ্গল নেটিভ প্রেস রিপোর্ট (১৯২৫)

১২ বেঙ্গল নেটিভ প্রেস রিপোর্ট ১৯২৪ ; দি মুসলমান, জানুঃ ১১, ১৯২৪ পৃঃ ৬

১৩ দি মুসলমান , জানুঃ ১১, ১৯২৪. পৃঃ ৬

১৪ মৌলবী আবদুল করিম : লেটার্স অন হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট— পৃঃ ৩১,

১৫ ঐ, পৃঃ ৪১

১৬ ঐ, পৃঃ ৪২

১৭ দি মুসলমান, জানুঃ ১১, ১৯২৪, পৃঃ ৬, আবদুল মতিন চৌধুরীর পত্র

১৮ ঐ জানুঃ ১৮, ১৯২৪ পৃঃ ৬

১৯ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিং, ১৭ সংখ্যা, ২য় ভাগ, ১৯২৫, পৃঃ ২৩, সৈয়দ সুলতান আলীর বক্তৃতা :

২০ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিং ; ১৪শ সংখ্যা, ৫ম ভাগ, মার্চ, ১৮, ১৯২৪

২১ দি মুসলমান, মার্চ ২৮, ১৯২৪. পৃঃ ৪

২২ কাউন্সিল প্রসিডিং ১৪ শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, ১৯২৪, পৃ; ৮৫

২৩ চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ প্যাক্টের মুখবন্ধ হতে নিম্নোক্ত অংশটি পাঠ করেন : It is resolved that in order to establish a real foundation of self govt. in this province, it is necessary to bring about a pact between the Hindus and Muhammadans of Bengal dealing with the right of each community

when the foundation of self-govt. is secured. কাউন্সিল প্রসিডিং, ১৪শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, ১৯২৪, পৃ ৮৫

২৪ ঐ, পৃঃ ৮৭

২৬ ঐ, পৃঃ ১০৬, শা সৈয়দ ইমাদাদুল হকের বর্ক্তৃতা

২৬ ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩০ পৃঃ ৪১১

২৭ ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ, ১৩৩০, পৃঃ ৪১৩

২৮ সভাপতির ভাষণ—দি মুসলমান, জুন ৬, ১৯২৪, পৃঃ ৪

২৯ ঐ শ্রাবণ ১৩৩১ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বক্তৃতা ;

৩০ দি মুসলমান জুন ২২, ১৯২৫, পৃঃ ৪

৩১ জি. বি. সিক্রেট হোম ( পল ) আই বি ফাইল নং ৪১/১৯২৫

৩২ জি. আই. হোম ( পল ) সিক্রেট ফাইল নং ১১২ (১৯২৫) জুনের প্রথমার্ধ ১৯২৫

৩৩ ঐ

৩৪ কাউন্সিল প্রসিডিং, ১৭শ সংখ্যা, ১ম ভাগ, জানুঃ ৭৫, ১৯২৫, পৃঃ ২৪০

৩৫ ঐ, ১৭শ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, মার্চ ২৩, ১৯২৫, পৃঃ ২৫ ২৭

৩৬ দি মুসলমান, ফেব্রু ১৪, ১৯২৫, পৃঃ ৪

৩৭ ঐ, নভেঃ ২৪, ১৯২৫, পৃঃ ৪

৩৮ ফরওয়ার্ড, ডিসেম্বর ১২, ৪৯২৫

৩৯ দি মুসলমান, ডিসেঃ ১৫, ১৯২৫ পৃঃ ৪

# আসাম চা-বাগানে শ্রমিক প্রতিরোধের ইতিহাস ঃ প্রথম পর্ব (১৮৩৯-৫৯)

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৯ সালে আসাম কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আসামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা শিল্পের পত্তন হয়। প্রথম কুড়ি বছর আসাম কোম্পানী ছিল চা শিল্পে নিযুক্ত সর্ববৃহৎ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান।[১] শুরু হতেই কোম্পানীর অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল কি উপায়ে কম মজুরীতে বেশী সংখ্যক শ্রমিক চা বাগানে নিয়োগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-মূলকভাবে চীন দেশ থেকে কিছু শ্রমিক আনা হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই চীনা শ্রমিকদের নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দিল। ওদের মজুরীর দাবীও ছিল অনেক বেশী। যেখানে স্থানীয় শ্রমিকদের মাসিক চার টাকা বেতন যথেষ্ট ছিল সেখানে চীনা শ্রমিকদের দিতে হত ষোল টাকা।[২] এই কারণে আসামে চা শিল্পের উদ্ভাবক সি এ ব্রুশ আসাম কোম্পানীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন চীনা শ্রমিকের পরিবর্তে স্থানীয় অসমীয়া শ্রমিক নিয়োগ করতে। তিনি এবং অন্যান্য চা বিশেষজ্ঞগণ মনে করতেন দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে স্থানীয় শ্রমিকদের[৩] যোগ্যতা চীনা শ্রমিকদের অপেক্ষা কম নয়।

কিন্তু খুব সহজে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয়নি। আসামের শ্রমজীবী মানুষকে বাগানের কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য করার জন্য বাগিচা মালিকরা ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আবেদন করে যে আসামে চাষযোগ্য জমির খাজনা এমনভাবে বৃদ্ধি করা হোক যার ফলে কৃষকেরা করভারে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয় চা বাগানে কাজ নিতে।[৪] বাগিচা মালিকদের ধারণা ছিল জমির খাজনা বৃদ্ধি পেলে কৃষকেরা সেই বর্ধিত খাজনা নগদ অর্থে পরিশোধের জন্য চা বাগানে কাজ নিতে বাধ্য হবে। বাগিচা মালিকদের আরও ধারনা ছিল যে আসামে আফিমের চাষ বন্ধ করলে শ্রমিক সরবরাহ বাড়ানো যাবে।[৫] বাগিচা মালিকদের দাবীমত জমির খাজনা বৃদ্ধি

করা হয়েছিল এবং আসামে আফিমের চাষও বন্ধ করা হয়। তথাপি আসামের চা বাগানে স্থানীয় শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায় নি। স্থানীয় শ্রমিক সরবরাহের এই অপ্রতুলতার কারণ সম্পর্কে বাগিচা মালিকরা মনে করত যে অসমীয়াদের আলস্য, কর্মবিমুখতা, নির্লিপ্ততা প্রভৃতি দায়ী।[৬] ঐ একই ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কোন আধুনিক গবেষকও মনে করেন যে ভারতীয় কৃষকদের গতিশীলতার অভাব (lack of mobility), যুক্তিহীনতা (Irrationality) এবং কৃষক মানসিকতার (Peasant mentality) জন্যই ঔপনিবেশিক ভারতে পূর্ণাঙ্গ শ্রম বাজারের সৃষ্টি হয়নি।[৭] আসামের চা বাগানে স্থানীয় শ্রমিকের সররবাহ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তৎকালীন আসামের কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তার ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই বোঝা যাবে বাগিচা মালিকদের ধারণা কতখানি ভুল ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আসামে গৃহযুদ্ধের এবং তার কিছু সময় পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বর্মী আক্রমণের ফলে আসামের জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। একদা জনবসতিপূর্ণ আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলে পরিণত হয়। জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে বহু চাষযোগ্য জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে। জমি এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অনুকূল ফলে কৃষকদের পক্ষে জমির মালিকানা পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা ছিল না। কৃষকেরা তুলনামূলকভাবে কম খাজনার বিনিময়ে জমি চাষের অধিকার পেত। ফলত আসামে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক সৃষ্টির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না।[৮] ১৯৪৩ সালে আইন বলে ক্রীতদাস প্রথা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা অসমীয়া সমাজের সঙ্গে এমনই গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে আইনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খুব সামান্য সংখ্যক ক্রীতদাস মুক্তির জন্য আবেদন করতে পেরেছিল।[৯] বিকল্প পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এবং উত্তমর্ণের কাছে শ্রম বাধা দেওয়ার প্রথার বিলুপ্তি না ঘটায় শ্রমদাসের (bonded labour) সংখ্যা বরং বৃদ্ধি পেল। আসামে বাণিজ্যিক পুঁজির প্রবেশে ও প্রসারে এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলো।[১০] এই সমস্ত সম্ভাব্য কারণেই চা বাগানে কাজ করার অন্য স্বাধীন শ্রমিক অসমীয়া সমাজ থেকে বিশেষ পাওয়া যায় নি।

তথাপি প্রাথমিক পর্যায়ে দরং জেলার কাচারী উপজাতিদের চা বাগানে কাজ নিতে দেখা গেল। এর প্রধান কারণ ছিল যে চা বাগান বিস্তারের

ফলে ঐ উপজাতিদের প্রথাগত জীবিকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বরং জেলার ডেপুটি কমিশনার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে চা বাগান বিস্তারের জন্য যথেচ্ছভাবে জমি বণ্টন করার ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর বিশেষ অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে।[১১] জীবিকাচ্যুত কাচারী উপজাতিরা বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত বাগানে কাজ নিতে আসে। এদের নিযুক্ত করার জন্য বাগিচা মালিকদেরও বিশেষ আগ্রহ ছিল। কারণ চা বাগান পত্তনের সময় যে ধরনের শ্রম প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রমে গভীর জঙ্গল কেটে চা চাষের উপযোগী জমি প্রস্তুত করা—সেই কাজে কাচারীরা ছিল বিশেষ উপযুক্ত ও যথেষ্ট দক্ষ।

কিন্তু শুরু থেকেই কাচারী শ্রমিকদের সংগে বাগিচা মালিকদের নানা কারণে সংঘাত দেখা দিল। বাগানগুলি জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া যেত না। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শ্রমিকদের মধ্যে নানা অসন্তোষ দেখা দিত। কোন কোন সময় অসন্তোষ দাংগায় পরিণত হত। ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে আসাম কোম্পানীর ...য়েপুর বাগানে খাদ্যাভাবের দরুন এক ব্যাপক দাংগা দেখা দেয়। পরবর্তী বছরগুলিতেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।[১২] খাদ্যদ্রব্যের অভাব জনিত কারণ ছাড়াও বেতন বকেয়া রাখার কারণেও বাগান-গুলিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিত। কলকাতা থেকে টাকা আসতে দেরী হওয়ার জন্য কোন কোন সময় বেতন দিতে দেরী হত ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগিচা মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেতন আটকে রাখত যার ফলে শ্রমিকরা হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে যেতে না পারে। এইভাবে বেতন বকেয়া রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৪৮ সালে আসাম কোম্পানীর শ্রমিকরা বেতন আদায়ের দাবীতে কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ককে ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ভবিষ্যতে নিয়মিত মজুরী দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।[১৩] ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পর কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ক স্টিফেন মর্নে কোলকাতাস্থ পরিচালকদের জানালেন যে "Kachari coolies should not be depended on ; and efforts must be directed to recruit the Bengali coolies."[১৪] কিন্তু বাংলা থেকেও খুব সহজে শ্রমিক সংগ্রহ করার নানা অসুবিধা ছিল।

যাই হোক আসামের চা বাগানে জোটবদ্ধভাবে শ্রমিক ধর্মঘটের আরও

একটি নজির পাওয়া যায় ১৮৫৫ সালে।[১৫] প্রকৃতপক্ষে চা বাগানগুলিতে বিদেশী মালিকদের সীমাহীন অত্যাচার ও শোষণ নীরবে সহ্য করা শ্রমিকদের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর ছিল না। ফলে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাগিচা শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে দেয়। বিদ্রোহ-জনিত পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় মালিকগণও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তির পর মধুরাম কোচ নামে একজন শ্রমিক ঠিকাদারকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মধুরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে আসাম কোম্পানীর একটি বাগান শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিল। মধুরাম কোচ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিচারের সময় শিব সাগরের ম্যাজিস্ট্রেট হল রয়েত হুংকার দেন 'Well' hang you first and try you afterwards."[১৬]

তথাপি কাচারী শ্রমিকদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। আসামের সহকারী কমিশনার ক্যাম্বেলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে খাদ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে একটি বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়।[১৭]

১৮৫৯ সালে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। ৭ই অক্টোবর আসাম কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত নাজিরা বাগানের শ্রমিকরা ম্যানেজারের বাংলোতে সমবেত হয়। মজুরি বৃদ্ধির দাবী না মানা পর্যন্ত তারা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ঐ একই দাবী নিয়ে অন্যান্য বাগানের শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে। ছয় শতাধিক শ্রমিক একত্রে সমবেত হয়ে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে শ্লোগানও দিতে থাকে। সেই মুহূর্তে একটি সরকারী কাজ সেরে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট হল রয়েত ঐ অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন। শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশ দেখে পূর্বাপর কোন খোঁজ না নিয়েই তিনি শ্রমিকদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। হলরয়েতের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার "armed with a musket and bayonet." এগিয়ে আসেন এবং ধর্মঘটের ভয়ংকর পরিণতির কথা শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দেন। তথাপি ধর্মঘটী শ্রমিকেরা তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। ম্যানেজারের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে সমস্বরে ঘোষণা করে যে তারা যেকোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। শ্রমিকদের এই অনমনীয় মনোভাবে বিচলিত হয়ে ম্যানেজার প্রধান মুহুরীকে পাঠালেন মধ্যস্থতার জন্য। শ্রমিকদের সঙ্গে কয়েক দফা

আলোচনা করেও কোন সমাধান সূত্র খুঁজে না পেয়ে মুহুরী ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ম্যাজিস্ট্রেট আপাতত সদরে ফিরে গেলেন এবং খাওয়ার সময় ম্যানেজারকে এই আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তিনি অধিক সংখ্যক পুলিশ নিয়ে এসে ধর্মঘটের উপযুক্ত মোকাবিলা করবেন।

ধর্মঘট চলতে থাকলো। এর প্রভাব অন্যান্য বাগানেও ছড়িয়ে পড়লো। ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে বাগিচা ম্যানেজারগণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। খবর পাওয়ামাত্র কাল বিলম্ব না করে ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং ৫০ জন সিপাই ও ততোধিক পুলিশ বরকন্দাজ সহ রাতের অন্ধকারে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। ভোর হতেই শ্রমিকদের ঘর থেকে টেনে বার করে আনা হলো। ২২ জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক বিচার করে ১ বছর অবধি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। অন্যান্য শ্রমিকদের বল প্রয়োগ করে কাজে পাঠানো হলো। পুলিশ বাহিনীকে কয়েক দিন বাগানে মোতায়েন রাখা হলো। এই ভাবেই বাগিচা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী সরকারী প্রশাসনের সহায়তায় বল প্রয়োগের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হলো।[১৮]

১৮৫৯ সালে বাগিচা শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে একটি কি দুটি বাগানের মধ্যে এই ধর্মঘট সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং হঠাৎ করেই এই ধর্মঘট শুরু হয় নি। এটি ছিল সুসংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত। নাজিরা বাগান সহ মাজেঙ্গা, সানতুয়া( শ্যেনচোয়া ) প্রভৃতি অন্যান্য বাগানেও একই দাবিতে ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের বিবরণী থেকে জানা যায় যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন সময়ে শ্রমিক নেতারা বারংবার সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। শ্রমিক নেতাদের এই আচরণ ট্রেডইউনিয়ন গণতান্ত্রিকতার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার বিষয়টিও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কর্তৃপক্ষের নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও ধর্মঘট ছিল শান্তিপূর্ণ এবং শ্রমিকদের দাবীও ছিল নির্দিষ্ট। ধর্মঘটের অপর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ধর্মঘট চলাকালীন কোন এক সময়ে কর্তৃপক্ষ যখন শ্রমিকদের বাগান ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিল শ্রমিকরা কিন্তু বাগান ছাড়তে অস্বীকার করল। শ্রমিকদের প্রলেতারিয়ানাইজেশানের এটি একটি প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথাগত জীবিকা নষ্ট হওয়ার ফলে এটাই ছিল কাচারী শ্রমিকদের জীবিকার একমাত্র উৎস।

স্বভাবত এই কারণেই তারা বাগানের মধ্যে থেকেই তাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন চালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

শ্রমিকদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সংগ্রামকে পুলিশের সহায়তায় দমন করেই প্রশাসন ক্ষান্ত ছিল না। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য নাজিরা বাগানের কাছে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হলো। প্রতিষেধক ব্যবস্থা স্বরূপ আসামের কমিশনার বাংলার গভর্নরকে জানালেন যে 'আমি আশা করি আসাম কোম্পানী ও অন্যান্য বাগিচা মালিকরা ভবিষ্যতে আসামের বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়োগের ব্যবস্থা করবে ; এবং এই ব্যবস্থাতেই কাচারী শ্রমিক-দের ধর্মঘট করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।"[১৯] আসাম কোম্পানীর কলকাতাস্থ পরিচালকবর্গও এক বিশেষ সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে "There should be a large proportion of coolies of another class employed."[২০]

কাচারী শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চা শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের সাথে সাথে চা বাগানগুলিতে স্থানীয় অসমীয়াদের পরিবর্তে ভিন্ন প্রদেশের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হতে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপক প্রয়াস নেওয়া হোল। ঔপনিবেশিক সরকার নানা দাসত্বমূলক আইন প্রণয়ন করে বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগের পদ্ধতি এবং নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর বাগিচা মালিকদের ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিল। শুরু হোল আসামের চা বাগানে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আর এক ইতিহাস।

## সূত্র নির্দেশ


1. H. A. Antrobus, History of the Assam Company 1839-1953 (Saliesburg, 1957)
2. Ibid, pp. 374-383
3. Ibid p. 383, Bruce, C. A., "Report on Tea in Assam", Asiatic Society of Bengal, Vol. VIII 1839.
4. Amalendu Guha, Planter Raj to Swarg : Freedom Struggle

and Electoral Politics in Assam 1826 1947 (New Delhi, 1977) pp. 9-10.

5, Ibid. p. 9

6. W. Robinson, "Our Tea Gardens in Assam and Cachar," 'Calcutta Review' n. 35 (Calcutta 1860) p. 52

7. Margaret Reid, the 'Indian Peasant Uprooted' (London 1931) pp. 131-132

8. H. Goswami, "Circumstances leading to the importance of tea-estate Laboures to Assam," 'Journal of Historical Research', Vol. II, March 1977 no. 1, pp. 42-46.

9. Amalendu Guha, n. 4 pp. 10-11

10. Arabindu Guha, "Colonisation of Assam : Second phase 1840-1859," Indian Economic and Social History Review, 4 Dec. 1967.

11. Papers Regarding the Tea Industry in Bengal (Calcutta, 1873) p. 136

12, Kalyan Sircar, "Of Labour and Management The First Twenty Years of the Assam Company Limited" 1839-59 (Memograph, London)

13. Amalendu Guha, n. 4, pp. 15 16

14. Kalyan Sircar, n. 12

15. হোমেন বরগোহাঞি, "আসামের সংগ্রামী চা শ্রমিক" 'আজকাল', ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১

16. Benudhar Sharma, The Rebellin of 1857 vis-a vis Assam ( Gauhati 1958 ) রবিন কাকতি, "আসামের বনুরা আন্দোলন" ( অসমীয়া )
The Chah Mazdoor, May, 1982

17. "Report of the Commissioners appointed to enquire the State and Prospects of Tea cultivation in Assam, Cachar and Sylhet" (Calcutta, 1868) p. 19

18. Bengal Government, "Relative to a disturbance of the Cachari coolies in the employ of the Assam Company."

19. Judicial proceedings nos. 67 and 68, dated December, 1, 1859 (West Bengal State Archives)

19. Ibid.

20. Kalvan Sircar, n. 12

# চটকলের শ্রমিকদের উপর সর্দারী প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০)

অমল দাস

সম্প্রতি ডঃ দীপেশ চক্রবর্তী আর একটি প্রবন্ধের[১] একটি অংশে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তার এই প্রবন্ধটিতে তত্ত্বগত বিশ্লেষণের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই তত্ত্বগত জটিলতার গভীরে প্রবেশ করতে চাই না। এই প্রবন্ধে আমি প্রধানত হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলিতে সর্দারের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কেই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য আমার এই প্রবন্ধ থেকে বাংলার চটকলগুলিতে সর্দারদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের একটা সামগ্রিক চেহারাও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

চটকলে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের রূপরেখাটি নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও বাস্তবে প্রকাশলাভ করে। এই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের প্রথম রূপটি ধরা পড়ে সর্দারের ভূমিকা ও কার্যাবলীর মধ্যে। ইণ্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে সর্দার এবং সহকারী সর্দারকে চটকলের "the lower subordinate supervising staff" বলা হয়েছে।[২] অনেক চটকলে সর্দাররা ফোরম্যান হিসেবে কর্মরত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে চটকলের মালিকদের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা চুক্তি বজায় থাকে। আর এর ফলে উদ্ভব হয়েছে চটকলে সর্দারী প্রথা, সর্দারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ।

তদানীন্তন বাংলার সরকার সর্দারের কার্যাবলীর এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ[৩]

> সর্দার হচ্ছে একজন শ্রমিকের তাৎক্ষণিক নিয়োগকর্তা। সর্দার তাকে কাজ দেয় এবং শ্রমিকরা তার ইচ্ছায় তাদের কাজ বজায় রাখতে পারে। সর্দার হচ্ছে এ সকল লোকের প্রকৃত প্রভু। সে তাকে কাজে নিযুক্ত করে এবং কাজ থেকে সরিয়ে দেয় এবং বহুক্ষেত্রে, সে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে এবং বাসস্থান থেকে আবার প্রয়োজনে তাড়িয়েও দেয়। সে অনেক ছোটখাট দোকানের মালিক বা অনেক দোকান

নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এসব দোকান এসব শ্রমিকদের খাবারের যোগান দেয়। শ্রমিকরাও তাদের চাকরী বজায় রাখার জন্য থোক টাকা সর্দারকে দেয়। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের জীবন প্রতি পদে পদে সর্দারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই উপাদান থেকে এটা স্পষ্ট যে, শ্রমিকরা হচ্ছে সর্দারদের দ্বারা নিযুক্ত। সর্দারী নিয়োগ প্রথা বাংলার চটকলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই প্রচলিত ছিল। গঙ্গার দু'পাশে তখন প্রচুর চটকল গড়ে উঠেছিল। চটকল গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী অফিসার বি. ফলির বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০ বছর পূর্বে চটকলে সমস্ত শ্রমিকই ছিল বাঙ্গালী। ক্রমে ক্রমে এদের স্থান পূরণ করে বিহার ও উত্তর প্রদেশের অবাঙ্গালী হিন্দুস্থানীরা।[৪] এই বহিরাগত অধিবাসী শ্রমিকদের আগমনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সর্দার মিঃ ফলিকে জানায় যে, সে গ্রীষ্মকালে যখন ইচ্ছা তখনই গাজীপুরে ফিরে যেতে পারে, এবং সেখান থেকে তার মালিকের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সংখ্যক শ্রমিক আনতে পারে। এ ব্যাপারে তার কোন অসুবিধা হয় না।[৫]

প্রতি আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত্ব থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে বাংলার চটকলগুলিতে—হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার আশেপাশে বহিরাগত শ্রমিকদের আগমন যথেষ্ট পরিমাণে বজায় ছিল এবং এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই আগমনের ধারা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকায় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি প্রথমেই মনে আসে তা হল ঃ এই শ্রমিকদের কি পদ্ধতিতে কাজে নিয়োগ করা হত? অথাৎ তাদের নিয়োগপ্রথা কি ছিল?

অবাঙ্গালী শ্রমিকদের বাংলার চটকলে নিয়োগ সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের পর্যবেক্ষণ এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "অবাঙ্গালী শ্রমিকদের বাংলার চটকলে চাকরী পাওয়ার ব্যাপারটা তার নিজের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঃ কারণ যে সর্দার তাদের কাজ দেয় (পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে অবশ্যই নয়) সে হয় সম্পর্কে তার নিজের কাকা অথবা তার গ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। এই ব্যক্তি একটানা তার প্রভাব খাটিয়ে তার নিজের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুর আত্মীয় স্বজনকে কলকারখানায় নিয়োগর চেষ্টা করে যায় বা যাচ্ছে।"[৬] ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের এই পর্যবেক্ষণের

সমর্থন তদানীন্তন আদমসুমারীর রিপোর্ট থেকেও পাওয়া যায়। ১৯২১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বলা হয়ঃ[৭]

> শ্রমিক হিসেবে কারখানায় কাজের জন্য সর্দাররা গ্রাম থেকে লোকের দল (gangs) সংগ্রহ করে। প্রায়ই তারা তাদেরকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে আসে, একসঙ্গে রাখে, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কোথাও ব্যবস্থা করছে বা আবার বাড়ী ফেরৎ পাঠাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এই সর্দারেরা সাধারণত বিহার, উড়িষ্যা, অথবা উত্তর প্রদেশের লোক একং তাদের নিয়োগ সীমাবদ্ধ থাকছে তাদেরই গ্রামের দরিদ্রলোকেদের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেদের মধ্যে।

ঠিক এ কারণেই কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণার এক একটি চটকলে এক এক প্রদেশ বা জেলার লোক অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই বহিরাগত শ্রমিকদের এক একটি চটকলে বণ্টনের ধারা থেকেই এই সর্দারী নিয়োগের রূপটি ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বালিয়া জেলায় ১৪,০৯২ জন আগন্তুক শ্রমিকদের মধ্যে ৮,২৪০ জনের উপর শ্রমিক হাওড়ার চটকলগুলিতে ছিল। আবার পার্শ্ববর্তী জেলা আজমগড়ের ১২,৫৬২ জন আগন্তুক শ্রমিকদের মধ্যে আমরা হাওড়ায় মাত্র ২,৫৯৩ জনকে দেখতে পাই। এর থেকে বলা যায় যে, হাওড়ার চটকলগুলিতে আজমগড় জেলার থেকে বালিয়া জেলায় সর্দারদের প্রভাব বেশী। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শ্রমিকদের শতকরা হিসেব নিলে দেখা যায়, কলকাতা শহরে এই সংখ্যা ৫৩ ভাগ, চব্বিশ পরগণায় ২২ ভাগ এবং হাওড়ায় ২৫ ভাগ।[৮]

এই নিয়োগ কিসের ভিত্তিতে হত ? মোটামুটিভাবে বলা যায়, ধর্মগত, জাতিগত, গোষ্ঠীগত সম্পর্ক, আত্মীয় সম্পর্ক ও গ্রাম্য সম্পর্কই ছিল সর্দারী নিয়োগের মূল ভিত্তি।[৯] বাংলার তদানীন্তন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেনঃ[১০]

> চটকলের সর্দার বা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও অন্যান্য শিল্পের সর্দার তাদের নিজেদের গ্রাম এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে। এ কারণেই একই গ্রামের বা ঠিক তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেদের বাংলার একই জেলার শিল্পাঞ্চলে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্রমিক নিয়োগ ছাড়া, সর্দারের আরও কি কি 'বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়

এবার আমরা সেই আলোচনায় আসব। পূর্বোল্লিখিত বাংলার সরকারের সর্দারী কার্যাবলীর বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সর্দার চটকলে নিয়োগ ছাড়াও আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত। বাংলার শিল্পাঞ্চলগুলিতে বাসস্থান সমস্যা শিল্প শ্রমিক ও মালিকদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সর্দার অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। কিভাবে সর্দার সেই ভূমিকা পালন করত তা আলোচনা করা যাক।

অনেক সর্দার যারা হাওড়া, হুগলী বা চব্বিশ পরগণার চটকলে বছরের পর বছর কাজ করে এবং থাকে তারা আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে ছোটখাট জায়গাগুলি কিনে নেয় এবং সেখানে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বা বস্তি নির্মাণ করে। তারা তাদের নিজের আত্মীয়স্বজন, গ্রামের লোক, দেশের লোক, জাতের বা গোষ্ঠীর লোককে এইসব কুঁড়ে ঘর বা বস্তি ভাড়া দেয়। বিষয়টা দু-একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিঃ ফলি যখন হাওড়া নামক চটকলটিতে পরিদর্শনে যান তখন কথা প্রসঙ্গে গাজীপুরের এক সর্দার তাকে জানায় যে সে নিজে হাওড়ায় দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে বসবাস করছে। তার বহু আত্মীয়স্বজন তার কাছে এ সময়ের মধ্যে এসেছে এবং এখানে থেকে কাজ করছে। কেউ এদের মধ্যে স্বেচ্ছায় এসেছে, আবার কেউ তার সঙ্গে এসেছে। এই সর্দারের এখানে কয়েক কাঠা জমি আছে এবং এই জমির জন্য সে জমির মালিককে টাকা দেয়। এই জমিতে সে ২০ থেকে ২৫ টাকা খরচ করে আটখানা কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করেছে। প্রত্যেক কুঁড়ে ঘরে ২ থেকে ৪ জন লোক থাকে। বিনিময়ে মাসে ১৪ আনা করে সে প্রতি ঘর থেকে ভাড়া আদায় করে।[১১] জৌনপুরের কালোয়ার গোষ্ঠীর আরেকজন সর্দার মিঃ ফলিকে জানায় যে সে বাল্যকাল থেকেই হাওড়ায় বসবাস করছে। তার নিজের ১১ কাঠা জমি আছে এবং সে ঐ জমিতে ৪০টি কুঁড়েঘর নির্মাণ করেছে। অনেক লোকই তার এইসব ঘরে ভাড়া দিয়ে থাকে।[১২] শুধু হাওড়া নয়, কলকাতা চব্বিশ পরগণা ও হুগলীর বিভিন্ন চটকলের পাশে কুঁড়েঘর বা বস্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সর্দারদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই কুঁড়েঘর বা বস্তিতে চটকলের শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত।

বাংলার সরকার সর্দারের কাজের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বর্ণনা চটকল বা তার আশেপাশে সর্দার ও শ্রমিকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক বজায় ছিল তার সুন্দর ইঙ্গিত দেয়।

"সর্দাররা শ্রমিকদের নিয়োগ করে ও আবার সরিয়ে দেয় বা বরখাস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আবার বাসস্থান থেকে উৎখাত করে।"[১৩] এই অংশটুকু যে বিষয়টার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে তা হল শ্রমিকের উপর সর্দারের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য। (Personalised control) এই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হল কর্তৃত্ব ও আনুগত্য। একজন শ্রমিক বা একদল শ্রমিক ততক্ষণ পর্যন্ত সর্দারের কুঁড়েঘরে থাকতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বা তারা সর্দারের কাছে অনুগত, বাধ্য ত বিনয়ী থাকে এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরই শ্রমিকদের সর্দারের বাসস্থানে থাকা না থাকা নির্ভর করে। যদি এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তা হলে সর্দার কেবল শ্রমিককে তার বাসস্থান থেকেই উৎখাত করেনা, এই সঙ্গে সেই সর্দার তার বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে তাকে তার কাজ থেকে সরাবারও অনেক সময় ব্যবস্থা করে।

সর্দারী এই নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব চটকলে অধিবাসী শ্রমিকের জীবনের ছন্দ ও ধারাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা হত তার একটা সুস্পষ্ট ছবি দিয়েছেন তদানীন্তন বাংলার লেবার ইন্টেলিজেন্স অফিসার জি এন গ্রিলব্রিষ্ট। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়।[১৪]

> সর্দার তাকে ( শ্রমিককে ) তার নিজের থেকে ভাড়া দিয়ে বাধিত করে এবং পথে খাবার কেনার জন্য সামান্য অর্থ দেয়। সর্দার তাকে আরও কিছু টাকা অগ্রিম দেয়, কারণ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকের চাকরী নাও জুটতে পারে। সে তাকে বিশেষ কোন স্থানে থাকবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে এবং বিশেষ কোন দোকান থেকে চাল ও খাদ্যসামগ্রী কিনবে এ ব্যাপারেও নির্দেশ দেয়। যে দিনে কোন কাজ খালি থাকে এবং সে শ্রমিক সর্দার কর্তৃক কাজ পায়; সর্দার তখন তাকে বলে ঃ "মিলের পাওনা-বইএ তোমার মাসে ১২ টাকা অনাদায়ী পড়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে তোমার জন্য আমি ( সর্দার ) কিছু টাকা খরচ করেছি। সাধারণত যখন আমি তোমাকে কোন কাজ দেব, তখন আমাকে তুমি এক টাকা এবং এ সঙ্গে মাসে এক টাকা করে ২ বছর দিয়ে যাবে। যেহেতু টাকা এক সঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য কাজের ব্যবস্থা রাখতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত মাসে ২ টাকা করে আমাকে দিয়ে যাবে। যদি এই শর্তে তুমি

রাজী না থাক তবে তোমার চাকরী কতদিন থাকবে তা আমি জানি না।"
বিনয়ী শ্রমিক যুবক বিনয়ের সঙ্গে এই শর্ত মেনে নেয়। এই শ্রমিক তার বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দেখে যে, যে ঘরে সে আরও ৬ জনের সঙ্গে থাকে সে বাড়ীর মালিক তার এই সর্দার। তাছাড়া যে দোকান থেকে সে চাল কেনে সেই দোকানটিও এই সর্দারের সম্পত্তি।

উপরোক্ত এই বিশেষ উপাদানটি থেকে আমরা সর্দার ও তার শ্রমিকদের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত চুক্তি ও সম্পর্ক গড়ে উঠার আভাস পাই। আর এই ব্যক্তিগত চুক্তি সর্দার ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই উদ্ধৃত হচ্ছে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের আবার মূল ভিত্তি হচ্ছে সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত জাতিগত ও আঞ্চলিক ঐক্য। পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু হয় পারস্পরিক আদান প্রদান। শ্রমিকরা সর্দারের কাছে তাদের চাকরী, বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধা আশা করে। যখন সর্দার তাদের সে আশা পূর্ণ করে, তখন সেই সর্দার তার বিনিময়ে সেই শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতিদান আশা করে এবং এই শ্রমিকরাও কাজের বিনিময়ে সর্দারকে টাকা দেয়।

এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারস্পরিক আদান প্রদানের এক সুন্দর ছবি আমরা মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসমাপ্ত চটাব্দ' নামক কাহিনী থেকে পাই।[১৫] সেখানে একদিকে যেমন সর্দার ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান প্রদানের রূপটি ধরা পড়ে, সে সঙ্গে অন্যদিকে সর্দার শ্রমিকের জীবনধারার উপর কিভাবে তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি হল দুটি—এক, ভয়, এবং দুই, সর্দারের প্রতি শ্রদ্ধা। 'অসমাপ্ত চটাব্দ' থেকে বর্ণিত নিচের অংশটুকু এই বক্তব্যের সমর্থনে দেওয়া যেতে পারে।

> সমারুর বউ গোদাবরী—বিলাসপুরে তার বাড়ী। জগদ্দলে যখম প্রথম এসেছিল, তখন তার বয়েস আঠারো কি উনিশ। নিখুঁত কালো চেহারা—নিটোল স্বাস্থ্য তার মত আরো পনের-ষোলটি মেয়ে এসেছিল তার সঙ্গে বিলাসপুর অঞ্চল থেকে। তাদের নিয়ে বসেছিল একজন কুলী সর্দার।···বিলাসপুরের জংগল-ঘেরা গ্রামের মানুষদের কাছে শহর-মাড়ানো চটকলের সর্দার মহাপুরুষ বিশেষ। তারা যা বলে তাই করতে পারে। সর্দার যদি কোনো মেয়েকে এক চোখ দেখে নিয়ে বলে —একে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি এর মাসে পঞ্চান্ন টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—তা হলে তার বাপ-মা একেবারে গলে পড়ে।···

সর্দারের হাতে মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার কত সুবিধে। মেয়েরা প্রত্যেকে পাবে পঞ্চাশটা করে টাকা, একখানা করে ন-হাতী শাড়ী। এই থেকেই এখন চলুক রেল-ভাড়া, চলুক খাই-খরচা। কোনো চিন্তাশীল বাপ-মা যদি প্রশ্ন করে বসে যে, দেনা শোধ হবে কি করে? তা হলে সর্দার মিষ্টি হেসে তাকে থামিয়ে দেয় এই বলে যে, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও ভাই। মেয়ে আগে কাজ পেয়ে যাক; তারপর ধার শোধের কথা উঠবে। হপ্তায় পনের টাকা রোজগার হলে কদিনই বা লাগবে শোধ দিতে এই কটা টাকা?...

মেয়েরা এইভাবে অকূলে ভেসে পড়ে। তারা হয়ে যায় সর্দারের কাছে বাঁধা। সর্দার এদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। কারুর কিছু বলবার নেই। বিলাসপুরী জোয়ান মেয়েদের অবশ্য চটকলে চাকরির অভাব হয় না। গোদাবরী আর গোদাবরীর সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের কাউকেই বসে থাকতে হয়নি—এসেই তারা কাজ পেয়ে গিয়েছিল। হপ্তায় তারা যা কাজ তুলত, তাতে পাঁসরেটে তাদের রোজগার দাঁড়াতো তের, চোদ্দ, পনের টাকা। সর্দারের সঙ্গে কড়ার হয়—রোজগারের অর্ধেক টাকা তাকে দিয়ে যেতে হবে যতদিন না সুদশুদ্ধ তার দেনা শোধ হয়।...যতদিন না সর্দারের শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত শোধ হচ্ছে ততদিন তারা সর্দারের সম্পত্তি—সর্দারের হাত ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সর্দারের বাঁদী বললেও হয়।[৬]

এ প্রসঙ্গে লেখক জগদ্দলের চটকলের কালু সর্দারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনী থেকে সর্দারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, কর্তৃত্ব ও অত্যাচারের রূপটি ধরা পড়ে।

"কালু সর্দার একবার দেশ থেকে ফিরল, সঙ্গে তার এক দঙ্গল মেয়ে। দেশে কালুকে সবাই ডাকত 'দেওতা' বলে। ' সত্যিই তার ব্যবহার ছিল দেবতার মতো। মনে হত যেন পরের উপকার করবার জন্যেই সে জন্ম-গ্রহণ করেছে—নিজের বলতে তার কিছু নেই। সেই কালু সর্দার চটকলে ফিরে এসেই ধরল আর এক মূর্তি। মেয়েগুলোকে রাখল সারি সারি কটা ঘরে প্রায় বন্দিনীর মতো। বলে দিল, তার হুকুম ছাড়া এক পা-ও তারা এদিক ওদিক যেতে পারবে না। মেয়েগুলো ভয়ে জড়সড়। কালু সর্দার সারাদিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, চেঁচামেচি করে আর রাতে যখন

যাকে খুশি ডেকে পাঠায় তার ঘরে। এমনি চললো কিছু দিন, তারপর শখ খানিকটা মিটলে কালু সর্দার তাদের একে একে কাজে লাগিয়ে দিল।[১৭]

এখন প্রশ্ন হোলো: শ্রমিকরা সর্দারকে যে টাকা কাজের বিনিময়ে প্রদান করত তাকে আমরা কি 'ঘুষ' বলতে পারি? না অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? অনেক সময় বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কমিশনের কাছে শ্রমিকরা নিজের জবানীতে যে শব্দগুলি উচ্চারিত করেছে তা হল—ডালি, দস্তুরী বখ্‌শিস্ সালামি, পার্বণী ইত্যাদি[১৮] ডালি কথাটার অর্থ হচ্ছে—উপঢৌকন বা উপহার। পার্বণী হচ্ছে কোন পার্বণে রীতিগত বা প্রচলিত প্রদান। দস্তুরী হচ্ছে একরকম প্রচলিত কমিশন। বখ্‌শিস কথাটার অর্থ হল পুরস্কার বা দান হিসেবে প্রদান। সালামিও এরকম ধরনের এক অর্থনৈতিক প্রদান। এই কথাগুলোর অর্থ যদি আমরা সঠিকভাবে বিচার করি তবে যেটা অবশ্যই দেখতে পাব তা হল এর কোনটাই ঠিক 'ঘুষে'র পর্যায়ে পড়ে না। এই প্রদানকে বরং আমরা মোগল ও ব্রিটিশ দরবারে যে 'নজরানা' ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সর্দার ও শ্রমিকের এই আদান-প্রদান থেকে উভয়ের একটা ব্যক্তিগত চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিগত চুক্তি থেকেই আদান-প্রদান ও পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রয়েল কমিশন অন্ লেবার'-এর সামনে উপস্থিত বহু শ্রমিক সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সর্দারী 'জবরদস্তিমূলক' আদায় বা 'ঘুষে'র কথা অস্বীকার করে।[১৯] বরং তাদের বক্তব্য থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হল, সর্দার ও তাদের মধ্যে একটা চুক্তি বজায় ছিল এবং এই চুক্তির ভিত্তিতেই পারস্পরিক আদান প্রদান হত। হাওড়ার একজন মহিলা শ্রমিকের জবানী থেকে এটা প্রমাণিত হয়। এই মহিলা শ্রমিক মাদ্রাজ থেকে এসেছিল, হাওড়ার চটকলে কাজ করত। সে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কমিশনের সামনে বলে যে, চাকরী পেলে সে তার সর্দারকে তার প্রাপ্য 'প্রথম মজুরী' থেকে ২ টাকা দেবে এই আশ্বাস দেয়। এর পরেই সে সর্দারের কাছ থেকে তার চাকরী 'Manage' করেছে।[২০] এরূপ আদান প্রদানকে আমরা এক ধরনের 'কর' প্রদান বলতে পারি যা শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে সর্দারকে দিত। এভাবে উভয়ের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কেন শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে সর্দারী আস্তানায় থাকত এবং তার কথামত তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত—তার ইঙ্গিত উভয়ের এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও চুক্তির মধ্যেই নিহিত আছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক ও সর্দারের মধ্যে এই ব্যক্তিগত চুক্তি ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকত, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সুসম্পর্ক ও সোহার্দ্যও বিদ্যমান থাকত। কিন্তু যখনই এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটত, তখনই সর্দার অন্যরূপ ধারণ করত এবং শুরু হত শ্রমিকের দুর্দশা ও দৈন্য। যদি কোন শ্রমিক সর্দারকে কোন কারণে অমান্য করত বা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে চলবার চেষ্টা করত, তখনই সর্দার তার বিরূদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত। সর্দার তার চাকরী যাওয়ার ব্যবস্থা করত, তাকে তার বাসস্থান থেকে উৎখাত করত এবং এমনকি সে অঞ্চল থেকেও বিতাড়িত হতে বাধ্য করত। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে সর্দারী এই মনোভাব আরও স্পষ্ট হবে। হাওড়া নামক চট-কলের গরসামা কুর্মী নামে এক মহিলা শ্রমিককে হাওড়া ছাড়তে বাধ্য করল এক সর্দার। এর কারণ হল সেই সর্দারের সঙ্গে উক্ত মহিলার সম্পর্কের অবনতি নানা কারণে ঘটেছিল এবং এর ফলে সর্দার নানা ঝামেলা ও অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। যখন মহিলা শ্রমিকটি পরে জানল যে, সে সর্দারের সঙ্গে তার রাগারাগি হয়েছিল সে সর্দার সে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে, তখনই কেবল মহিলাটি হাওড়ায় ফিরে আসতে সাহস করল।[২১] ঠিক একই ধরনের দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি হাওড়ার লাডলো চটকলে। এখানে একটা গণ্ডগোল ও ঝামেলা দেখা দেয় লাডলো চটকলের কতিপয় শ্রমিকের সঙ্গে হালিম নামে এক সর্দারের। এই সর্দারের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা মালিকের কাছে নালিশ জানায়। একজন বিলাসপুরী মহিলা শ্রমিক এই মর্মে অভিযোগ করে যে, উক্ত সর্দার তাকে যথেচ্ছ পরিমাণে অপমাণিত করেছে এবং যেহেতু সে এই ঘটনার প্রতিবাদে তার বিভাগীয় সাহেবের কাছে এই সর্দারের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে সেহেতু সে, তার স্বামী এবং এই ঘটনার স্বাক্ষী আর একজন শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। বহু শ্রমিক এই কাজের প্রতিবাদ করে এবং সাহেবের কাছে সর্দারের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের কথা বলতে আসে। কিন্তু সাহেব তাদের কথায় কোন কর্ণপাত তো করেনই নি, উপরন্তু প্রতিবাদ জানানোর জন্য বহু শ্রমিক সাহেব কর্তৃক চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়।[২২]

তবে উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, শ্রমিকদের সর্দারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সর্বাত্মক ও চরম ছিল না। এর একটা সীমা ছিল। যখন সর্দারী নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে, ঠিক তখনই শ্রমিকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে এবং উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কটি,

কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্কটি নষ্ট হয়েছে। একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর এর পরিণতি দেখা গেছে সর্দার বিরোধী শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটে। শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে সর্দারের দুর্ব্যবহারে বাধা দিয়েছে ও সর্দারী স্বেচ্ছাচারিতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার মোকাবিলার জন্য সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর চটকলের শ্রমিকরা এক সর্দারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে একত্রে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারা মালিকের কাছে একযোগে সেই সর্দারকে বরখাস্ত করার দাবী জানিয়ে ধর্মঘট করেছিল।[২৩]

কিন্তু সর্দারের অত্যাচারী রূপের বাইরে আরও একটি রূপ ছিল। তার দ্বিতীয় রূপটি হল শ্রমিকদরদী রূপ। সেখানে সর্দার সম্পূর্ণভাবে ছিল শ্রমিকের 'লোক'। কারখানা ও তার আশেপাশে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের সময় সে এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একত্রে আন্দোলন করত, নেতৃত্ব দিত। সেখানে তার পরিচয় একজন শ্রমিক হিসেবে, কারখানার মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে নয়। চটকলে সর্দারের অপসারণের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও সর্দাররা যৌথভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে এ রকম নিদর্শন আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাওড়ার বাউড়িয়ায় ফোর্ট গ্লষ্টার চটকলে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ এক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটের কারণ হল, মিল পরিচালকগোষ্ঠী কর্তৃক শ্রমিকদের কাজের সময় অন্যায়ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া। সর্দার, কেরাণী ও সাধারণ শ্রমিক সকলে মিলে এর প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রত্যুত্তরে, মালিকপক্ষ কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ায় পর সাতজন কেরানী ও চারজন সর্দারকে কাজ থেকে অপসারিত করে ও তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করে। ফোর্ট গ্লষ্টার চটকলের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং সমস্ত রকম পুলিশী জুলুম, কর্তৃপক্ষের দমননীতি ও অত্যাচার সহ্য করে তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যায়।[২৪] একই জিনিস লক্ষ্য করা যায় বালি চটকলের বয়ন বিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে। এই শ্রমিকরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জুলাই বয়ন বিভাগের একজন সর্দারের অন্যায় অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। অন্য বিভাগের সর্দাররাও প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ রাখে। এই ধর্মঘট সর্দারদের নেতৃত্বাধীনে শ্রমিকগণ কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের দাবী-দাওয়া আদায় করে।[২৫,২৬]

## উপসংহার

এই প্রবন্ধ শ্রমিকদের উপর সর্দারদের এক বিশেষ ধরনের কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের রূপ প্রতিফলিত করে। সর্দার হল চটকল কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের প্রথম বাস্তব রূপ। সে হল কর্তৃপক্ষের 'ব্যক্তিগত আইন' কার্যকরী করার প্রথম প্রতীক ও উপাদান। তবে এ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শ্রমিকদের উপর সর্দারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ের একটা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যই শ্রমিকরা সর্দারকে তাদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তাদের অনুগত ও বাধ্য থেকেছে। এই কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই শ্রমিকদের পার্থিব অবস্থাটা চটকলের আশেপাশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পার্থিব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে শ্রমিকরা তাদের দৈনন্দিন কাজ করত, জীবিকা নির্বাহ করত, নানা কষ্ট অত্যাচার, দুর্গতি সহ্যও করত। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন অবস্থা যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠত, সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করত, তখনই প্রভুত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যেত; পরিবর্তে আসত পারস্পরিক বৈরিতার সম্পর্ক। সর্দার শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শোষণ করত আর শোষিত শ্রমিক শ্রেণী তার প্রতিবাদ করত। আর করত আন্দোলন ও চটকলে ধর্মঘট। তবে শ্রমিকদের উপর সর্দারের অত্যাচার যেমন লক্ষ্য করা গেছে ঠিক তেমনই তাদের সঙ্গে সর্দারের একই সঙ্গে আন্দোলন, প্রতিবাদ ও নেতৃত্ব দেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সেখানে সর্দার তাদের প্রভু নয়, সে তাদের মতই একজন শ্রমিক। নিজেকে সে এদের লোক হিসাবেই মনে করেছে এবং এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এ ভাবে এ প্রবন্ধে সর্দারের দ্বিবিধ রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

## সূত্র-নির্দেশিকা

১ "দীপেশ চক্রবর্তী, "কণ্ডিশন্‌স ফর নলেজ অফ ওয়ার্কিং ক্লাস কণ্ডিশনস্‌: এমপ্লয়ারস, গভর্নমেন্ট এণ্ড দ্য জুট ওয়ার্কার্স অফ ক্যালকাটা ১৮৯০-১৯৪০" ইন রণজিৎ গুহ সম্পাদিত সাবলটার্ণ স্টাডিজ ভল্যুম ২ (নিউ দিল্লী, ১৯৮৩)।

২ **রয়েল কমিশন অন্‌ লেবার ইন্‌ ইণ্ডিয়া** (এরপর **আর. সি. এল. আই.**) ভল্যুম পাঁচ, পার্ট এক, পৃষ্ঠাগুলি ২৮০-৮১ (লণ্ডন, ১৯৩১)

৩ **আর. সি. এল. আই,** পূর্বোল্লিখিত, ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৩ ; আরও দেখুন চক্রবর্তী, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা-২৯৩

৪ বি. ফলি, **রিপোর্ট অন্‌ লেবার ইন বেঙ্গল** (কলকাতা ১৯০৬,) প্যারাগ্রাফ ২৯।

৫ ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্যারা ৯।

৬ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, **ক্যাপিটেল এণ্ড লেবার ইন্‌ দ্য জুট ইণ্ডাস্ট্রি।** পৃষ্ঠাগুলি-৫৬-৫৭ ; (বোম্বাই, ১৯৫৩)

৭ দেখুন **সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া,** ১৯২১, ভল্যুম ছয়, **সি. টি. অফ ক্যালকাটা,** পার্ট এক, **রিপোর্ট,** দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২২। (কলকাতা, ১৯২৩)

৮ ঐ, পৃষ্ঠা ২২।

৯ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ঐ, পৃষ্ঠাগুলি—৫৬-৫৭।

১০ **আর. সি. এল. আই.,** ঐ পৃষ্ঠা ১১।

১১ ফলি, ঐ, অ্যাপেনডিক্স। (নোট অন হাওড়া জুট মিল্‌স, তারিখ ১৯ আগস্ট, ১৯০৫)

১২ ঐ।

১৩ **আর. সি. এল. আই.,** ঐ, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১৪ আর. এন, গিলক্রিস্ট, **ইণ্ডিয়ান লেবার এণ্ড দ্য ল্যাণ্ড,** পৃষ্ঠাগুলি ৬-৭, (কলকাতা ১৯৩২) ; আরও দেখুন, চক্রবর্তী, ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৪।

১৫ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, **অসমাপ্ত চটাব্দ** (বাংলায় রচনা) চৈত্র, ১৩৬৯, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৬২, কলকাতা)।

১৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬-১০০।

১৭ ঐ।

১৮ **মীরাট কন্সপিরেসি কেস** (এরপর **এস. সি. সি.**) প্রদর্শিত নং ডি. আটাত্তর। **ন্যাশনাল আর্ককাইভস অফ ইণ্ডিয়া,** নিউ দিল্লী)।

১৯ **আর. সি. এল. আই.,** ভল্যুম এগার, পার্ট দ্বিতীয়। পৃষ্ঠা ৩৬০।

২০ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬০।

২১ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬০।

২২ এম. সি. সি. প্রদর্শিত নং ১৭১ (৩), 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ২. ১০. ১৯২৮ তারিখে।

২৩ জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, পুলিস ব্রাঞ্চ, জানুয়ারী, ১৮৯৬, প্রসিডিউস্ এ, নং ৬ ১১। (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট আর্কাইভস্, কলকাতা)।

২৪ প্রাইভেট পেপারস অফ অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জী। (এটা নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়ম এবং লাইব্রেরী নিউ দিল্লীতে রক্ষিত।)

২৫ রিপোর্ট অফ দ্য কমিটি অন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যানরেষ্ট ইন বেঙ্গল, ১৯২১, অ্যাপেনডিক্স। (বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস)।

# সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্প-শ্রমিক আন্দোলন

নির্বাণ বসু

## সূচনা

ভারতে আধুনিক শিল্প বিস্তারে অগ্রণী প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলার একটি বিশেষ স্থান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই পাটকল, কয়লাখনি, চা বাগিচা, বন্দর, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও অন্যান্য বহু ছোট বড় কলকারখানা এখানে গড়ে ওঠে। এর ফলে বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে। সংখ্যার চাইতেও অর্থনৈতিক অবস্থানের দিক দিয়ে এরা বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছিল। প্রথমদিকে শিল্পে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু ১৮৯০-এর দশক থেকে নানা কারণে বাঙালী শ্রমিকের আনুপাতিক হার কমতে থাকে। বিহার, ওড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় এমনকি মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ সহ দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও শ্রমিকরা বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে জড়ো হতে থাকে।[১] এইভাবে, বাংলার বৃহৎ শিল্পগুলির শ্রমিকশ্রেণী বহু প্রদেশ ধর্ম ও ভাষাভাষী অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

কাজেই বিংশ শতাব্দীতে বাংলার শ্রমিকশ্রেণী বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তার বৃহত্তম অংশই অবাঙালী এবং তাদের মধ্যেও অজস্র গোষ্ঠীগত বিভেদ ছিল। ধর্মীয় বিভাজন তার মধ্যে প্রধানতম। মালিক-শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যেসব অন্তরায়গুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ।

ঘটনাক্রমে, এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে প্রধানতঃ সক্রিয় ছিল মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। তাই, আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কার্যকলাপ নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। প্রসঙ্গত শুধু এইটুকু বলে নেওয়া ভাল যে হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বিদ্যমান ছিল। অনেক সময়

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশও পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কোনো সাধারণ সুপরিকল্পিত চেষ্টা দেখা যায় নি।[২] হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সংগঠনগুলি প্রধানত বাঙালী শিক্ষিত ও সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগঠন বাড়াবার কোনো পরিকল্পনাও তাদের ছিল না।

বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় অবশ্য অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে কোনো monolithic community ছিল না, ছিল বিভিন্ন ধরনের সামাজিক জনগোষ্ঠীর সমষ্টি। কেবল ধর্মের ভিত্তিই তাদের এক ছিল। জাহাজের লস্করদের বাদ দিলে বাংলাদেশের মুসলমান শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল বিহার বা যুক্তপ্রদেশ থেকে আগত উর্দুভাষী শ্রমিক। বাংলাভাষী মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগসূত্র ছিল সামান্য। এই মুসলমান শ্রমিক-মজদুর শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ এবং সম্প্রদায়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ (community conscious) করতে প্রথম এগিয়ে আসেন কলকাতাবাসী ধনী উর্দুভাষী ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই প্রসঙ্গে কলকাতার নাখোদা মসজিদের সঙ্গে যুক্ত Kuchi Memon সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এদের মধ্য থেকেই এসেছিলেন ১৮৯০-এর দশকের চটকল শ্রমিক সংগঠক হাজী নূরমহম্মদ জ্যাকারিয়া। অবাঙ্গালী হিন্দীভাষী হিন্দু শ্রমিক এবং উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে কোরবানী, মসজিদের সামনে ধর্মীয় মিছিল নিয়ে যাবার সময়ে বাজনা বাজান, কারখানার ধর্মীয় পরবে ছুটি দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মতান্তর, সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বহু উদাহরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর বিশ, ত্রিশ এমনকি চল্লিশের দশকেও পাওয়া যায়। বিশেষত যেখানে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক উভয় শ্রেণীর সংখ্যাই প্রায় সমান সমান, সেইখানেই বহুরকম উত্তেজনা ঘটত বেশী। এই সম্প্রদায় চেতনা পরে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনায় উত্তরিত হতে সাহায্য করেছিল, না তার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।[৩]

কলকাতার ধনী উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিক সংগঠকদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের সংযোগসূত্র হিসাবে দুটি শ্রেণীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সর্দাররা। সেই যুগে কলকারখানার সাধারণ মজুরদের উপর সর্দারদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। চাকুরী সংগ্রহ দৈনন্দিন কাজের তদারকী এমনকি বাসস্থান, এমনকি টাকা ধার নিতে হলেও শ্রমিকরা সর্দারদের উপর নির্ভর-

শীল থাকত। সর্দারদের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিলো অনেকটা সামন্ত-তান্ত্রিক।[৪] এই সর্দারদের সাহায্যে সংগঠকরা শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। দ্বিতীয়ত, ছিলেন অর্ধশিক্ষিত মৌলবী, উলেমা প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকের দল। শ্রমিক বস্তী বা বাজারে প্রচারের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ভিতর তাঁরা সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি করতেন।[৫]

## অসহযোগ খিলাফৎ ও শ্রমিকশ্রেণী

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস অনেক পুরণো হলেও, তা প্রথম সার্বিক সাংগঠনিক রূপ পায় ১৯২০-২১ সালে অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকে। খিলাফৎ কর্মীরা সর্দার উলেমাদের সাহায্যে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। লক্ষণীয় যে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু কংগ্রেস কর্মীদের তুলনায় মুসলমান খিলাফৎকর্মীরা শ্রমিক সংগঠনে অনেক বেশী সাফল্য লাভ করেন। খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন উঠে যাবার পর এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে কেবলমাত্র Kankinara Labour Union স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।[৬] এর প্রধান স্থপতি ছিলেন খিলাফৎকর্মী মৌলবী লতাফৎ হুসেন। স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল। পরে ইনি স্বরাজ্য পার্টির সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং নরমপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কে. সি. রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এঁরা উভয়েই বঙ্গীয় আইন পরিষদে মনোনীত শ্রমিক আসনে দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। এই Kankinara Labour Union ব্যারাকপুর মহকুমার চটকল এবং অন্যান্য কলকারখানায় সংগঠন বিস্তার করেছিল। এই ইউনিয়ন ছাড়া, প্রধানত মুসলমান শ্রমিক কাজ করে এই রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন নির্মাণ-কর্মী, গাড়োয়ান, ডক শ্রমিক প্রভৃতির মধ্যে শ্রমিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়।[৭] নেতৃত্বে থাকতেন এক নয় প্রভাবশালী সর্দাররা অথবা ইংরাজী শিক্ষিত সমাজসচেতন অথচ প্রত্যেক রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিবর্গ। উদাহরণ হিসাবে, Indian Seamen's Union-এর নেতা মহঃ দাউদের নাম করা যেতে পারে।[৮]

## ১৯২৭—৩৭

অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলনে শ্রমিকরা সাগ্রহে অংশ নিয়েছিল নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এই কল্পনাতে। কাজেই, এই

আন্দোলনের ব্যর্থতার পর শ্রমিকরা সাধারণভাবে আন্দোলনমুখী রাজনীতি-বিদ্‌দের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল। এই আন্দোলনের আকস্মিক সমাপ্তির পর দেশে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে, মুস্লিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জংগী আন্দোলনের চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও সফল হয়নি। বিশের দশকের মধ্যভাগে উত্তর ভারতের Tanzeem এবং Tabligh আন্দোলনের অনুকরণে বাংলার মুসলমান শ্রমিকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা হলে তা ব্যর্থ হয়।[৯] এই সময়ে মুসলমান শ্রমিক সংগঠকরা সাংবিধানিক ও আপোষ-কামী পন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৭-২৮ সাল থেকে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে আবার ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। ১৯২৯ সালের প্রথম সাধারণ চটকজ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে চরম রূপ পায়। কিন্তু Kankinara Labour Union এই ধর্মঘট সমর্থন করে নি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমান শ্রমিক সংগঠকরা শ্রমিকদের জঙ্গী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। স্বভাবতই, তাদের এই ভূমিকা মালিকশ্রেণী ও সরকারের সাহায্যে এসেছিল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং আপোষপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের এই বিচিত্র যোগসূত্র বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন সূচনা করেছিল যার প্রভাব পরবর্তী প্রায় বিশ বছর বজায় ছিল। Kankinara Labour Union-এর উদ্যোগে এবং সরকারী শ্রম দপ্তরও মালিকদের সক্রিয় সাহায্যে ১৯২৯ সালের মে মাসে প্রথম Bengal Labour Conference জগদ্দলে অনুষ্ঠিত হয়।[১০] এরপর থেকে দীর্ঘকাল প্রায় প্রতি বৎসর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এই সম্মেলনের মধ্য থেকে কোনো সাম্প্রদায়িক শ্লোগান শোনা যেত না, যদিও সংগঠকরা অধিকাংশই সম্প্রদায়-বাদের উপর ভিত্তি করেই তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম চালাতেন। সম্মেলনের প্রস্তাবে সর্বদাই শিল্পে শান্তিরক্ষা, ধর্মঘটের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি, বেতন ও কাজকর্ম সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ার্কস কমিটি গঠন প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হত। এই পর্বেই শ্রমিকনেতা হিসাবে এইচ. এস. সুরাবর্দীর প্রথম উত্থান।[১১] ১৯৩৪ সালে কলিকাতা ডক শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট ভাঙতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিভেদপন্থীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। জাহাজী ও বন্দরকর্মী ছাড়াও, সুরাবর্দী চটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও অন্যান্য কলকারখানায় মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে সুরাবর্দী সংগঠন বাড়াতে থাকেন।

শ্রমিক আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাসে পরবর্তী দিকচিহ্ন রচিত হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বিশেষত এই আইন অনুযায়ী, সর্বপ্রথম শ্রমিক কেন্দ্র থেকে সরাসরি নির্বাচনী প্রথা চালু হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। কিন্তু বাঙলাদেশে লীগ প্রজাপার্টি কোয়ালিশন স্থাপিত হয়। কংগেস (যার মধ্যে তখন বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী সহ অন্যান্য অসংখ্য বিপ্লবী দল-উপদলের কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বাংলার আইন-সভায় বিরোধী আসন গ্রহণ করে। একদিকে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগে ক্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবল বিক্ষোভ, অন্যদিকে সরকার বিরোধী বামপন্থী সচেতন রাজনৈতিক শক্তির শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস এই দুয়ের প্রভাবে এই সময়ে সর্বত্র ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট এর চরম উদাহরণ। এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হলেও প্রাদেশিক সরকার এর থেকে শিক্ষা নিতে ভুল করে নি। সুরাবর্দী নতুন সরকারের শ্রমমন্ত্রী ও মুশ্লিম লীগ দলের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই জঙ্গী আন্দোলন সুকৌশলে প্রতিরোধ করার কাজে নেমে পড়েন।

মন্ত্রী হবার আগেই সুরাবর্দী সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইগুলিকে একত্রে Bengal National Chamber of Labour (সংক্ষেপে বি. এন. সি. এল) নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে মুশ্লীম লীগ দলের কোনো শাখা ছিল না। কিন্তু লতাফৎ হোসেন, সাকাতুল্লা খান, আবদুল জব্বর সোলেমান, সিকান্দর মীর প্রভৃতি বহু তৎপর উৎসাহী এবং ব্যক্তিগতভাবে সুরাবর্দীর প্রতি অনুগত মুশ্লিম লীগ কর্মী এই সংগঠনের কর্মকর্তা ও সংগঠক ছিলেন। সুরাবর্দী নিজে আর্থিক ও অন্যান্য সর্বতোভাবে এই সংগঠনকে সাহায্য করতেন। পোর্ট ও ডক, চটকল, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ট্রামওয়েস কোম্পানী, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা—সর্বত্র প্রায় রাতারাতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাল্টা ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। তৎ-কালীন যুগে এগুলি সাধারণভাবে white unions বলে পরিচিত ছিল। এদের সদস্যসংখ্যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল যৎসামান্য, কিন্তু তাহলেও এরা

দ্রুত মালিকদের ও সরকারী শ্রম দপ্তরের স্বীকৃতি লাভ করে। মুসলমান শ্রমিকদের কাছে সুকৌশলে প্রচার চালান হয় যে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দলগুলি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুশ্লিম সরকারকে অপদস্থ ও বিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তারা, শ্রমিকদের আন্দোলনে প্ররোচিত করেছে। 'ইসলাম বিপন্ন' এই জিগির সাধারণ অশিক্ষিত অথচ ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল।[১৩] কিন্তু এই সব প্রচার চলত পরোক্ষভাবে।

প্রকাশ্য বিবৃতিতে সুরাবর্দী স্বয়ং বা বি. এ. সি. এলের কর্মকর্তারা সাধারণত সাম্প্রদায়িকতার কথা এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা গুরুত্ব দিতেন জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন বনাম গঠনমূলক শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নটিতে। এঁদের বক্তব্য ছিল যে 'Red Union' গুলি প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নই নয়, রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংস করার জন্য অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।[১৪] শ্রমিকদের কোনো মঙ্গল তা থেকে হতে পারে না। কাজেই' ধর্মনির্বিশেষে শ্রমিকদের উচিত বিকল্প ইউনিয়নে যোগ দেওয়া। তাছাড়া, আরো প্রচার করা হয় যে পূর্ববর্তী সরকার শ্রমবিরোধ মীমাংসার জন্য সাধারণত কোনও হস্তক্ষেপ করতেন না। এদের নীতি ছিল—'শ্রমিক ও মালিকরা নিজেদের মধ্যে তা মিটিয়ে নিক যার প্রকৃত অর্থ হল শক্তিশালী মালিকদের কাছে শ্রমিকের নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ। পক্ষান্তরে, নতুন সরকারের নীতি হল মীমাংসার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী সরকার যেখানে যেকোন রকম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেরই বিরোধী ছিল, সেখানে বর্তমান সরকার 'প্রকৃত' (general or bonafide) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে সক্রিয় সমর্থন জানাবে, এই সব বিবৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বিশের দশকের শেষ থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও আপোষমূলক শ্রমিক আন্দোলনে যে যোগসূত্র রচিত হয়েছিল, নূতন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ধারাটিই পুষ্টিলাভ করে। Labour Welfare Fund নামে একটি খাতে প্রতি বছর শ্রম দপ্তর, একটি মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করত। শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা, বীমা প্রকল্প, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি গঠনমূলক কাজের জন্য স্বীকৃত-ইউনিয়নগুলির মধ্যে এই অর্থ বরাদ্দ করা হত। আইনসভায় বিরোধী পক্ষের থেকে এই মর্মে বহুবার অভিযোগ করা হয় যে এই অর্থ কেবলমাত্র বি. এন. সি. এল. ইউনিয়নগুলিই পেত এবং তাদের কর্মীদের

ভাতা হিসাবে ব্যবহার করত। অর্থাৎ, সরকারী অর্থ দ্বারা পরোক্ষভাবে এই ইউনিয়নগুলি লালিত-পালিত হত [১৫]

যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে একটা সময়ে বি. এন. সি. এল. শ্রমিকদের, বিশেষত মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে আইনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তার প্রতিবাদে আইনসভা অভিমুখে যে বিশাল শ্রমিক মিছিল সংগঠিত হয়েছিল তা থেকে এর কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়[১৬] ১৯৩৮-৪০ সালের মধ্যে কতকক্ষেত্রে এইসব White Unions গুলির পক্ষ থেকে দাবী সনদ মালিকদের কাছে পেশ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির দ্বারা কিছু দাবী মেনেও নেওয়া হয় এবং এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে white unions ই পারে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করতে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে বিধানসভায় এক ভাষণে সুরাবর্দী ঘোষণা করেন যে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক বিভাজনের বিরোধী।[১৭] যদি সরকার সমর্থক ইউনিয়নগুলিতে ঘটনাচক্রে মুশ্লিম শ্রমিকরা সংখ্যাধিক্য হয়, তার একমাত্র কারণ সাধারণভাবে মুসলমান শ্রমিকরাগঠনমূলক ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থক। যখন হিন্দু শ্রমিকরা তথাকথিত জঙ্গী শ্রমিক নেতাদের প্রভাবমুক্ত হবে, তখন তারাও বিপুলসংখ্যায় এই সব ইউনিয়নে যোগ দেবে। সুরাবর্দী পাল্টা অভিযোগ তোলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতারা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের আশ্রয় নিয়ে তাঁদের সংগঠন চালু রাখছেন। বি. এন. সি. এলের সংগঠকদের মধ্যে কে. সি. রায়চৌধুরী ছাড়াও কাঁকিনারার সিংহেশ্বর প্রসাদ, বজবজের নানকচাঁদ ধূসিয়া রিষড়ার রামমোহন উপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কর্মীর নাম পাওয়া যায়।

১৯৩৭-৪১, এই পর্বে একদিকে গোপনে সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা এবং প্রকাশ্যে এক অসাম্প্রদায়িক, উদার, আপোষকামী শ্রমিক সংগঠনের ভাবমূর্তি তৈরী করা—এই আপাতঃবিরোধী কৌশলের পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য ছিল একটিই। তা হল বাংলার রাজনীতিতে মুশ্লিম লীগের প্রাধান্য এবং মুশ্লিম লীগের মধ্যে সুরাবর্দীর ব্যক্তিগত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই শ্রমনীতি উভয়ক্ষেত্রেই সুরাবর্দীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।[১৮] উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত আবেদন কাজে লাগিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে তিনি একটি 'base' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ ধর্মঘটের পর চটকলে

দীর্ঘদিন যে কোনো বড় আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি, তার একটি প্রধান কারণ হল যে চটকল শ্রমিকের একটি বড় অংশ যারা উর্দুভাষী মুসলমান তারা কিছুতেই এতে যোগদান করত না। অন্যান্য মুসলমান শ্রমিক-প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর উপর এই আধিপত্য লীগ-প্রজা কোয়ালিশনকে শক্তিশালী করেছিল কেননা এর বিরুদ্ধে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সার্বিক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। আবার, উর্দুভাষী মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষত শ্রমিকদের উপর ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা বাংলার মুশ্লিম রাজনীতির অভ্যন্তরে সুরাবর্দী তার অপর দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালী মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নেতা ফজলুল হক এবং অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে শক্তিসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) শুরু হবার পরে যুদ্ধকালীন বিশেষ ক্ষমতা সরকারের শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তিতে কঠোরতর ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছিল।[১৯] ধর্মঘট, শ্রমিক সমাবেশ, মিছিল এমনকি সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম বহুক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হয়। বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গ্রেফতার বা অন্তরীন হন। কোনো বিকল্প ইউনিয়ন না থাকার পুরো সুযোগ বি. এন. সি. এল ইউনিয়নগুলি গ্রহণ করতে পেরেছিল। ১৯৪০ সালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে শ্রমিক আসন দুটি থেকে এই ইউনিয়ন প্রার্থীদের সাফল্য সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

### ১৯৪১-৪৬

কিন্তু আপাতঃসাফল্য সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রচারের উপর ভিত্তি করে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে লীগ প্রজা মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট এক নতুন সরকার গঠিত হয়।[২১] বি. এন. সি. এল. ইউনিয়নগুলির সামনে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি দেখা দেয়। সুরাবর্দী বিরোধী দলের আসনে বসলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে নতুন সরকারকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে তার ইউনিয়ন কোন জঙ্গী আন্দোলনে নামে নি। তারা সাংবিধানিক ও আপোষমূলক আন্দোলনের পথই ধরেছিল। এটা কতটা আদর্শগত কারণে ও কতটা বাধ্য হয়ে তা বলা কঠিন। কেননা যেসব

মালিক সমর্থক শক্তির উপর ভর করে এই White Unions গড়ে তোলা হয়েছিল, তাদের পক্ষে চট করে আন্দোলনের কার্যসূচী নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, যুদ্ধের সময়ে যাতে যুদ্ধ প্রস্তুতি কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়, তাই শিল্পে শান্তি রক্ষা করতে মুশ্লিম লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার যে চেষ্টা রায়বাদীরা শুরু করেছিলেন, বি. এন. সি. এল. তাতে সামিল হয়। বাংলাদেশে রায়বাদী ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার-এর সংগে একত্রে বি. এন. সি. এল. কাজ শুরু করে। যদিও, তথাকথিত ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন জানান ছাড়া দুটির মধ্যে আদর্শগত তেমন কোনো মিল ছিল না। অবশ্য, দুটি ইউনিয়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য হল যে উভয়েই সরকারের দাক্ষিণ্য নির্ভর হয়ে গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৩ সালে হক সরকারের পতনের পর আবার মুশ্লিম লীগ সরকার গঠিত হয় খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে। সুরাবর্দীকে এই সরকারের অপর এক দপ্তর দেওয়া হয়। শ্রম দপ্তর ·।ান নাজিমুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সাহাবুদ্দীন। এই সরকারের শ্রমনীতির সঙ্গে সুরাবর্দী অনুসৃত ১৯৩৭-৪১ সালের সরকারী শ্রমনীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। এই সরকার শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আডজুডিকেশন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল।[২২] এই পর্বে White Union-গুলির উপর সরকারী নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুরাবর্দী নিজেও বি. এন. সি. এল. ইউনিয়ন-গুলির প্রতি আগে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতেন তা অনেকটা কমে যায়। অবশ্য, তখনও বি. এন. সি. এলের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ব্যারাকপুর এই চারটি শিল্প শ্রমিক কেন্দ্রে বি. এন. সি. এল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং নির্বাচনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তারা অবতীর্ণ হয়। যদিও এই নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট প্রার্থীদের মধ্যে এবং সর্বত্রই কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়, তাহলেও যে চারটি আসনে বি. এন. সি. এল. প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তার মধ্যে দুটি আসনে মোট ভোটের ৭ ও ১০ শতাংশ তারা পেয়েছিল।[২৩] এর থেকে অনুমান

করা যায় যে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্য ছাড়াও, বি. এন. সি. এল. তার একটা ভিত্তি শ্রমিকদের মধ্যে স্থাপন করতে পেরেছিল। নির্বাচনের পর স্বয়ং সুরাবর্দীর নেতৃত্বে নতুন লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। নাজিমুদ্দীন সরকার অনুসৃত শ্রমনীতির সঙ্গে এই আমলে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। অনুগত ইউনিয়নের উপর নির্ভর করার চাইতে এই সরকারও নিয়মতান্ত্রিক ও আমলা-নির্ভর পদ্ধতিতেই শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিতে আগ্রহী ছিলেন।

## সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা (১৯৪৬-৪৭) ও শ্রমিকশ্রেণী

১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার রাজনীতিতে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ছিল সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব। ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে মুস্লিম লীগ আহূত Direct Action Day-কে কেন্দ্র করে প্রথমে কলকাতায় ও পরে অন্যান্য অঞ্চলে যে হিংসা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তা পুরণো সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েজিল। বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চলের ঘিঞ্জী বস্তিগুলি স্বভাবতই তা থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বে একটি রূপালী আভা ছিল। তা হল যে সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও একই কারখানার হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক একে অপরের বুকে ছুরি বসাতে যায় নি। বরঞ্চ এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া গেছে যেখানে বাইরের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে পরস্পরকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। নিরন্তর সাম্প্রদায়িক প্রচার ও উত্তেজনার মধ্যে এটা শ্রমিকদের কম কৃতিত্ব নয়। সম্ভবত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলার সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ততদিনে এটা বুঝেছিল যে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ কোনো সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরই মঙ্গলসাধন করতে পারে না। স্বভাবতই, শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐক্য শ্রমিকবিরোধীরা ভালো চোখে দেখে নি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে বেশ কিছুকাল জনজীবন স্তব্ধ থাকায় বহু কলকারখানা বন্ধ থাকে। শ্রমিকরা মজুরী হারিয়ে দারুন অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তদুপরি, অনেকে দাঙ্গাহাঙ্গামার নিজেদের ঘরবাড়ী, জিনিষপত্র হারিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঠিক এই সময়ে অনেক কলকারখানার মালিক বাড়তি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের নাম করে বেছে বেছে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করতে থাকে। যাতে এর ফলে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।[২৪] এতসব প্ররোচনা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে বাংলাদেশে কেবল একটি শ্রেণীই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থেকে নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত

রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সেটি হল এই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী। এই পরিস্থিতিতে বি. এন. সি. এল. যা ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকেই ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার সমস্ত রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে এটি ইণ্ডিয়ান ফেডেরেশন অফ লেবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য, শেষোক্ত সংগঠনটিও নিজেই তখন পতনোম্মুখ।

## উপসংহার

সাম্প্রদায়িকতাবাদ আশ্রয়ী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, কোনো শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী বাদ দিয়ে শাসক দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে কিংবা তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবারের অস্তিত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রধানত তিনটি স্তম্ভের উপর সরকারী আনুকূল্য, মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাম্প্রদায়িক প্রচার। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটিরই অবসান ঘটে। মুশ্লিম লীগ সরকারের স্থলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সমর্থক ইউনিয়নগুলি A. I. T. U. C থেকে বেরিয়ে এসে I. N. T. U. C প্রতিষ্ঠা করে যার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের জঙ্গী আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে সাংবিধানিক ও আপোষমূলক পথে চালনা করা। বলা বাহুল্য, সরকারী আনুকূল্য এবং মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা এদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। সর্বোপরি, অবিভক্ত বাংলার শিল্পাঞ্চলগুলি প্রধানত পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। বি. এন. সি. এলের অধিকাংশ সংগঠক, যাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন মুশ্লিম লীগের কর্মী, চলে যান পূর্ববঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পরে উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিকদের একটা বৃহদংশ কলকাতা ত্যাগ করেন এবং বাঙালী মুসলমান শ্রমিকরা (প্রধানত জাহাজী লস্কর) পূর্ববঙ্গে ফিরে যান। যেসব মুসলমান শ্রমিক, বাঙালী বা অবাঙালী, বাংলায় থেকে যান, নিরাপত্তার জন্য প্রধানত শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনকে অবলম্বন করেন।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনে সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক রাজনীতির অবসান ঘটে। তবে একথা মনে করা ভুল যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল, তা অত সহজে ও দ্রুত সম্পূর্ণ নির্মূল হতে পারে। প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির

অবসান ঘটলেও, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিও শ্রমিকদের মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের পরোক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছিল। মালিকশ্রেণীও শ্রমিকদের ঐক্য বিনষ্ট করতে অনেক সময়ে এই সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দিয়েছে।

## BIBLIOGRAPHY


1. Report on Labour in Bengal by B. Foley (1906) Dasgupta, Ranjit—Factory Labour in Eastern India : Sources of Supply, 1885-1946 : Some Preliminary Findings (Indian Economic and Social History Review. Vol. XIII No. 3).
2. Chakravorty, Dipesh—Communal Riots and Labour. Bengal's Jute Mill Hands in the 1980's. (C.S.S.S.C Occasional Paper No. II)
3. Chakraborty, Dipesh—Communal Riots and Labour : Bengal s Jute Mill Hands in the 1930's (C.S.S.S.C. Occasional Paper No. II) ; Dasgupta, Ranjit—Material Conditicns and Behavioural Aspects of Calcutta Working Class, 1875-1899 (C.S.S.S.C. Occasional Poper No. 22) ; Chakraborty, Dipesh and Dasgupta Ranjit—Some Aspects of Labour History of Bengal in the 19th Century : Two views (C.S.S.S.C, Occasional Paper No. 40)
4. Chakraborty, Dipesh—Conditions for knowledge of Working Class conditions : Employers. Government and the Jute Workers of Calcutta, 1890-1941 in Guha R (ed) Subaltern Studies Vol II (1983)
5. De, Amalendu—Role of the Ueemas in Bengal Muslim Politics, 1936-47 (Quarterly Review of Historical Studies)
6. Mcpherson Kenneth—The Muslims of Calcutta, 1918-35 (Ph. D. Thesis, Australian National University, 1972) pp. 73-74, 94.
7. Royal Commission on Labour in India (1929) Vol V, Part I (Evidence) P. 271
8. Meyrs, C. A. - Labour Problems in the Industrialisation of India (1958) P. 57.

9. Mcpherson, K—op. cet, P. 89.
10. All India Trade Union Bulletin—June, 1929.
11. Kamal. Kazi Ahmed—Politicians and Inside Stories (Dacca, 1970)
12. Ahmed, Kamaruddin—Labour Movement in East Pakistan (Dacca. 1969) p. 25.
23. Amrita Bazar Patrika—9. 8. 38 ; Advance—9. 8. 38.
14. A. B. Patrika—12. 4, 37 ; 19. 4. 37 ; 26. 4. 37 ; 6. 5. 37 ; 19. 10. 37.
Intelligence Branch—File No. 506/38, Reports dt. 8. 4, 9. 4, 4. 5. 38.
15. Go. B Commerce Dept. File No. 2Q-18 Progs B 269-71, May. 1939.
A. B. Patrika—2. 5. 39, 9. 7. 39.
16. Star of India—18. 3. 39 ; also Special Branch, Calcutta F. No. 516/38—Report dt 15. 8. 38.
17. Star of India—18. 3. 39.
18. Sen, Shila—Muslim Politics in Bengal (1937-47) Pp 106-8
19. Go B, Commerce Dept. File No. 111-21, Progs B 1141, Dec. 1939.
20. A. B. Patrika—15. 2. 40. 17. 2. 40.
21. Brief Summary of Political Events in the Province of Bengal, Govt. of Bengal, 1940.
22. A. B. Patrika 26. 7. 43.
23. Name of the B. N. C. L candidates and votes polled by them.
a. Calcutta Suburbs (Registered Factories)
Wajjid Hasan—4,635 (approx 7 p.c) of total valid votes
b. Barrackpore (Registered Factories)
Md. Sulaiman—373
c. Howrah (Registered Factories)
Mir Khurshid Ali—4,557 (approx. 10 p.c. of total valid votes polled)
d. Hooghly-Serampore (Registed Factories)
Radha Raman Lall—700
(Source—A. B. Patrika—Mar. 24-29, 1946)
24. A. B. Patrika—3. 9. 46 ; Peoples Age—20. 10. 46.

# বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম মহিলা সংগঠকরা—কিছু প্রশ্ন

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বাংলাদেশে খুব পুরোণো নয়। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই প্রথম দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, তাদেরও দাবী দাওয়া থাকতে পারে এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হচ্ছে। চিন্তা শুরু হচ্ছে শিক্ষিত সংস্কারধর্মী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মনে চিন্তা শুরু হচ্ছে কিছু কিছু অসংগঠিত শ্রমিকদের মনেও।

সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে বাংলাদেশে গোড়ার দিকে এগিয়ে আসেন যুব বাংলা গোষ্ঠী বা ডিরোজিওর শিষ্যরা। একাজে পরে ব্রতী হন ব্রাহ্ম সমাজের তরুণরাও। ব্রাহ্মমতাবলম্বী কিছু মানুষের মনেই প্রথম শ্রমিক, মজুরদের উন্নতির চিন্তা আসে। তাদের চিন্তাধারাকে উদারনৈতিক মানবতাবাদী চিন্তাধারা বলা যায়। কেশব সেন তাঁর **সুলভ সমাচার** কাগজে এবং শশীপদ ব্যানার্জী **ভারত শ্রমজীবি** কাগজে বার বার শ্রমিক কল্যাণ, তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি, মদ না খাওয়া, নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা এসব কথাই লিখেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা সংগ্রাম করা এসব চিন্তা তাঁরা করেন নি।[১]

কিন্তু ১৮৬২-তে হাওড়ায় ১২০০ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে।[২]

শিবনাথ শাস্ত্রী ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনের কথা বলেন বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিলেত ঘুরে আসার পর।

১৯২০ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম হয়। এই সময় থেকেই জাতীয় আন্দোলনের কোন কোন নেতা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ কর্ম করা, তাদের সংগঠিত করা এবং বিশেষ করে ইংরেজবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে তাদের শামিল করার কথা ভাবেন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি হলেন লালা লাজপৎ রায়।[৩]

এই বিশের দশকের গোড়ার দিকে সন্তোষকুমারী দেবী এবং এই দশকের শেষাশেষি প্রভাবতী দাশগুপ্ত এই দুই মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করতে আসেন। এ সময় খুব কম পুরুষই শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করতে এসেছেন তো মেয়েরা! সন্তোষকুমারীকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি ছাড়া আর কোন মহিলা এসময় একাজে এসেছিলেন কি? উত্তেজিত সন্তোষকুমারী উত্তর দিয়েছিলেন 'মর্দানা নেহি মিলা, জেনানা কাঁহাসে মিলেগি?''[৪]

বিশের দশক থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে যাদের নাম আমরা বিশেষভাবে পাই তাঁরা হলেন সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায় প্রমুখ। এঁরা কাজ করেছেন চটকল শ্রমিকদের মধ্যে, বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে, এবং ধাঙড়, জমাদারদের মধ্যে। এরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা। দরিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রমিকদের মধ্যে এরা কাজ করতে এসেছেন জাতীয় আন্দোলনের তাগিদে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কারণে, না প্রধানত মানবতাবোধ থেকে?

সান্তোষকুমারী দেবী প্রথম থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রেঙ্গুনে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। সেখানে থাকতেই তিনি সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যা হয়েছিলেন, ১৯২১ সালের আমেদাবাদ পৌঁছান। এই সময়ই তিনি একদিকে মহাত্মা গান্ধী অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন, এবং স্থায়ীভাবে কলকাতা চলে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন শ্রমিকদের মধ্যে।[৫]

ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্ত সেন্ট পল্‌স্ কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে মনোবিজ্ঞানে এম. এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উচ্চ-শিক্ষার্থে বৃত্তি নিয়ে বিদেশ যান এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। সম্ভবত জার্মানীতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গে এম. এন. রায় ও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, এবং সম্ভবত তাঁদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন।[৬]

প্রভাবতীর মা মোহিনী দেবী কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে বাড়িতে নানান রাজনৈতিক দলের লোকজন আসতেন, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চলত।[৭] এই আলোচনায় আসতেন ডঃ ভূপেন দত্ত,

মাখন সেন, ভূপতি মজুমদার, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ। প্রভাবতী দেবী রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় হলেও প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তবে যে কবছর শ্রমিক আন্দোলনের কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন ততদিন তিনি প্রধানত কাজ করেছেন ধরণী গোস্বামী, মুজফফর আহমদ, মণি সিংহ বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখদের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থক। প্রভাবতী দেবী কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েই শ্রমিক আন্দোলন করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, এবং সবচেয়ে নির্যাতিত এবং এক অর্থে সমাজের সবচেয়ে নীচুতলার মানুষ জমাদার ঝাড়ুদারদের সংঠিত করে আন্দোলনের কাজেই তিনি এগিয়ে এলেন। মণি সিংহ বলেছেন "প্রভাবতী দাশগুপ্তা কমিউনিস্ট ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল নেত্রী।"[৮] অবশ্য জাতীর আন্দোলনের কোন ধারার সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন না।

সাকিনা বেগম. ডঃ মৈত্রেয়ী বসু এবং সুধা রায় ত্রিশের দশকে এরা আসছেন শ্রমিক আন্দোলনে। এদের মধ্যে সুধা যায় প্রথমে লেবার পার্টি ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ডঃ মৈত্রেয়ী বসু উচ্চশিক্ষার্থে জার্মানী যান। হিটলারের ক্ষমতা দখলের যুগে তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েই কাজকর্ম শুরু করেন। বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে তিনি কাজ করেন। মূলত মানবতাবোধ এবং তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের শ্রমিক সংগঠনের প্রচেষ্টা থেকেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনে আসেন।[৯]

সাকিনা বেগমের বাবা পারস্যের একজন সশস্ত্র বিপ্লবী। পালিয়ে আসেন ভারতবর্ষে। সাকিনা বেগমও বাবার বিপ্লবী চিন্তা ও সাহস দ্বারা প্রভাবিত হন। সাকিনা বেগমের বিয়ে হয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তিনি রংপুরে কমিশনার ছিলেন। সাকিনার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হওয়ায় সাকিনা কলকাতায় আসেন। কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কোনদিনই যুক্ত হননি। রাজনীতিতে কমিউনিস্টদেরই কাছাকাছি ছিলেন। অবশ্য দলীয় সদস্যা কোনদিন ছিলেন না। তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৪০-এ ধাঙড় ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। ধর্মঘট সমস্ত কলকাতাকে অচল করে দেয়, সাকিনা বেগম খুবই জনপ্রিয় নেত্রীতে পরিণত হন। তখনকার মেয়র এ. আর. সিদ্দিকীর অনুরোধে তৎকালীন সরকার

বেগমকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। সাকিনা কিছু কালের জন্য কার্শিয়াং চলে যান। দীর্ঘদিন তিনিও আন্দোলনের সংগে যুক্ত থাকেন নি।[১০]

শ্রমিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত এই মহিলা নেত্রীদের কাজকর্মের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় এবং তা করতে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে বিশের দশক থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এরা যেভাবে আন্দোলনে এসেছেন বা কাজকর্ম করেছেন তাতেই অনেকগুলো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন মনে জাগে।

প্রথমত, এঁদের লেখায় বা সাক্ষাৎকারে বা এঁদের সমসাময়িক জীবিত ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎকারে কোথাও এটা স্পষ্ট নয় যে এরা কোন শ্রমিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলেন। পথটা খুব সহজ নয়, শ্রমিক আন্দোলনে দীর্ঘ ইতিহাসও এদেশে নেই, তদুপরি মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালী মেয়ে নেই বললেই বলে। সন্তোষকুমারী তো বলেইছেন যে আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে আসি।[১১]

আসলে শ্রমিকরা নির্যাতিত, তাদের কোন সংগঠন নেই, বিশেষ কোন আন্দোলন নেই (কৃষক সংগঠন, কৃষক আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনেক পুরোনো) সম্ভবত কোন বিশেষ রাজনীতিও নেই, সুতরাং এখানে মেয়েরা গেলে তাদের পক্ষে কাজ করা সুবিধা হতে পারে। সন্তোষকুমারী শ্রমিকদের কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে এসে জাতীয় আন্দোলনের অংগীভূত করার চেষ্টা করে গেছেন। মানবতাবোধ থেকে শ্রমিক আন্দোলন করতে এসে এরা আন্দোলনকে হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত করেছেন তা অনেক সময় ব্যক্তিগত আন্দোলন হিসেবেও পরিচালিত করতে চেয়েছেন। তার থেকে নানান সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

একটা প্রশংসনীয় দিক এরা প্রত্যেকে শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন বা সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন। **গৌরীপুর শ্রমিক সমিতি** নাম দিয়ে সন্তোষকুমারী গৌরীপুর চটকল শ্রমিকদের নিয়ে এক সমিতি করেন। কার্নিকের **স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়াতে** বলা আছে "১৯২১-২২এ বাংলাদেশে এক চটকলেই ধর্মঘট হয় ৭৯ বার।···গৌরীপুরের ধর্মঘট তিন মাস ধরে চলে।···ধর্মঘটের শেষে গৌরীপুরেই সবচেয়ে ভাল কাজের অবস্থা ও ভাল মাইনে দেবার কথা ঘোষণা করা হল।"[১২]

শুধু গৌরীপুর নয় কাঁকিনাড়া থেকে বজবজ পর্যন্ত বিভিন্ন চটকলের শ্রমিকদের সংগঠনের সংগে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন এবং তাদের জন্য

আন্দোলন করেছেন। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, কাজের সুযোগ সুবিধে, ভাল বাসস্থান, লেখাপড়ার সুযোগ, মেয়েদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা—এসবই ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।[১৩] প্রভাবতী দাশগুপ্তা দি স্কাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল-এর প্রেসিডেণ্ট ছেলেন।[১৪] কলকাতার বিখ্যাত ঝাড়ুদার ধর্মঘটের তিনি ছিলেন অন্যতম এক নেত্রী। এর পর ১৯২৯-এর চটকল সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন প্রভাবতী দাশগুপ্তা। জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নেরও তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

এ দুটো ধর্মঘটই ভিন্ন ভিন্নভাবে তখনকার রাজনীতিতে দাগ রেখে গেছে। চটকলের সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে রয়াল কমিশন অব লেবারের কাছে বাংলা সরকার এক বিবৃতিতে বলে "এই চটকল ধর্মঘটগুলি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। একটা হচ্ছে এদের বিশালতা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও সাধারণ ধর্মঘট গোছের কিছু সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়নি। ১লা জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্বসমেত ২,৭২,০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘট করে।"[১৫]

এই সব ধর্মঘট চলাকালে প্রভাবতী দেবী শুধু সভা সমিতিতে বক্তৃতাই করেন নি, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছেন, ধর্মঘটী পরিবারগুলোতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বাইরের আক্রমণে বুখে দাঁড়িয়েছেন—সাহসের কোন অভাব ছিল না।

তবে যেটা এরা কেউ ভাবেন নি তা হল শ্রমিকদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব তৈরী করার কথা। এই দুই নেত্রীর শ্রমিকদের মায়ের মত হয়ে তাদের ভালর জন্য চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, নেতৃত্ব তাদেরই হাতে। আবার বাইরে থেকে অন্য নেতৃত্ব এলেও তার সঙ্গে বিরোধ বেধেছে। সে যুগেই মেয়েরা একাজে আসেইনি তাই এদের মত যে দু-এক জন এসেছেন তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আমিত্ব(ego)বোধটা প্রবল ছিল। তাই দেখা গেছে কাজ করতে গিয়ে নেতৃত্বের অন্যান্যদের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে ক্রমশ এরা কাজ থেকেই সরে এসেছেন। বিশ শতকের বিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে এই দুই নেত্রীর নাম মুখে মুখে ফিরত, এর পর শ্রমিক আন্দোলন উত্তাল হল কিন্তু এদের নাম আর পরের দশকেই শোনা গেল না। এ সরে যাবার কারণ সম্ভবত সাংসারিক অসুবিধা বা শ্রমিক আন্দোলনে অনিচ্ছা থেকে নয়, একেবারে ব্যক্তিগতভাবে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য।

রাজনীতিগত পরিবর্তনও এদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনেছে।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব তখন অন্য অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও এসেছে। এ শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের কারুর কারুর মনে নতুন চিন্তাও আসছে। সন্তোষকুমারী দেবী মনে করতেন শ্রমিক আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে থেকে, নিয়মতান্ত্রিক পথে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করুক। আর সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাদের জন্য মাইনে বৃদ্ধি, থাকা খাওয়ার সুযোগ সুবিধা, এসব করা যাবে।

প্রভাবতী দেবীও এরকমই ভাবতেন—দাবী দাওয়া গুছিয়ে লিখে মালিক পক্ষকে দিতে হবে এবং দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘটও করতে হবে। কিন্তু মালিক শ্রমিক সংঘর্ষ যে অনিবার্য এবং শ্রমিককে যে তার জন্য তৈরী হতে হবে, এভাবে তারা ভাবেন নি। তাই দৃষ্টিভঙ্গীরও বিরোধ হয়েছে। ক্রমশ সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্রও পাল্টাতে শুরু করেছে—সম্ভবত এই পরিবর্তনের সঙ্গে এরা সঙ্গতি রাখতে পারেন নি।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুই নেত্রীই শ্রমিক আন্দোলনে যাঁদের সহকর্মী হিসেবে পেয়েছেন এবং যাঁদের সঙ্গে কাজ করে খুশী হয়েছেন তাঁরা কিন্তু অনেকেই এই নতুন চিন্তার মানুষ।

সন্তোষকুমারী কাজ করেছেন বঙ্কিম মুখার্জী, কালিদাস ভট্টাচার্যর সঙ্গে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট এম. পি শাপুরজী শাকলাতওয়ালা এদেশে এসে তাঁকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মধ্যে গেছেন, তাঁর সঙ্গে বক্তৃতা করেছেন, তাঁকে কমিউনিস্ট জেনেও।

আবার প্রভাবতী কি ঝাড়ুদার আন্দোলনে, কি চটকল ধর্মঘটে কাজ করেছেন মুজাফফর আহমদ, ধরণী গোস্বামী, আব্দুল হালিম, মণি সিং প্রমুখদের সঙ্গে। এরা সবাই হয় তখন না হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন। কিন্তু এই মতাদর্শের সঙ্গেই এরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারলেন না।

তবে সন্তোষকুমারী আজীবন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিক কল্যাণের জন্য শ্রমিক নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছেন। নানান পত্র পত্রিকায় তিনি শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে লিখেছেন—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র ছিল। তাই তিনি লিখেছেন "এই সহস্র বছরের নিপীড়িত, অবনমিত শ্রেণীর উন্নতি করতে হলে বর্তমান সমাজের বহু নিয়ম কানুনের ধ্বংস সাধন করতে হবে, নতুন নিয়ম তৈরী করতে হবে সমাজকে নূতন

আদর্শানুযায়ী নবভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে।...প্রত্যেক শ্রেণীকেই তাদের বিভিন্ন ধারানুযায়ী চিত্তবিকাশ করতে সুযোগ দিতে হবে।[১৬]

আবার অন্য একটি লেখায় তিনি বলছেন, "বর্তমান শ্রমিক সম্প্রদায়কে ছলেবলে চাপিয়া দাবিয়া রাখিবার জন্য ধনী কলওয়ালাদের পৃথিবীব্যাপী যে বিরাট আয়োজন চলিতেছে তাহার পরিচয় আজ আর কোথায়ও অপ্রকাশ নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ হওয়া নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত হইলেও আদৌ অস্বাভাবিক নয়।"[১৭]

এ ধরনের লেখা অবশ্য সন্তোষকুমারীর চিন্তার সচ্ছতাই প্রকাশ করে। প্রভাবতীর এ ধরনের কোন লেখা আছে বলে এখনও জানি না, তবে এরা দুজনেই রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা থেকে নয় মানবতা বোধ থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে এসেছেন তার তাঁরা সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রমিকরা যখন মাইরাম বা মাতাজী বলে তাঁদের কাছে এসেছেন। প্রভাবতী বলেছেন "যেখানেই আমি গেছি, সেখানেই শ্রমিকরা আমায় 'মাতাজী কি জয়' ধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।"[১৮]

এদের কাজকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিকও চোখে পড়ে। এরা নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। চটকলে, ঝাড়ুদার আন্দোলনে বা বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং নানান অঞ্চলের নিম্নবর্গের আদিবাসী মানুষ। সন্তোষকুমারী, প্রভাবতী, মৈত্রেয়ী দেবী এরা প্রত্যেকেই বলেছেন শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। তারা আমাদের খুব শ্রদ্ধা করেছে। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং সব অর্থেই সমাজের উপর তলার মানুষ। কিন্তু বস্তিতে গিয়ে এদের সঙ্গে মেলামেশা করতে কোন কুণ্ঠাবোধ এদের ছিল না। জাত পাত সমস্যা কোনদিন এদের কাছে সমস্যা বলেই মনে হয়নি। যেকোন সময় যেকোন আন্দোলনে এটা একটা বলিষ্ঠ দিক। এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং জাতপাতের সমস্যায় ভেসে না যাওয়া—এটা কি যে যুগে জাতীয় আন্দোলন এবং গান্ধী নেতৃত্বে প্রভাব ? এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার মত।

একটা প্রশ্ন মনে আসে যে এরা তো মহিলা নেত্রী—কিন্তু আলাদা করে মহিলা শ্রমিকদের জন্য এরা কিছু ভেবেছেন কি ?

একথা ঠিক তখন মেয়ে শ্রমিক তুলনায় অনেক কম। বাঙালী মেয়ে একেবারেই নেই। অধিকাংশ শ্রমিকই আসতো, কি মেয়ে, কি পুরুষ, রাঁচী, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর বিহার, ইউ পি, তেলেঙ্গানা, এসব অঞ্চল

থেকে। কোন প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ চিন্তা এই নেত্রীদের আচ্ছন্ন করেনি। নির্দ্বিধায় তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন, কিন্তু মেয়ে পুরুষ আলাদা করে কিছু ভাবেন নি, সবাই নিপীড়িত, বঞ্চিত, শ্রমিক, এই বোধটাই তাদের কাছে বড় ছিল।

অথচ এই একই সময় নিশ্চিত ভদ্রলোকরা অধিকাংশই কিন্তু মহিলাদের এই কাজকর্মকে ভাল চোখে দেখেন নি এমনকি নানান রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিও করেছেন।

প্রথমত, জাতীয় আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ বলে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে স্বাধীনতার আন্দোলন ভদ্রলোকদের আন্দোলন। যাঁরাও শ্রমিক আন্দোলনে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাঁরাও চেয়েছেন তাদের বাঁধা ছকের মধ্যে আন্দোলন চলুক। কিন্তু ঘটনা প্রভাবে দেখা গেছে যে শ্রমিক আন্দোলন স্বাভাবিকভাবে অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে এবং এই নেত্রীরাও স্বেচ্ছায় হোক বা অন্য কোন প্রভাবে হোক অন্যরকম চিন্তা করতে শুরু করেছেন যা অনেকেই পছন্দ করেন নি। তখনকার বেশ প্রখ্যাত একটি দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সন্তোষকুমারী সম্বন্ধে নানান কুৎসা রটনা করে।[১৯] অবশ্য সন্তোষকুমারী তাতে বিচলিত হন নি পত্রিকা সম্পাদককে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন।

প্রভাবতী দাশগুপ্তাকেও এই ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শনিবারের চিঠিতে প্রভাবতীর কার্টুন ছাপা হয়েছে, ধাঙড়দের সংগঠিত করছেন বলে তাঁকে পরিহাস করে সংবাদ বেরিয়েছে। প্রবাসী পত্রিকায় সমস্ত ধাঙড় ধর্মঘটকে বিদ্রূপ করা হয়েছে সঙ্গে তার নেতৃবৃন্দকেও।[২০] সাকিনা বেগম মুসলমান হওয়ায় তাঁকে আরও বাধা পেতে হয়েছে। চল্লিশের দশকে তিনি যখন আবার ধাঙড় ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন তখন তৎকালীন মেয়র এ. আর. সিদ্দিকী (লীগপন্থী) সাকিনাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করেন, তিনি কার্শিয়াং চলে যান।

তুলনামূলকভাবে ডঃ মৈত্রেয়ী বোস বা সুধা রায়কে কম বাধা পেতে হয়েছে। কারণ ততদিন আন্দোলনের চরিত্র পাল্টেছে এবং ব্যাপ্তিও হয়েছে। তবুও ভদ্রলোকেরা এই শ্রমিক আন্দোলনকে খুব ভালভাবে কখনও মেনে নিতে পারেন নি।

শ্রমিকের দুঃখে সন্তোষকুমারী একদিন এসেছিলেন এদের জন্য কাজ

করতে। সেই একই মানবতাবোধ থেকেই প্রভাবতী কি মৈত্রেয়ী বোসের মত বা সাকিনা বেগমের মত বিদুষী মহিলারা শ্রমিকের দুঃখে সাড়া দিয়ে তাদের মধ্যে কাজ করতে এসেছেন। যখন শ্রমিকদের পাশে প্রায় কেউই নেই তখন সাহস করে এই মেয়েদের এগিয়ে আসা, তাদের আন্দোলন পরিচালনা করা সবটাই আমাদের জাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে সন্তোষকুমারী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাই তিনি শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে গেলেও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রইলেন জীবন কাটালেন মূলত সমাজ সেবামূলক কাজে। ডঃ মৈত্রেয়ী বসু আজ একজন সমাজসেবী এবং রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও যুক্ত। সাকিনা বেগম ইতিহাসে হারিয়ে গেলেন। প্রভাবতী দাশগুপ্তা নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হওয়ায় আন্দোলন বিমুখ শুধু যেন কোন রকম রাজনীতি সংশ্রবেই আর রইলেন না এক অর্থে তিনি হারিয়ে গেলেন তার পরিচিত জীবন থেকে।

## নির্দেশিকা


১ কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ( সম্পাদিত ) **ভারত শ্রমজীবী**, কলকাতা, ১৯৭৫, ভূমিকা, পৃঃ ১৭।

২ **সোমপ্রকাশ**, ৫ মে, ১৮৬২

৩ এস· এ. ডাঙ্গে ( সম্পাদিত ) **এ আই টি ইউ সি : ফিফটি ইয়ারস** ১ম খণ্ড ( বোম্বাই ), ১৯৭৩

৪ **সাক্ষাৎকার**, সন্তোষকুমারী দেবী, ১৯৮২।

৫ সন্তোষকুমারী দেবী : **আমেদাবাদ কংগ্রেস** ( অপ্রকাশিত রচনা )।

৬ ধরণী গোস্বামী : **সাক্ষাৎকার**, ১৯৮৫

৭ কমলা দাশগুপ্তা : **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী**।

৮ মণি সিংহ : **জীবন সংগ্রাম**, ঢাকা, ১৯৮৩।

৯ ডঃ মৈত্রেয়ী বসু : **সাক্ষাৎকার** ১৯৮৩

১০ ধরণী গোস্বামী : **সাক্ষাৎকার** ১৯৮৫

১১ সন্তোষকুমারী দেবী : **হাউ আই স্টার্টেড দি লেবার মুভমেন্ট** ( অপ্রকাশিত রচনা )

১২ ভি. বি. কার্ণিক : **স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া**, পৃঃ ১০৩।

১৩ সন্তোষকুমারী দেবী—সাক্ষাৎকার। ১৯৮২।

১৪ মুজাফ্‌ফর আহমদ : **আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৯-৩৪**, ২য় খণ্ড।

১৫ **রয়াল কমিশন** অব লেবারের কাছে বাংলা **সরকারের** বিবৃতি।

১৬ **শ্রমিক** ( সাপ্তাহিক ) : সন্তোষকুমারী দেবী সম্পাদিত। ১ম বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।

১৭ সংহতি ( মাসিক ) : ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯২৩। সন্তোষকুমারী দেবী লিখিত প্রবন্ধ : "বাংলার চটকলের কথা।"

১৮ প্রভাবতী দাশগুপ্ত : ( সাক্ষাৎকার ) : জওহরলাল নেহরু মিউজিয়াম এ্যাণ্ড লাইব্রেরী, দিল্লী।

১৯ **আনন্দবাজার পত্রিকা**, ২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

২০ ধরণী গোস্বামী ( **সাক্ষাৎকার** ) ১৯৮৪-১৯৮৫

# বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টির কিশোর বাহিনী

অনুরাধা রায়

বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয় এক কিশোর বাহিনী। এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ক'বছর এবং এটি বোধ হয় এদেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে স্বল্পজ্ঞাত দিক। তা' সত্ত্বেও এবং অনেকটা সেই কারণেই আকর্ষণীয় কিশোর বাহিনীর ইতিহাস।

সূচনা : কম্যুনিস্টদের তৎকালীন সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধে' কিশোর বাহিনীর প্রারম্ভিক ইতিহাসটা মোটামুটি পাওয়া যায়। ২৪শে মার্চ ১৯৪৩-এ একটি রিপোর্ট বের হল এই কাগজে। শিরোনাম 'ছেলের দল পিছিয়ে নেই'। রিপোর্টটির ভিত্তি ছিল বাঁকুড়া থেকে এক কিশোরের পাঠানো চিঠি। সে জানায় যে সেখানে মহিলা ফ্রন্টের সঙ্গে বালক-বালিকার দলও সোৎসাহে কাজে মেতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার কিশোর বিভাগের প্রধান 'মৌমাছি' (বিমল ঘোষ) নাকি 'হুল ফ্যুটিয়েছেন' এই সচেতন উদ্যোগকে। ছোট মেয়েদের জন্য বাঁকুড়ায় তাঁর যে 'মণিমেলা' দল ছিল, তাদের তিনি উপদেশ দিয়েছেন—রাজনীতি থেকে দূরে থাকো, তরুণী সংঘের সঙ্গে মিশবে না। বাঁকুড়ার বামপন্থী তরুণীদের পত্রিকা 'জাগরণী'কে কটাক্ষ করে বলেছেন—মেয়েদের আবার কাগজ বের করার কি দরকার! তারা আলনা গোছাবে, পিতা-মাতার সেবা করবে। এমনকি তিনি নির্দেশ দেন, মণিমেলা-রা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবে না। ঐদিন বরং তারা বাড়ীতে আত্মার প্রার্থনা করবে।

৩১শে মার্চ, ১৯৪৩, জনযুদ্ধ সম্পাদক বললেন, "ছোটদের জন্য লেখা চাই ও খবর চাই।···দেশের কাজে আজ ছোট ছেলেমেয়েদের অবদান কম নয়। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সংগঠনের রূপ দিতে হইবে।"

৭ই এপ্রিল, কলকাতার নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের কিশোরদের তরফ থেকে এক চিঠি —তারা ইতিমধ্যেই আঞ্চলিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছে। তারা নিয়মিত জনযুদ্ধ কাজ পড়ে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গান শেখে। তারা একটি

হাতে লেখা পত্রিকাও বার করে, নাম 'উন্মেষ'। 'মৌমাছির' স্বরূপ তারা চিনেছে। তারা রাশিয়া ও চীনের বীর কিশোরদের সঙ্গে সমান তালে চলতে চায়। তাদের দাবী, জনযুদ্ধ কাগজে অন্তত একটি পাতা ছোটদের জন্য রাখতে হবে এবং বড়রা তাদের আরো ভালো করে, আরো বড় করে দল গড়ার উৎসাহ দিক। এই চিঠিটির নীচেই জনযুদ্ধ-সম্পাদক ডাক দিলেন সব কিশোরকে—"এমনিভাবে তোমরাও দল গড়।"

১৪ই এপ্রিলের জনযুদ্ধে রংপুরের বাগুয়া থেকে এক কিশোরের চিঠি। সেখানেও তারা বালক সমিতি খুলেছে। তার কুড়ি জন সদস্য এসেছে মুসলমান চাষীর ঘর থেকে People's War আর জনযুদ্ধ কাগজের লেখা তাদের বেশ শক্ত লাগে। তাই তারা ছোটদের উপযোগী লেখা চায়।

ঐ ১৪ই এপ্রিলই, অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিন, কিশোর বাহিনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কলকাতার Indian Association Hall-এ। এ'র বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ২১শে এপ্রিলে জনযুদ্ধে। ৩০০ জনের সমাবেশে অধিকাংশই ছিল কিশোর। তারাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। খ্যাতনামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও কম্যুনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী উৎসাহদায়ক ভাষণ দেন।

কিশোর বাহিনী গঠনের এই যে ইতিহাসটা জনযুদ্ধে পাওয়া যায়—স্থানীয় স্তরে ছোটদের সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ, তারপর পার্টির উঁচু মহল থেকে প্রাদেশিক সংগঠন তৈরী করে তাকেই একটা বড় চেহারা দেওয়া—এটা সমর্থিত হয় নৃপেন ব্যানার্জীর বিবরণ থেকে। শ্রী ব্যানার্জী ছিলেন কুমোরটুলি অঞ্চলের এক কম্যুনিস্ট পরিবারের সন্তান ও কিশোর বাহিনীর প্রথম প্রাদেশিক সম্পাদক। তিনি যতদূর মনে করতে পারেন, ঐ অঞ্চলে সরোজ হাজরা নামে জনৈক কম্যুনিস্ট স্কুলে স্কুলে ঘুরে ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাতেন। তাদের একটা সচেতন আর গঠনমূলক জীবনচর্যায় উৎসাহ দিতেন। সেটাই ছিল nucleus। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ঘিরেই ঐ পাড়ায় কিশোর বাহিনী গড়ে উঠল।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যটা কিশোর বাহিনী গঠনে কেন্দ্রাতিগ শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল পার্টির নেতৃস্তরে, বিশেষ করে সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর মনে, তার ওপরেও যথেষ্ট জোর দিয়েছেন নৃপেন ব্যানার্জী। তিনি বলছেন, যোশীর রাজনীতিতে হয়ত ভুল ছিল। কিন্তু মানতেই হবে যে কম্যুনিজ্‌ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি (যোশী) বলতেন,

কম্যুনিজ্‌মের বিস্তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তাই খাপছাড়াভাবে আন্দোলন করা কিছু ব্যক্তি কম্যুনিস্ট নয়, তিনি চাইতেন একজন কম্যুনিস্ট তার প্রভাব ছড়িয়ে দেবে নিজের চারিদিকে, প্রথমত নিজের পরিবারে। আর এরকম একেকটি পরিবার হবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একেকটি unit। এসব পরিবারের মহিলাদের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে যেমন তৈরী হয়েছিল মহিলা ফ্রন্ট, এখন তেমনি কিশোরদের জন্য তৈরী হল আর একটি ফ্রন্ট।

বয়স্কদের একটা খুব সাধারণ প্রবণতা হল ছোটদের অলীক অবাস্তব জগতে রেখে দেওয়া। আনন্দবাজারের 'মৌমাছি' হয়ত সেটাই করতে চাইছিলেন খুব উৎসাহের সঙ্গে। নৃপেন ব্যানার্জীর ভাষায়, তাঁর ছিল "কংগ্রেসের থেকেও conservative line"। এই প্রবণতা প্রতিরোধ করা নিশ্চয় কিশোর বাহিনী গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ওপর কিশোর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয়নি।

রাশিয়া-চীনের ছোট ছেলেমেয়েদের বীরত্ব কাহিনী কিশোর বাহিনীর কাছে বিরাট প্রেরণার উৎস ছিল। চীনের Little Red Devils সম্পর্কে হয়ত তখনো এদেশে বিস্তারিতভাবে জানা ছিল না; কিন্তু রাশিয়ান ছেলেমেয়েদের অনেক গল্প, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় তাদের অবদানের অনেক কাহিনী এখানে পৌঁছায়। ছোটরা যে অসাধারণ ক্ষমতা রাখে তা'র দৃষ্টান্তগুলি মনে করে এবং সেই ক্ষমতাকে ঠিকমত চালনা করার উদ্দেশ্যে দেশ-পুনর্গঠনের সময় রাশিয়াতে তৈরী হয় Pioneers (১০-১৬ বছর বয়স্কদের জন্য) আর Young Communist League (বয়স-সীমা ১৪-২০ বছর)। আদর্শ কম্যুনিস্ট গড়ার প্রথম দু'টি ধাপ ছিল এই দুই সংগঠন।

বাংলাদেশেও কিশোর বাহিনী অনেকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট গড়ায় কাজে ছাত্র ফেডারেশনের ঠিক আগেই ছিল এর অবস্থান এবং ভূমিকা ছিল ছাত্র ফেডারেশনেরই পরিপূরক। কিশোর বাহিনীর জন্য নির্ধারিত বয়ঃসীমাটা ঠিক জানা যায় নি। তবে যতদূর মনে হয়, উচ্চতর সীমা ছিল ১৬ বছর, অর্থাৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার বয়স। অনেক সময়ই কিশোর বাহিনীর সদস্য ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হিসেবেও কাজ করত। আবার ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য একই সময় হত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। শুধু ছাত্র ফেডারেশন নয়, কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যান্য গণমাধ্যম ক্ষেত্রগুলিও ছিল বাহিনীর সাবালক হয়ে ওঠা সভ্যদের গ্রহণ করার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বা সংস্কৃতি চর্চায় যারা উৎসাহী তাদের জন্য গণনাট্য সংঘ।

কিশোর বাহিনীর মাথা-পিছু চাঁদা ছিল এক আনা। প্রতীকচিহ্ন একটি উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাত।

কম্যুনিস্ট পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে কিশোর বাহিনী প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। বম্বেতে ১৯৪৩-এর মে মাসে পার্টির যে প্রথম কংগ্রেস বসে তা'তে বাংলার কিশোর বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন নৃপেন ব্যানার্জী। সেখানে অন্য প্রদেশের তিন-চারজন কিশোর প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সাধারণভাবে অন্যান্য প্রাদেশিক কিশোর সংগঠন সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশেষ কিছু জানা ছিল না; তাদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল না।

কিশোরদের নিজস্ব সমাবেশও হত। যেমন, ১৯৪৩-এর ১৪ই অক্টোবর একটি বড় সমাবেশ হয় কলকাতায়, যেখানে যোশী ভাষণ দেন ও বিশেষ জোর দেন কিশোর পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার ওপর।

কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল ৮/২ ভবানী দত্ত লেন, যা ছিল ছাত্র ফেডারেশনেরও অফিস। ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন কিশোরদের সার্বজনীন 'ছোড়দা', তাদের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রধান প্রেরণাদাতা। নৃপেন ব্যানার্জী বলেন, "সরোজ হাজরার পরেই, আর একটু ওপরের স্তরে, প্রাদেশিক স্তরে, আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সংযোগ রাখতেন অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য।" ছোটদের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাদের সমস্যাগুলি ঠিক ঠিক বুঝতে পারতেন, তাদের কল্পনা বিস্তারে সাহায্য করতেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। তখন থেকে আর কিশোর বাহিনীর জন্য খুব একটা সময় দিতে পারতেন না। কিশোর বাহিনীর নেতা হিসেবে তাঁর স্থান নিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং এই তরুণ কবি সংগঠনের মত গদ্যময় কাজেও নিজেকে যথেষ্ট দক্ষ প্রমাণিত করেন। কিশোর বাহিনীর কর্মসচিব হিসেবে লেখা তাঁর বেশ কয়েকটি চিঠি আছে 'সুকান্ত-সমগ্র'তে, সেগুলিতে কিশোরদের জন্য উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জনযুদ্ধ ও পরে স্বাধীনতা পত্রিকাতেও নিয়মিত নির্দেশ দেওয়া হত কিশোর বাহিনীর জন্য।

বিস্তার : খুব দ্রুত কিশোর বাহিনীর শাখা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে—হাওড়ার আন্দুল থেকে আসামের ডিব্রুগড় ও ধুবড়ি পর্যন্ত। জনযুদ্ধ ১৯-৫-৪৩, ১৬-৬-৪৩, ১৭-৭-৪৩ আর ১০-৮-৪৩ থেকে জানা যায় যে তখনই কিশোর বাহিনীর ঘাঁটি ছিল হুগলী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান,

বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর—বলতে গেলে বাংলাদেশের সব জেলাতেই। প্রতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যেই সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০০০। তার মধ্যে ৩০০০ মেয়ে। খুব রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানশীন মেয়েদেরও টেনে আনা হয়। চাষী-মজুরদের পরিবার থেকেও অনেক সভ্য আসে। সব শেষ যে হিসেবটা পাওয়া যায়, সেটা কয়েক বছর পরে, তা'তে মোট ৬০০ কেন্দ্রে ৩০,০০০ ছেলেমেয়ে সভ্য হিসেবে কাজ করছিল।

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও কিশোর বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল, সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে উত্তর কলকাতায়। শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল শ্যামবাজার শাখা, যার ঠিকানা ১৩।১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কমল বসুর বাড়ী। খেলাধুলো, সংস্কৃতি ও সেবামূলক কাজে এই শাখা ছিল সবার সেরা। দেখাশোনা করতেন সুকান্ত স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করতেন আরতি পাকরাশী ( এখন গাঙ্গুলী )। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতাতেও কিশোর বাহিনীর শাখা ছিল। বৌবাজার, ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারের পিছনে, কালীঘাটে উজ্জ্বলা সিনেমার উল্টোদিকে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে একটা ও আর একটা নেপাল ভট্টাচার্য লেনে, কাঁকুলিয়া, ডোভার লেন, ট্রায়াংগুলার পার্ক ইত্যাদি স্থানে নেতাদের মধ্যে রমাকৃষ্ণ মৈত্র, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য, মোহিত আইচ, মদন সাহা ( ইনি হুগলীর চণ্ডীবাটী কিশোর বাহিনীতে ছিলেন ), শচীন ভৌমিক, প্রসূন বসু, কৃষ্ণা দত্ত এবং আরো অনেক নাম ( অনেক সময় পদবীবিহীন )। পেয়েছি। আরতি গাঙ্গুলী বলেন, গিরীশ ঘোষদের বাড়ীর এক মেয়ে নাকি বাগবাজার শাখায় ছিল। ছোটরা তাকে খুব মান্য করত।

নীতি ও কার্যক্রম ঃ কিশোর বাহিনীর motto ছিল 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, স্বাধীনতা' (জনযুদ্ধ, ১৯শে মে, '৪৩)।

'শিক্ষা' বলতে অবশ্যই জীবনমুখী শিক্ষা বোঝাতো এবং তার সাথে জড়িয়ে ছিল একটা সামগ্রিকতার ধারণা। বামপন্থীরা চেয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিতে। প্রতি সপ্তাহে শাখাগুলির নিজেদের যে সভা বসত ( যাকে কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হত 'মিলন সভা' ) তা'তে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পড়ে শোনানো হত এবং তারপর হত তা'ই নিয়ে আলোচনা। সুশোভন সরকারের ( অমিত সেন ছদ্মনামে ) 'ইতিহাসের ধারা' যেমন তারমধ্যে থাকত, তেমনি হয়ত থাকত পদার্থবিজ্ঞানের কোন সমস্যা। অনেক শাখারই নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। অনেক সময় পাড়ার

কিশোর পাঠাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠত কিশোর বাহিনী। সেই সুযোগ নানারকম বই পড়ত ছোটরা।

বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর খুব জোর দেওয়া হত। নৃপেন ব্যানার্জী মনে করতে পারেন, আন্দামান-বন্দীরা যখন মুক্ত হয়ে এলেন, তখন তাঁরা অনেকেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায় নামে এক উজ্জ্বল বিজ্ঞান-ছাত্র। তিনি পরপর অনেকগুলি ক্লাস নেন বিজ্ঞানের ওপর। মার্কসীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পড়াতে গিয়েই তিনি মোটের ওপর একটা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ মিথিল ভট্টাচার্যও অঙ্ক ও বিজ্ঞান ভালো জানতেন। তিনিও ক্লাস নিতেন। কিশোরদের অনেকে বাংলা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং ইংরিজী Science and Culture পত্রিকাও পড়ত।

দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়—'কিশোর সভা' নামে। চালাতেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। এপ্রিল ২৮, '৪৬-এর স্বাধীনতার শেষ পাতার প্রায় অর্ধেক জুড়ে এই বিভাগের সূচনা। এখানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

৫ই মে ১৯৪৬-এ যেমন, পুরো কিশোর সভাটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে, তাঁর আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে। ওপরেই বড় হরফে 'জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা'। অলকা মজুমদার, অবন্তী সান্যাল ও সম্পাদকের লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে।

১৮ই মে ১৯৪৬ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'হাজার রকমের কেন'—সোভিয়েট কিশোর-সাহিত্যিক মিখাইল ইলিনের বিজ্ঞানমূলক একটি বইয়ের ভিত্তিতে।

আর এক কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী লিখেছেন 'ছেলেমানুষের সেরা' ( ২৩শে জুন '৪৬ )—আইনস্টাইনকে নিয়ে।

এ'ছাড়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, কসমিক রে—কি ছিল না 'কিশোর সভায়'!

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গে বই-ও লিখেছেন বামপন্থীরা। মিখাইল ইলিনের 'মানুষ কি করে বড় হল' অনুবাদ করেন গিরীন চক্রবর্তী। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হলডেনের বইয়ের অনুবাদ 'এক যে ছিল যাদুকর' ছোটদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়।

সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে বেশ কিছু বই ছিল। দিলীপকুমার

মুখোপাধ্যায়ের 'ছোটদের সোভিয়েট' (১৯৪৬ নাগাদ), সোমনাথ লাহিড়ীর 'রাশিয়ার কিশোর বীরদের কাহিনী', এ কোজোনভ থেকে গিরীন চক্রবর্তীর অনুবাদ 'তোমাদের বন্ধু লেনিন' ( পূরবী পাবলিশার্স ) ইত্যাদি।

গিরীন চক্রবর্তী নিজে 'অমর ভারত গড়ল যারা' বলে একটি বই লেখেন। সেটি ছিল প্রাচীন কাল থেকে ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৬ নাগাদ )।

'জানবার কথা' নামে দশ খণ্ডে ছোটদের বিশ্বকোষ বের করেন বামপন্থীরা। চিন্মোহন সেহানবীশ লেখেন ইতিহাসের খণ্ডটি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দর্শনেরটি।

'স্বাস্থ্য' চর্চাকে কিশোর বাহিনী দেশসেবা ও সংস্কৃতির অঙ্গ করে নিয়েছিল, অনেকটা গুরুসদয় দত্তের আদর্শে। লাঠি বা ছুরি নিয়ে খেলা, ডিল, মার্চ পাস্ট, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন, হাডুডু আরো হরেক রকম খেলা, প্রায়ই যেগুলি ছিল কিশোরদেরই আবিষ্কার। আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক খেলাধুলোর অনুশীলনে অবশ্য এদের অন্য পূর্বসূরীও ছিল। যেমন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লাঠি খেলার ঐতিহ্য অনেক পাড়াতেই কিশোর বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে ঘিরেও তো প্রায়ই গড়ে উঠত কিশোরদের আখড়া, রাজনীতি-সচেতনতার সঙ্গে শরীরচর্চাও ছিল যেগুলির বৈশিষ্ট্য। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে বাংলার পূর্বসীমান্তে জাপানী আক্রমণের বিভীষিকা। তাই ঐ অঞ্চলের কিশোরদের লাঠিখেলা ইত্যাদি শেখার বিশেষ তাগিদ ছিল।

তাছাড়া কিশোরবাহিনীর শাখাগুলি স্থানীয় স্তরে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। বালী (হাওড়া) কিশোর বাহিনী প্রতিবছর শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা করত ঐ শাখার প্রতিষ্ঠাতা বেণীমাধব ও শান্তিরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থে।

—'সেবা'মূলক কাজের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ১৯৪৩-৪৪-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যের কথা। আরতি গাঙ্গুলী তো বলছেন, কিশোর বাহিনীর প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ একটা driving force-এর মত কাজ করে। পাড়ায় পাড়ায় র‍্যাশন ও কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন ঠিক রাখা, সকলে ঠিকমত অংশভাগ পেল কিনা দেখা, লঙ্গরখানা চালানো, Red Cross-এর দুধ বস্তিতে বণ্টন করা, আরো দুধের দাবীতে বাচ্চাদের বাপ-মায়ের সই সংগ্রহ করা—এ'সব কাজ করে ছোটরা জনরক্ষা সমিতিকে সাহায্য করত। কে

কোথায় চাল মজুত করে রেখেছে, বড়দের সেসব খবর তারা এনে দিত। গ্রামের দিকে মহাজনদের ওপর চাপ নিয়ে চাষীদের জন্য দাদন আদায় করত। দুর্ভিক্ষের ঠিক পরপরই যখন ম্যালারিয়ার উপদ্রব দেখা যায়, সেই সেই সময় ছোট ছেলেরা গিয়ে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটার দিকে কয়েকটি পানাপুকুর পরিষ্কার করেছিল।

তাছাড়াও নিজেদের পাড়া ও গ্রামের জন্য তারা গঠনমূলক কাজ করত। আরতি গাঙ্গুলী বলেন, পাড়ার গরীব মেয়েরা সেই সময় কর্পোরেশন স্কুলে হয়ত তিন-চার ক্লাস অবধি পড়ত, তারপর বাড়ীতেই বসে থাকত। কিশোর বাহিনীর মেয়েরা এদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলে এবং বাহিনীর সদস্য করে নিয়ে এদের দিয়ে আরো নানারকম কাজ করায়।

১লা মে ১৯৪৩-এর জনযুদ্ধে সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি গল্প লেখেন—'যুদ্ধরত বাংলার কিশোর'। গল্পচ্ছলে সেখানে কিশোর বাহিনীর বিভিন্ন শাখার কাজকর্মের প্রশংসা করা হয়েছে; বিশেষ করে ঢাকার নবাবপুর, রংপুরের মধুপুর প্রাইমারী স্কুল, কলকাতার ফার্ণ রোড আর চট্টগ্রামের হাবিলাস দ্বীপের শাখার কথা বলা হয়েছে। এদের কাজের পরিধি বিস্তৃত—জল পরিষ্কার, রাস্তা বাঁধাই, দুগ্ধকেন্দ্র চালানো ইত্যাদি। গল্পটি হল, এক অভিভাবক ক্রুদ্ধমূর্তিতে কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিসে ঢুকে অভিযোগ করেন যে এরা তাঁর ছেলেকে খারাপ করে দিচ্ছে। তখন বিভিন্ন শাখার কাজকর্মের রিপোর্ট সংক্রান্ত ফাইলগুলি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। একটু-খানি পড়েই তিনি খুব খুশী হন এবং এদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যান।

কিশোররা সরাসরি রাজনীতি করত না খুব একটা। সেটা কম বয়সের জন্যই। আর তাতে অভিভাবকরাও নিশ্চিন্ত থাকতেন। তবে ছাত্র ফেডারেশনের 'দাদা'দের নানাভাবেই সাহায্য করত তারা, অনেক সময় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সমর্থন না করার জন্য কম্যুনিস্টরা জনপ্রিয়তা হারায়। কলকাতার একেকটি পাড়া দিয়ে তারা প্রায় যাতায়াতই করতে পারত না মার খাবার ভয়ে। অমূল্য পাকড়াশী ছিলেন ছাত্র ফেডারশনের কর্মী এবং বাগবাজার কিশোর বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক। (ইনি আরতি গাঙ্গুলীর দাদা—এঁদেরও কম্যুনিস্ট পরিবার, যে পরিবারের সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট সতীশ পাকড়াশী)। তিনি বলেন, বাগবাজারে সেইসময় 'ভারত জাতীয় বাহিনী' (কম্যুনিস্টদের ভাষায় 'গুণ্ডাদের দল') কম্যুনিস্ট দেখলেই মারধোর করত। তখন কোন দরকার বাগবাজারের

দিকে তাঁকে যেতে হলে সেখানকার কিশোর বাহিনীর ছেলেরা নিরাপত্তা রক্ষীর মত তাঁকে বিপদমুক্ত এলাকা পর্যন্ত এগিয়ে দিত।

আরার ১৯৪৬-৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে ছোটদের সাহসী ভূমিকার কথাও তিনি সগর্বে স্মরণ করেন। ফড়েপুকুরে ছিল মুসলমানদের নিকাশীপাড়া বস্তি। একদিন উন্মত্ত জনতা তাতে আগুন ধরাতে যায়। পাড়ার ছোটরা, প্রধানত কিশোর বাহিনীর সভ্যরাই, সেবার অজস্র লোককে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে নেতৃত্ব যিনি দেন তিনি কোন কম্যুনিস্ট নন, পাড়ার এক শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা।

সংস্কৃতি চর্চা ঃ একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ লাভের উপায়ে হিসেবে সংস্কৃতিচর্চায় খুব উৎসাহী ছিল কিশোর বাহিনী। তারা হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করত। প্রায়ই অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতা করত। শ্যামবাজার শাখায় এই খেলার প্রবর্তনা। পরে সুকান্ত স্বাধীনতার কিশোর সভায় সকলের জন্য এটি শিখিয়ে দেন। খেলাটিতে একদল একটি কবিতা বা গান থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে। উদ্ধৃতির শেষ অক্ষরটি দিয়ে কবিতা সুরু করে বিপক্ষ দল। এতে ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করা কবিতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হত।

তাছাড়া মাঝে মাঝেই ছোট বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। আজকাল যেমন এরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকে, তখন কিন্তু তেমন ছিল না। ফলে এগুলি কিশোরদের বিশেষ সংগঠনী ও সৃজনী শক্তির পরিচয় রাখত।

গান ছিল ঐসব অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। কিশোরদের উপযোগী গান লিখেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কনক মুখোপাধ্যায়, দয়াল কুমার ও আরো অনেকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি গান উদ্ধৃত করছি জনযুদ্ধ থেকে (১লা মে '৪৪)। এর থেকে বোঝা যাবে ভাষা ও ভাবে গানগুলি কিরকম হত—

আমরা বীর কিশোর
আমরা বীর কিশোর
মুক্তির পথে মিলেছি সবাই
নিয়েছি পণ কঠোর।
রুশ চীনে ঘরে ঘরে
বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে কিশোর
জীবন তুচ্ছ করে।

আমরাও সব শত্রুর মুখে
তুলবো তুফান জোর।

তাছাড়া গণনাট্য সংঘের নানা গান, রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, যেমন "খরবায়ু বয় বেগে", তারা গাইত। গণনাট্য সংঘের স্থানীয় সদস্যারা এবং রেবা রায়, গীতিকার-গায়করা ছোটদের গান শেখাতেন।

গানের সঙ্গে নাচও থাকত। অমূল্য পাকড়াশী বলছেন, বাগবাজার শাখায় মাঝে মাঝেই ছোটদের তালিম দিতে যেতেন পরবর্তীকালের নামকরা নাচিয়ে শম্ভু ভট্টাচার্য।

নাটকের মধ্যে অভিনীত হয়েছে ইউজিন ও'নীলের 'The Emperor' এবং আরো কিছু বিদেশী নাটকের অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথের নাটক তো ছিলই। 'জাগো কিশোর' বলে একটি নাটকের নাম পাচ্ছি।

যে নাটকটি কিশোর বাহিনীর ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশী অভিনয় করেছে তা হল সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'অভিযান'। এটি গীতিনাট্য। সংকলিতা নামে এক মেয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য অন্য একটি দেশে গিয়েছিল গান গেয়ে ত্রাণ তহবিল ভরাতে। সেখানে সাধারণ লোকের মনকে সে নাড়া দিতে পারে এবং তারা তার আবেদনে সাড়া দেয়। কিন্তু সেদেশের কোতোয়াল তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে এবং কোতোয়ালের পাপে সেখানেও নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও কোতোয়ালকে বন্দী করে শেষ পর্যন্ত।

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য এই নাটকটি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন—"প্রথম লেখায় ওর বিপ্লবী চেতনার স্বাভাবিকতা থেকে শেষ দৃশ্যে ছিল নিপীড়িত প্রজাদের হাতে অত্যাচারী কোতোয়ালের মৃত্যু। তখনকার বন্ধু বা পৃষ্ঠ-পোষকদের অনেককেই পড়ে শোনানো হল। তাদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত কোতোয়াল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রজাদের হাতে বন্দী হলেন। এই অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের কথা মনে পড়লে আজ বিরক্ত ও ব্যথাই শুধু জাগে।" এই পরিবর্তন ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন জনযুদ্ধ নীতিজনিত সহিষ্ণুতার ফল।

যাই হোক, নাটকটি বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। কিশোর বাহিনীর উদ্বোধনী উৎসবেই নাকি এটি করা হয়। শ্যামবাজার শাখায় বার কয়েক এটি হয়। আরতি গাঙ্গুলী মনে করতে পারেন। একবার তিনি কোতোয়াল সেজেছিলেন, আর একবার সংকলিতা। সেকালের ছাত্রনেতা

গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, কৃষ্ণনগরের এক শাখা থেকেও তাঁর ছোট ভাই ও অন্যান্যরা এটি অভিনয় করেন।

কিশোর বাহিনী 'অপরাজেয় নামে একটি নাট্যসংকলন বের করে (এপ্রিল ১৯৪৪)। এতে ছিল 'অভিযান' এবং অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যর 'বিজয়ী'। কিশোর বাহিনী গড়ে ওঠার প্রথম দিকের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'বিজয়ী' লেখা হয়। এখানে কিশোর নেতা নরেন ও বিমানের চরিত্রে পুরো কিশোর বাহিনীর উদ্দেশ্য, উদ্যোগ ও সাফল্যের ছবি ফুটে উঠেছে। বিনয় রায় ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে সমৃদ্ধ এই নাটক।

বাম সাপ্তাহিক অরণিতে (২১শে এপ্রিল '৪৪) বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়—"ভুতুড়ে বাড়ি, বঙ্গোপসাগরে বোম্বেটে আর আসামের গভীর জঙ্গলে বাইসন ও গরিলা শিকারের লোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে যে দেশে সাহিত্যিকেরা শিশু- সাহিত্য ফাঁদেন ও পকেট ভর্তি করেন, সে দেশে এই শ্রেণীর সুষ্ঠু, সরল, গণসচেতন বইয়ের কদর যে কতখানি হবে, বলা যায় না। তবু আমরা 'অপরাজেয়র' বহুল প্রচার কামনা করি।"

কিশোর সাহিত্য ঃ বামপন্থীরা চাইতেন এমন কিশোর সাহিত্য যা কিশোরদের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে ও তাদের মধ্যে একটা সদর্থক জীবনবোধ গড়ে তুলবে। বামমহলের অনেকেই ছোটদের গদ্য-পদ্য লিখেছেন। তার উদাহরণ পাওয়া যায় জনযুদ্ধে, স্বাধীনতার কিশোর সভায়, নানা বই ও সংকলনে।

জনযুদ্ধে সুকান্ত অনেক গল্প লিখেছিলেন কিশোর বাহিনীর আদর্শে ছোটদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যেমন 'কিশোরের স্বপ্ন' (৬ই অক্টোবর '৪৩) —দেশমাতা বাংলাদেশ স্বপ্নে দেখা দেন কিশোর জয়দ্রথকে এবং তার কাছে নিজের দুঃখকাহিনী বিবৃত করেন। অগাস্ট আন্দোলন ও জাপানী আক্রমণে তাঁর দেহ রক্তাক্ত ও বস্ত্র শতছিন্ন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁর শরীর কৃশ। তাঁর বড় ছেলেরা তো মন্ত্রী হবার স্বপ্নেই মশগুল। তাই তিনি চান, ছোটরাই কিষাণ-মজুর ভাইদের সহায়তায় তাঁর দুঃখ দূর করুক।

এরকম আরো ছিল—দরদী কিশোর (এপ্রিল ২৮. ১৯৪৩), শহীদ কিশোর (২৫ জানুয়ারী '৪৫) ও যুদ্ধরত বাংলার কিশোর, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। গল্পগুলি কিন্তু খুব অপরিণত মনে হয়, প্রচারের উদ্দেশ্য প্রকট, গল্পরস জমতেই পারে নি। বরং সুকান্তর 'হরতাল' বইয়ের গল্পগুলি সরস ভঙ্গিতে ও জমাট গল্পরসে চমৎকার। 'হরতাল' গল্পে রেলের ইঞ্জিন,

লাইন, ঘণ্টা, সিগনালরা মানুষের দেখাদেখি শোষণের প্রতিকারে হরতাল করতে চায়। 'ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথায়' এই তিনটি প্রাণী তাদের মনিবের অত্যাচার থেকে বাঁচার পথ খোঁজে। 'দেবতাদের ভয়' মানুষ নাকি অ্যাটম বোমা ফেলে স্বর্গ অধিকার করতে চায়। ইন্দ্রের বজ্রও সে মারণাস্ত্রের কাছে এঁটে উঠবে না। বিশ্বকর্মা বলেই দিয়েছেন, তাঁর সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র আর কম মাইনের খাটুনি দিয়ে ওরকম অস্ত্র তৈরী করতে পারবেন না। আর দেবতাদের যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থা তখন মানুষ ওদিকে নিজেদের একটা স্বর্গ বানিয়ে ফেলেছে—সোভিয়েট রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত মানুষকে দাবিয়ে রাখার একটাই উপায় পাওয়া গেল। ইন্দ্রের নির্দেশে নারদ পৃথিবীতে গেলেন মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের বীজ ঢোকাতে। (গল্পটি স্বাধীনতার কিশোর সভায় বের হয় ১৩ই আগস্ট '৪৬এ)।

আরো অনেকের গল্প পেয়েছি—ননী ভৌমিক, অমল দাসগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রমুখ। ননী ভৌমিকের 'বেড়াতে যাবার দেশ' (স্বাধীনতা, ২রা জুন '৪৬)—ছোট্ট খোকা একা একা চলে যায় এক নতুন জায়গায়। সেখানে দেখে এক পেটমোটা লোক; যার পেট একেবারে ঠাসা, তবু লোভে পড়ে যায়। একটু খেলেই তাই পেটের এক দিক উঁচু হয়ে ওঠে তখন তার সাঙ্গোপাঙ্গো থাবড়া মেরে মেরে সে জায়গাটা সমান করে। এরা আবার চারতলা বাড়ী সুতো দিয়ে ওড়ায় ঘুড়ির মত করে। আর ইচ্ছে হলেই দুম করে সেটাকে নামিয়ে দেয় দেশলাই বাক্সের মত ছোট্ট লাল খোলার বস্তির ওপর। বস্তির মানুষের আর্ত হাহাকারে তারা মজা পায়। এই শোচনীয় অবেহাওয়া থেকে খোকা পালিয়ে আসতে পারে এক লাইট পোস্টের সাহায্যে। সে বেচারার চোখ কানা করে দিয়েছে এরা ঢিল ছুঁড়ে। তার অনুরোধে খোকা সেই চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। একটু পরে আলো জ্বলে ওঠে চোখে। সেই আলোয় খোকা বাড়ীর পথ খুঁজে পায়।

বেশ কিছু সোভিয়েট গল্পের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। হরতালই ছিল ভি. বিয়াঙ্কির 'টেইলস্' গল্পের অনুবাদ 'লেজের কাহিনী'। তাছাড়া সুধী প্রধান কিছু অনুবাদ করেছেন। যেমন—জনযুদ্ধ, ২৮শে এপ্রিল '৪৩-এ 'সিংহের থাবা' (নিকোলাই টিখনভ) এবং বলতে পার সজারু কি ভেবেছে (ভ্যালেণ্টিনা অসিয়েভা) বা স্বাধীনতা, ৯ই জুলাই '৪৬-এ অনুবাদ গল্প

'কেন', যেখানে রাখাল ছেলে জানতে চায় কটা মানুষেরা কেন কালো মানুষদের দেশে এসে অত্যাচার চালায়, কেন কাচের বদলে সোনা নেয়। গল্পটির সঙ্গে ছিল সোমনাথ হোরের সুন্দর ছবি।

কিশোর সাহিত্যিক সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন বামপন্থীদের বন্ধু। তিনি তাঁর কিশোর উপন্যাস 'শয়তানের জাল'এ পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের জন্য যারা দায়ী তাদের মুখোস খুলে দেন। সুকান্ত স্বাধীনতার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে বইটির প্রশংসা করেন (জুলাই, ১৯৪৬)।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র আর একটি উপন্যাস লেখেন 'রক্তমেঘ' নামে। সেখানে ছিল রশীদ আলি দিবসে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের কাহিনী।

যজ্ঞেশ্বর রায় 'কিশোর সংঘ' নামে একটি বই লেখেন। গল্পটিতে গ্রামের ছেলেরা ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করে কিশোর সংঘ গড়ে ও গ্রামের নানা উপকার করে। অরণিতে এর প্রশংসা করা হয়—একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ দানের জন্য (১লা মার্চ, ১৯৪৬)।

কিশোরদের জন্য লেখা কবিতা ও ছড়াও অগুন্তি। লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং সুকান্ত তো বটেই। সুকান্তর ছড়াগুলি পরে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছবিসহ 'মিঠে-কড়ায়' সংকলিত হয়। তার থেকে মাত্র একটি উদ্ধৃত করছি—'আজব লড়াই', রশীদ আলি দিবসের ওপর—

> …ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সাথে খেলা,
> রক্ত-রাঙানো পথে দু'পাশে ছেলের মেলা ;
> দুর্দম খেলা চলে নিষেধে কে কান দেয় ?
> ও-বাড়ি ও ও-পাড়ার কালো, ছোটু প্রাণ দেয়।
> স্বচক্ষে দেখলাম বস্তির আলীজান,
> 'আংরেজ চলা যাও' বলে ভাই দিল প্রাণ।
> …এমন বিরাট খেলা শেষ হল চটপট
> বড়দের বোকামিতে আজো প্রাণ ছটফট,
> এইবারে আমি ভাই হেরে গেছি খেলাতে,
> ফিরে গেছি দাদাদের বকুনির ঠেলাতে ;
> পরের বারেতে ভাই শুনব না কারো মানা,
> দেবই, দেবই আমি নিজের জীবনখানা ॥

এটি বেরিয়েছিল ২৮শে এপ্রিল '৪৬-এর স্বাধীনতায়। স্বাধীনতার কিশোর সভায় আর যাঁদের ছড়া ছাপা হত তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর 'এত বুলবুলি' (৯ই জুলাই '৪৬)—

কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি
বানচাল দেশ ধান চালে ঘুলবুলি
কোণঠাসা করে করেছে বোঝাই
শিস দিয়ে করে দু'হাতে সাফাই
যত পারে খায় প্রাণ আইঢাই
শুনেছি মাথার খুলি
সেও ঠাসা, গান ভুলে গেছে বুলবুলি···

এখানে অনেক এবং অনবদ্য সব ছড়া লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। যেমন 'নিবুচন্দ্রের কাহিনী' (৬ই আগস্ট, ১৯৪৬)—

কুট্টুস কট্টস মট্টর ভাজা
খাচ্ছে নিবুচন্দ্র রাজা
তার যে ঢিবুচন্দ্র মন্ত্রী
নিয়ে ফেরেন শতেক যন্ত্রী।
কোতোয়াল সে ডালিম চোখে
তালিম দিয়ে বিড়ি ফোঁকে।
সেই রাজারই জেলখানাতে
উল্লুক ভল্লুক--আড়ি পাতে।
চামচিকেরা চিমটি মারে
বাদুড় ঝোলে সারে সারে।
কয়েদীরা সব ফোঁসে ফাঁসে
নিবুচন্দ্র মুচকি হাসে।
বাঘকে রাখি লোহার খাঁচায়
মানুষ রাখি ইঁটের পাঁজায়।
মন্ত্রীর গোঁফে চাড়া দিয়ে
তারিফ করে মায়েঝিয়ে।
বলছে নিবুচন্দ্র মেসো
বিষ্যুৎবারে তিনবার কেসো।

নইলে তোমার ইঁটের পাঁজা,
হবেই সাড়ে বত্রিশ ভাজা।
কোতোয়ালের মুখটি চূণ।
রাজার রাজ্যি ভাজার গুণ ॥

১৫ই অক্টোবর '৪৬-এর কিশোর সভায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে নীহার দাশগুপ্তর 'ঘুম-পালানো ছড়া'—মা যতই ঘুম-পাড়ানি গান শোনান, খোকনমণি আর ঘুমায় না। কারণ—

চারদিকেতে পালায় যে আজ ছেলে-বুড়োর দল,
মিছামিছি ঘুমকে ডেকে কি হবে আর ফল ?
বিকেল হতেই এক দৌড়ে পালিয়ে আসেন বাবা,
রাস্তাঘাটে লালমুখো সব উঁচিয়ে আছে থাবা।
কাজ ফেলে রোজ পালায় যে ঐ শান্তমণি ঝি,
তার বেলাতে চুপ, শুধু ঘুমেরই দোষ কি ?
রাম পালাল, আর পালাল রহিম আনোয়ার,
ঘুম পালাল ঘুমের দেশে, ফিরবে নাক' আর।

সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর কিছু ছড়ার সংকলন বের করে ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস। অজস্র রঙীন ছবি দেওয়া এই বইটির নাম 'ঘুম-তাড়ানী ছড়া'। স্বাধীনতা পত্রিকায় এ'বই সম্পর্কে বলা হয়েছিল ('৪৭-এর অক্টোবরে)—"ঘুম-পাড়ানী নয়, ঘুম-তাড়ানী ছড়া ;···ছড়াগুলি পড়ে তোমারা ভাববে সেসব দিনের কথা যখন চারিদিকে 'ধান সামাল ভাই, মান সামাল' রব ; রশীদ আলী দিবসে গুলির সাথে হোলি খেলা।"

বামমহলে কিশোরদের জন্য যেসব পত্রিকা ও সংকলন বার করা হয় তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় দৈনিক 'কিশোর'-এর কথা। সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁকে সাহায্য করতেন গিরীন চক্রবর্তী। কিশোরদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল কাগজটি।

'শতাব্দীর লেখা' পরিকল্পনা করেন সরোজ আচার্য ও সম্পাদনা করেন সন্তোষ বসু। প্রচুর গল্প, কবিতা, জীবনী ও প্রবন্ধ ছিল এতে। গোপাল হালদার ছিখেছিলেন 'সোনার বাংলা'। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন সরোজ আচার্য, জোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুধী প্রধান, সুনির্মল বসু, জসীমুদ্দীন, পরিমল গোস্বামী ও বিজন ভট্টাচার্য। প্রকাশক মডার্ন

পাবলিশার্স। ১৯৪৬-এর শারদীয় সংখ্যাটি অরণিতে প্রশংসা পায়, বিশেষ করে বলা হয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'ঘুঘুকাহিনী' ও অশোক গুহর অনুবাদ নাটক 'আমরণ'-এর কথা।

'দেশবিদেশের গল্প' বোধ হয় দু'খণ্ড বেরিয়েছিল। সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

কিশোর বাহিনীর পরিণাম ঃ প্রচুর সম্ভাবনা নিয়েও কিন্তু কিশোর বাহিনী বিশেষ কিছু করে উঠতে পারল না। অথচ যেসব পাড়ায় কিশোর বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই প্রচুর সাফল্য লাভ করেছে। পাড়ার অন্যান্য ক্লাবের থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব খুবই স্পষ্ট ছিল। Boy Scout, Girl Guide, মণিমেলা, সব পেয়েছির আসর ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও আরো কিছু করার প্রয়োজনে কিশোর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। এমন একটা স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টি এবং প্রগাঢ় ও ব্যাপক জীবনচেতনা আর কোন ক্লাবেরই ছিল না ; যেসব ক্লাব ছেলেদের সিগারেট খেতে শেখার জায়গা হিসেবে অভিভাবকদের বিরাগ-ভাজন হত, তাদের তো নয়ই। কার্যক্ষেত্রেও কিশোর বাহিনী ছোটদের শরীর ও মনের চর্চায় প্রচুর সাহায্য করেছে, পাড়ার লোকের নানারকম উপকার করেছে। স্থানীয় লোকের কাছ থেকে কিশোর বাহিনী যে শুভেচ্ছা পেয়েছে তা বাহিনীর অনেকেই গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যেকোন সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন কিশোর ক্লাব, যা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও সরস্বতী পূজা করে, একটু আধটু খেলাধুলো ও সমাজসেবা করে, তার চেয়ে কিশোর বাহিনী খুব বেশী দাগ কাটতে পারল না, সার্থক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সফল শরিক হওয়া তো দূরের কথা। সবচেয়ে বড় কথা, কিশোর বাহিনী টিকলই না বেশীদিন। ১৯৪৭-এর মে মাসে সুকান্তর মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরেই স্বাধীনতার কিশোর সভাটি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কিশেরে বাহিনীর নামই আর বিশেষ শোনা গেল না।

আসলে পড়তি সুরু হয়েছিল কিছুদিন আগে থেকেই। ১৯৪৫-৪৬-এ যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ মুক্তি আন্দোলন, তেভাগা সংগ্রাম ইত্যাদি মিলিয়ে শাসক ও শোষক বিরোধী লড়াইয়ের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন, তখন থেকেই কিশোর বাহিনীর ব্যাপারে কম্যুনিস্ট উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। আমি কিশোর বাহিনীর যাঁদের সঙ্গেই কথা বলেছি তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, তখন এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আন্দোলন যখন অমন গুরুতর পর্যায়ে উপনীত, তখন কিশোরদের নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় ?

আমার কিন্তু ব্যাপারটা আত্মবিরোধী বলে মনে হয়েছে, তাহলে এঁরা এতদিন ধরে কিশোরদের নিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, রাশিয়া ও চীনের কিশোর বীরদের কথা বলে তাদের প্রেরণা দিতে চেয়েছেন, সেগুলি কি শুধুই কথার কথা ? সত্যি করেই, যখন ক্রান্তিকাল এল তখন কিশোররা তাঁদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল ?

আবার এমনও হতে পারে যে সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আবেগ যতটা ছিল, সংগঠনী প্রচেষ্টা ততটা ছিল না। তাই গণ-আন্দোলনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করতে পারত যে গণ সংগঠনগুলি তাঁদের তাঁরা অবহেলা করেছিলেন। গণনাট্য সংঘের বেলাতেও যেমন ঠিক এই ব্যাপারটাই দেখি। সেক্ষেত্রে অবশ্য মৌখিক উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না। কিন্তু কার্যত যা হয়েছে তা' অবহেলারই নামান্তর।

দু'টো মিলিয়েই বোধ হয় কিশোর বাহিনীর ব্যর্থতার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে এবং দু'টি কারণ হয়ত পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ; অর্থাৎ সংগ্রাম সম্পর্কিত সুচিন্তিত সংগঠনী প্রচেষ্টার অভাব থেকেই কিশোরদের সম্ভাব্য সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে অনবধানতা। প্রথম থেকেই বোধ হয় কম্যুনিস্টরা কিশোর বাহিনীর ওপর খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। তাঁদের অন্য যে গণমাধ্যম ক্ষেত্রগুলি ছিল সেগুলিকে সত্যি করেই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কৃষক সভা দেশের সর্বস্তরের চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ছাত্র ফেডারেশন ব্যাপকভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার পাবে—এরকম ভেবেছেন, কিন্তু কিশোর বাহিনীকে গণমাধ্যম ক্ষেত্র হিসেবে যত না ভাবা হয়েছে তার চেয়ে বেশী দেখা হয়েছে কম্যুনিস্ট পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্লাব হিসেবে।

পি. সি. যোশী হয়ত ভেবেছিলেন, নৃপেন ব্যানার্জীর কথা থেকে আমি অন্তত যা বুঝেছি, যথার্থ ও পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার উপায় ও লক্ষণ হবে কম্যুনিস্ট পরিবার, যে পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিশিষ্ট মানসিকতা ছোট থেকেই গড়ে তুলবে কিশোর বাহিনী। এরকম যত বেশী পরিবার একত্রিত হবে কম্যুনিস্ট জীবনচর্যার প্রশস্ত ক্ষেত্র। নৃপেন ব্যানার্জীর জীবন দর্শনমূলক ব্যাখ্যায় যে কথাটা বিরাট শোনায় অমূল্য পাকড়াশী যখন সেটাকেই ঘুরিয়ে সাদাসিধা করে বলেন তখন একেবারেই অন্যরকম লাগে, তিনি বলেন, কম্যুনিস্ট পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির ক্লাব হিসেবে কিশোর বাহিনী তৈরী হয়। এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আরো অনেক কথা

কাগজে কলমে লেখা হত। জ্ঞানত হয়ত কোন কপটতা ছিল না, কিন্তু ওসব কথাকে কোনদিন সত্যকারের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এবং এই পরিবারবোধটা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সাহায্য করে সেটা তর্কের বিষয়। ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনে একটা সীমা পর্যন্ত হয়ত এর কার্যকারিতা আছে, কিন্তু ব্যাপক গণমুখিতার মানসিকতা থেকে দূরে ঠেলে দেবার বিপদও এতে থেকে যায়। ১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বি টি রণদিভে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন পি. সি. যোশীর আমলকে যে সুখী পরিবার গড়া কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্য নয়, তারা গণ-আন্দোলন চালনা করবে। ছোট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধতা ও গণ-আন্দোলনের ব্যাপারে ব্যর্থতা কম্যুনিস্টদের সর্বক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় কিশোর বাহিনী।

অবশ্য রণদিভের আমলে সৌহার্দ্যের বদলে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া তৈরী করে এ সমস্যায় সমাধান করা যায় নি, বরং তা তীব্রতর হয়েছে। আর ১৯৪৮-৪৯ নাগাদ তো বৈপ্লবিক তাগিদে কিশোর বাহিনীকে একেবারে তুলেই দেওয়া হল। রাতারাতি বিপ্লবের সঙ্গে ওসব ছেলেমানুষি ব্যাপারকে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো চলে না।

নৃপেন ব্যানার্জী অবশ্য কিশোর বাহিনী সম্পর্কিত কম্যুনিস্ট নীতির সমর্থনে দু'একটি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমত. সংগঠন হিসেবে ছাত্র ফেডারেশন অতিক্রম করেছিল কিশোর বাহিনীকে এবং ছাত্র ফেডারেশন যেহেতু সাফল্যের সঙ্গে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই কারণে কিশোর বাহিনীর দিকে আলাদা করে নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নি। বামপন্থীরা স্কুলে স্কুলে ঘাঁটি তৈরী করেছিল। ১৯৪৫-৪৬-'এর কলকাতায় এরকম অনেক স্কুলই ছিল। কিন্তু ঘাঁটিগুলি সবসময় যে কিশোরবাহিনীর ধ্বজাধারী ছিল তা' নয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৫-৪৬-এ যখন প্রবল সংগ্রামের স্রোত এল, এখন সেই স্রোতধারায় সকলেই ভেসে গেল, অনেক কিশোরও। আলাদা করে কিশোরবাহিনী বলে কিছু রইল না।

কিন্তু স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে ; সেই সংগ্রামী স্রোত শেষপর্যন্ত সাগরে গিয়ে পড়ল না কেন ? নৃপেন ব্যানার্জীও সাংগঠনিক দুর্বলতা ও আরো মূল কারণ হিসেবে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির কথা বলেছেন। স্বীকার করেছেন, ঐ ব্যাপক সংগ্রামের পর মুহূর্তে পাড়ায় পাড়ায় কিশোর স্তরে আলাদা

সংগঠন করা উচিত ছিল ? করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যেত, কিন্তু করা হয় নি।

অবশ্যই কিশোর বাহিনী রাতারাতি উবে যায় নি। সুকান্তের মৃত্যুর পরে, এমনকি রণদিভের আমলের কিছুদিন পর্যন্ত, শ্যামবাজার শাখার নেতৃত্বে কাজ করে গেছে আরো বেশ কয়েকটি শাখা। এমন কি এই প্রথম তারা সমগ্র কিশোর বাহিনীর মুখপত্র হিসেবে একটি মাসিক পত্রিকা বের করল, নাম 'নতুন দিন'। সম্পাদক অশোক ভট্টাচার্য ( সুকান্তর ছোট ভাই ) ও দিব্য-নারায়ণ ভট্টাচার্য। এই পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ( আগস্ট, ১৯৪৮, সুকান্ত স্মরণ সংখ্যা ) দেখেছি পাঁচ বছরের পুরোনো বেকুড়া (শ্রীহট্ট), বালী ( হাওড়া ) ও হাটখোলা ( শোভাবাজার খ্রীট, কলকাতা ) শাখার কাজকর্মের খবরের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা) ছাত্রনেত্রী মলিনা দত্তের সভানেত্রীত্বে নতুন করে কিশোরবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা। 'স্বাধীন' ভারতে কিশোরদের চরম হতাশার প্রতিবিধানের দাবীতে নৈহাটীতে (২৪ পরগণা) খগেন্দ্রনাথ মিত্রর সভাপতিত্বে আসন্ন কিশোর সম্মেলনের (২৬ সেপ্টেম্বর) খবর এখানে আছে তেমনি আছে তৎকালীন অতিবামপন্থী উগ্রতায় আনন্দমেলার 'মৌমাছি' ও যুগান্তরের 'স্বপনবুড়ো'কে 'মতলববাজ' ও 'দালাল' বলে আক্রমণ—তাঁরা ৯ই সেপ্টেম্বরের ছাত্র ধর্মঘটের নিন্দা করে কুৎসিত 'কলমবাজি' করেছেন বলে।

কিন্তু এই সময়টাতে কিশোর বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল পুরোপুরি ছোটদেরই হাতে। ছাত্র ফেডারেশন বা কম্যুনিস্ট পার্টির কেউ-ই তাদের জন্য সময় দিতে পারতেন না। নৃপেন ব্যানার্জী প্রমুখ একসময়কার কিশোর বাহিনীর নেতারা তখন অন্য কাজে ডুবে আছেন এবং তাঁরা মনেই করতে পারেন না ঐ সময়ে কিশোরবাহিনী আদৌ ছিল না। পার্টি তখন বেআইনী। সুতরাং কিশোর-দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সাংগঠনিক অসুবিধেও ছিল। অশোক ভট্টাচার্য সেই সময় বয়সে কিশোর এবং বাহিনীর শ্যামবাজার শাখার কর্মী। তিনি বলেন, কিছুদিনের মধ্যে এক কম্যুনিস্ট 'দাদা' ডেকে বললেন, "এখন বিপ্লব করে নাও। পরে এসব করবে।" সুতরাং কম্যুনিস্টদের কর্মপন্থার প্রয়োজনেই কিশোর বাহিনী উঠে গেল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে যে নেতৃত্ব শূন্যতার পর্ব সুরু হয়েছিল এই হল তার চূড়ান্ত উপসংহার।

# অবিভক্ত বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদের সাম্যবাদী মতবাদে উত্তরণ (১৯২৮-'৩৫)

দেবব্রত মজুমদার

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বাংলাদেশের বিপ্লবী যুব সমাজের মধ্যে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হল। বাংলা ও উত্তর ভারতের তরুণ সংগ্রামী কর্মীরা এই ব্যর্থতার যুগে পথ না পেয়ে আবার ফিরে যেতে চেষ্টা করলেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী সন্ত্রাসবাদী, রাজনীতিতে। বাংলাদেশে যুগান্তর-অনুশীলন ও অন্যান্য দলের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলেন। এদের সঙ্গে যুক্ত হলেন উত্তর ভারতের প্রবীন বিপ্লবী শচীন সান্যাল, গড়ে উঠল নিউ ভায়োল্যান্স পার্টি (১৯২৫)। উত্তর ভারতে একই সময়ে আত্ম প্রকাশ করল হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মি। সাম্রাজ্যবাদ পাল্টা আক্রমণ হানল; শুরু হল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা।

প্রায় ঐ একই সময়ে জাতীয় আন্দোলনে সংযোজিত হয়েছিল আর একটি ধারা। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে সমাজতন্ত্রী ভাবধারা ছাপ ফেলতে শুরু করেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামী সৈনিকদের মধ্যে, জন্ম নিয়েছে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। চটকল, রেলপথ ও কয়লা খনিতে সুরু হয়েছে ধর্মঘট (১৯২০-২২)।

বিশের দশক থেকেই এই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ধীরে ধীরে হলেও বাংলার বিপ্লবীদের একাংশকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। ১৯২২-এ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে নলিনী গুপ্তের ও অবনী মুখার্জীর ভারতে আগমন, ১৯২৪-এ কানপুর বোলশেভিক মামলা, ১৯২৫-২৬-এ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোপেন চক্রবর্তীর ভারতে ফেরা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করল। ডঃ দত্ত বাংলার যুব-ছাত্রদের মধ্যে নিরলসভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রচার চালালেন।[1]

গোপেন চক্রবর্তী ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে অনুশীলনসহ কর্মীদের সম্মেলনে পুরানো পথের পরিবর্তে নতুন পথের নির্দেশ দিলেন। গণআন্দোলনের দিকে একটা ঝোঁক অনুশীলনের কিছু কর্মীর মধ্যে দেখা দিল। প্রভাত চক্রবর্তী কুমিল্লায় 'House of Labourer'. ধরণী গোস্বামী আসামের চেরাপুঞ্জিতে 'Cooperative farming' গড়ে তুললেন; তবে তারা তখনও পুরোপুরিভাবে পুরানো পন্থা ত্যাগ করেননি।[২] কিন্তু দাদাদের এই নতুন চিন্তাধারা পছন্দ হলনা, ধরণী গোস্বামীরা অনুশীলনের সঙ্গে সংশ্রব পরিত্যাগ করে গড়ে তোলেন কৃষক-শ্রমিক দল (১৯২৬)। এই দলের প্রতিনিধি হিসাবে সৌমেন ঠাকুর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন।[৩] হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মির বটুকেশ্বর দত্ত কোলকাতায় এলে এদের ডেরায় উঠতেন, এ খবর গোয়েন্দা দপ্তরের।[৪]

দাদাদের গোঁড়ামি সত্ত্বেও সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা অনুশীলন-যুগান্তর প্রভৃতি দলের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সে যুগের অনুশীলন ছাত্রনেতা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ছাত্রাবস্থায় তিনি জন রীডের **দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন** এবং লেনিনের **ইম্পিরিয়ালিজম** পড়ে সাম্যবাদের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত **বাংলার বাণী** পত্রিকায় 'লেনিন ও রুশ বিপ্লব' এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও 'আমাদের ভবিষ্যত' নামে দুটো প্রবন্ধ রচনা করেন।[৫] ঠিক একই সময়ে বাংলার বিপ্লবী তরুণদের একটি অংশ যাঁরা সমাজবাদের দিকে ঝুঁকছিলেন তাঁরা গড়ে তোলেন ইয়ং কমরেড লীগ, পরবর্ত্তীকালে এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে মণি সিংহ, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তীরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, সাম্যবাদী চিন্তাধারা নানাভাবে সংগ্রামী তরুণদের আকৃষ্ট করলেও মধ্যবিত্তের গণ্ডীতে আবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলন বোমা পিস্তলের রোমান্স ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি।[৬] 'Active heroes' ও 'Passive masses' এই থিয়োরী তখনও তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বিপ্লবী পথ-জিজ্ঞাসার গুণগত পরিবর্তন এল ১৯২৮-২৯ নাগাদ। এই সময়ে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা তখন শ্রমিক আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ। কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, ফিলিপ স্প্রাটের নেতৃত্বে বাংলা চটকল শ্রমিকদের দীর্ঘ ছয়মাস ব্যাপী ধর্মঘট, কোলকাতার বুকে লিলুয়ার রেল শ্রমিকদের দৃপ্ত মিছিল, গাড়োয়ান ধর্মঘট সেদিন বাংলার সংগ্রামী

যৌবনকে সচকিত করে তোলে। রণেন সেন লিখছেন,ঃ "হাজার হাজার হরতালী শ্রমিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুধু শহরকে কাঁপায়নি, আমাদের তরুণ মনকেও অনুপ্রাণিত করেছে।"[৭] তবে শ্রমিকদের ভূমিকা তখনও পর্যন্ত এই তরুণ মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি, যদিও কিন্তু কিছু বিপ্লবীগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন বিপ্লব জিজ্ঞাসা শুরু হয়ে গেছে। ১৯২৯-এর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এই জিজ্ঞাসাকে আরও একটু তরান্বিত করে তুলেছিল। আদালত কক্ষে কমিউনিস্টদের দৃপ্ত আত্মপক্ষ সমর্থন সমগ্র দেশবাসী, বিশেষ করে তরুণ সমাজের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

এদিকে ১৯২৮ নাগাদ বিপ্লবীরা দলে দলে দেশ থেকে বেরিয়ে এলেন। দাদারা রণক্লান্ত, একটু আরাম আয়াসে দিন কাটাতে চান, কিন্তু তরুণ মন বিক্ষুব্ধ—তারা কাজ চান, চান একটা বড় ধরনের কিছু করতে, যদিও ততদিন তাদের অনেকে সরবে সমাজবাদের কথা বলতে শুরু করেছেন। কোলকাতা কংগ্রেসে তারা একত্রিত হয়ে দাদাদের অমতেই দলমত নির্বিশেষে একসঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প নিলেন, প্রস্তুতি নিলেন শত্রুর চরম আঘাত হানার। তবে এরা তখনও দোটানায় ভুগছেন—পুরাণো পক্ষের পিছু টান রয়েছে, আবার সাম্যবাদী চিন্তাও তাদের টানছে ; এরা শেষ পর্যন্ত একটা "খিচুড়ী রাজনীতির আশ্রয় নিলেন ; পুরানো বিপ্লববাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের খাদ মিশিয়ে।"[৮] ইতিহাসে এই মতবাদের প্রবক্তারাই 'টেরো কমিউনিস্ট' নামে পরিচিত। উত্তর ভারতে এদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়েশান'। ১৯৩৩-এ এই দল করাচী কংগ্রেসে সন্ত্রাসবাদের বদলে সমাজবাদকে ধ্রুবতারা বলে ঘোষণা করল, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিল, যদিও তাদের তরফে অভ্যস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

ইতিমধ্যে বাংলা জুড়ে সুরু হল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিনয় বাদল-দীনেশের নেতৃত্বে রাইটার্স অভিযান ও মেদিনীপুরে একের পর এক ম্যাজিস্ট্রেট নিধন। সরকারী প্রত্যুত্তর হল ব্যাপক ধরপাকড়, জেল, আন্দামান।

স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এই টেরো-কমিউনিস্টরা সমাজবাদের প্রতি যথেষ্ঠ আকর্ষণ সত্ত্বেও পুরানো পথেই পা বাড়ালেন কেন ? এর উত্তর দিয়েছেন সে যুগের বিপ্লবী তরুণ ও এ যুগের কমিউনিস্ট কর্মী সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। তাঁর মতে, 'প্রথমত, গান্ধী সম্পর্কে ও কংগ্রেসের দক্ষিণ-

পন্থী নেতৃত্বের কার্যকলাপের ফলে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যর্থতায় কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবীদের ততদিনে মোহমুক্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বামপন্থা এতো দুর্বল ছিল যে, এই তরুণ বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত কেউ ছিলেন না। তৃতীয়ত, মীরাট-মামলায় কমিউনিস্টদের ভূমিকায় তাদের রক্তে দোলা লেগেছিল এবং চতুর্থত, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তখনও এদেশে কোন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি, বা কমিউনিস্ট আন্দোলনে তখনও লেনিনের কাছাকাছি ও কোন সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্ম হয় নি, যারা নূতন সূর্যালোকের পথ দেখাবেন।[৯]

যাই হোক, ১৯৩০-৩২ নাগাদ নূতন করে এবং ব্যাপকভাবে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে সুরু হল আত্মজিজ্ঞাসা। ভগৎ সিংহ, যতীনদাস, সূর্য সেনের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ তখন পরাজিত। হাজার হাজার ছাত্র-যুব কর্মী, কি কংগ্রেসী, কি বিপ্লবী এদের মধ্যে সুরু হল আত্মসমীক্ষা ঃ এত রক্ত, এত আত্মত্যাগ! এর পরিবর্তে আমরা কি পেলাম? কিসের জন্য এত কষ্ট স্বীকার? আমরা কি স্বাধীনতার কাছাকাছিও আসতে পেরেছি? এর পরই বা কি?—এই চিন্তাই ওদের কুরে কুরে খাচ্ছিল।[১০] সর্বত্রই দলমত নির্বিশেষে জানাল, পুরাণো পথ সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় আর আত্মজিজ্ঞাসা—কারাগারে, বন্দী শিবিরে, সুদূর আন্দামানে। জওহরলালের আত্মজীবনী ও সুভাষচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল ও এ যুগের সন্দেহ, সংশয় ও নূতন পথ সন্ধানের জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে।

বিভিন্ন কারাগারে ও বন্দীশিবিরে যে আত্ম বিশ্লেষণ সুরু হল, তার পিছনে—সামান্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কোলকাতা কমিটির। ১৯৩৩ সালে কোলকাতা কমিটি বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে—Indian Revolution and our Task—An Appeal। এ পুস্তিকায় বিপ্লবীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও দুরন্ত স্পর্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েও এদের ভ্রান্ত পথের সমালোচনা করে এবং ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে গণসংগ্রামের মঞ্চে সমবেত হতে আহ্বান জানান হয়।[১১] ছোট পার্টি ও তার নেতা আব্দুল হালিম ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে গোপনে জেলে, বন্দী শিবিরে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন, পার্টির তরফে মার্কসবাদী পত্র-পত্রিকা পাঠানো হল। ফলে বন্দীরা নতুন চিন্তার খোরাক পেলেন। গভীর আত্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে চলল মার্কসবাদের চর্চা। সর্বত্র গড়ে উঠল স্টাডি সার্কেল কমিউনিস্টদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায়।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ—গোটা দুনিয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গভীর সংকট, বেকারহীন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, চীনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরামহীন সংগ্রাম, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ফ্যাসীবাদের জঙ্গীপনা, জর্জি ডিমিট্রভের সাহসের সঙ্গে ফ্যাসীবাদের মোকাবিলা ও ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা বন্দীদের চিন্তার জগৎ তোলপাড় করে ফেলল।[১২] সীমাবদ্ধ সুযোগেব মাঝে সুরু হল গভীর আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও পথের সন্ধান। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি পড়ার ধূম পড়ে গেল।

পড়াশুনার ব্যাপক চল মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, তারা অগ্রণী হলেও, অন্যান্য জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীও সুরু করলেন আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক। আন্দামানের কথা বলতে গিয়ে বিপ্লবী নলিনী দাস লিখছেন ঃ "প্রথম দিকে পড়াশুনার ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছে···মাথা গরম হয়ে গেছে, উধাও হয়েছে রাতের ঘুম, তবু প্রতিদিন উন্মাদের মতো পথের সন্ধানে ১২-১৪ ঘণ্টা পড়েছি।···এই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট মতবাদ যে একটা বিজ্ঞান···বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়েই যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—তা ক্রমেই বুঝতে শিখলুম।"[১৩]

বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী বলেন, "প্রথম বয়েসে দেশের দুঃখ মোচনের জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে জীবনের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম ; সেদিন মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো।[১৪] আন্দামানে বসে মার্কসীয় সাহিত্য পড়ে বুঝলেন, "সংসার জীবন যাত্রার পথে ভগবানের কোন স্থান নেই। সংগঠিত সমষ্টিগত, প্রীতিময়, সাম্যময় সমাজজীবন সাধনাই মানবের মুক্তি সাধনা। কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থাই তার যথার্থ পরিণতি।[১৫]

আন্দামানে কমিউনিস্ট কিচেনে যেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সাধারণ মান অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাল করে পড়ান হত। ক্লাসে যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। মার্কসবাদী বই পত্তরের চাহিদা এতই বেড়ে গেল, যে তা হাতে হাতে কপি করে পড়তে হত।[১৬]

অনুশীলন কিচেনে সাধারণভাবে মার্কসবাদী পড়াশুনা চললেও, যুগান্তর বি. ভি. এরা প্রধানত জাতীয় ইতিহাস ও ফ্যাসীবাদী বইপত্তর পড়াশুনা করতেন। তবে পড়াশুনার চেয়েও তাদের বেশী চেষ্টা ছিল দল ঠিক রাখার দিকে।

অন্যত্র, হিজলী, বক্সা, দেউলী বা বহরমপুর বন্দীশিবির বা জেলেও

ব্যাপক পড়াশুনা সুরু হল—এখানেও প্রাথমিক উদ্যোগ আসে কমিউনিস্টদের তরফ থেকে। ভবানী সেন, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী, আবদুর রাজ্জাক খাঁ, আবদুল মোমিন, বঙ্কিম মুখার্জী ও প্রমথ ভৌমিক এরাই ছিলেন উদ্যোক্তা। যা খবর পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায়, গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্য Anti-Duhring, Capital, Economic Theory of the Leisure, An Introduction to the Critique of Political Economy, Socialism—Utopian and Scientific, Poverity of Philosopy প্রভৃতি মার্কসীয় ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও পৃথিবীর অপরাপর দেশের গণবিপ্লবের ইতিহাস পড়ান হত।[১৭]

মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টরা যে আলোড়ন তুললেন, বিপ্লবী দাদারা তার ফলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দল যে রাখা দায়! প্রতিটি জেলে দিনে দিনে কমিউনিস্টদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, দাদাদের মাথা ততই গরম হয়ে উঠল। অনুশীলন-যুগান্তর তাদের দীর্ঘকালের মতান্তর-মনান্তর স্থগিত রেখে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কমন ফ্রন্ট গড়ে তুললেন। প্রথমে নিজেদের দল রাখতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে দিলেন; তাতে কাজ হল না দেখে ছেলেদের নির্দেশ দিলেন, কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু, ওদের সঙ্গে মেশা চলবে না।[১৮] হিজলীতে যুগান্তর একটা ন্যাড়ী কুকুরের নাম রেখেছিল ষ্ট্যালিন।[১৯] সর্বত্র চলল কমিউনিস্টদের উপর নির্যাতন। তা সত্ত্বেও সবল দাদারা দল রাখতে পারলেন না, দলে ধ্বস নামল, তখন সুরু হল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শারীরিক আক্রমণ। ১৯৩৪-এ দেউলীতে অনুশীলনের সুবোধ মুখার্জী ও বি. ভি.-র ক্ষিতীশ ভৌমিক দাদাদের উস্কানিতে ভবানী সেন, পাঁচু ভাদুড়ী ও জীবন মাইতির রক্ত ঝরাল।[২০] হিজলীতেও অনুশীলন-যুগান্তর-বি. ভি-র মিলিত আক্রমণের শিকার হলেন কমিউনিস্টরা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল আন্দামানে। রক্তাক্ত হলেন সীতাংশু দত্ত রায়; তাঁর অপরাধ তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে বড্ড বেশী মেলামেশা করছেন।[২১] এসব সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হল না। সব দলেই ভাঙ্গন এল—অনুশীলন, যুগান্তর, বিপিন গাঙ্গুলীর দল, শ্রীসংঘ, বি. ভি.-এর সব শেষে চট্টগ্রাম দলে। সব জেলে ও সব বন্দী শিবিরে ১৯৩৪-৩৬-এর মধ্যে গড়ে উঠল কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ, আজকের দিনে সহজ মনে হলেও, সেযুগে তা মোটেই সহজ ছিল না। এই উত্তরণ পর্বে কেটেছে অনেক

বিনিদ্র রজনী, মানসিক যন্ত্রণায় হৃদয় হয়েছে আরক্তিম। একদিকে ছিল পুরানো দলের প্রতি আনুগত্য, দলনেতা ও সহযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, এতদিনকার কর্মপদ্ধতির প্রতি টান ; অন্যদিকে সমাজবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, ভাববাদী দর্শন থেকে বস্তুবাদী দর্শনের দিকে যাত্রা ও সর্বোপরি আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আনুগত্যবোধ—এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে এঁদের মন রক্তাক্ত হচ্ছিল। কোন পথ সঠিক, কোন পথে এরা এগোবেন ? পুরাতন ধ্যান-ধারণা এবং আনুগত্যবোধ তখন দুরতিক্রম্য বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এক একটি হৃদয়, এক একটি রাত্রি, এক একটি অস্থির রণাঙ্গণে পরিণত হয়েছিল। এই মানসিক অস্থিরতার পরিচয় মেলে সতীশ পাকড়াশীর লেখা থেকে, "বদ্ধমূল কতগুলি ধারণা এ বয়েসে ছেড়ে দিতে মন আমার কিছুতেই সায় দেয়নি। পুরান চিন্তা ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে নতুন যুক্তি বুদ্ধি অবিরত যুদ্ধ করেছে, হেরেছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, জিতেছে।"[২২]

লেবং ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মধু ব্যানার্জী বলেন, "যতই পড়ছি, ততই যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এক একবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, নতুন মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও কেন ঘোষণা করতে পারছি না। লেপিডাস পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে চলে যাই। তখনই দাদাদের মুখ ভেসে উঠল ; ভেসে উঠল যারা ফাঁসি গেছে, তাদের করুণ চাহনি। এরা আমায় কি বলবে ? বিশ্বাসঘাতক ? দাদাদের প্রতি ভালবাসা দলের প্রতি আনুগত্য আমায় পিছু টানছে, যদিও বুঝেছিলাম এককভাবে মুক্তি নেই।[২৩]

মার্কসবাদী সাহিত্য কিভাবে জেলখানা আসতো, এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। বিপ্লবীদের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ থেকে বিপ্লবী যুবশক্তিকে ফেরাবার জন্যই জেলখানায় দরাজ হাতে মার্কসীয় পত্র-পত্রিকা দেওয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছিলেন এবং পরে মার্কসবাদ ও সমাজ বিপজ্জনক মনে হওয়ায়, তা বন্ধ করে দেন।[২৪] কথাটা সর্বাংশে সত্যি নয়। কেন না, সরকারী গোপন দলিল থেকে জানা গেছে, এ ব্যাপারে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না, সবকিছু নির্ভর করত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর। ১৯৩৩-এ হিজলী বন্দশিবিরে বাদ্যযন্ত্রের উপর লেখা বই **তবলা তরঙ্গিণী** দেওয়া হয়নি, কেননা 'তরঙ্গ' শব্দটাই কর্তৃপক্ষের মনে আতংক সৃষ্টি করেছিল।[২৫] আবার ১৯৪২-এ প্রেসিডেন্সি জেলে **ক্যাপিটেল** পড়তে দেওয়া হয়েছে, নিছক অঙ্কের বই ভেবে।[২৬] হাসির ব্যাপার হলেও সত্যি যে,

আন্দামান সেলুলার জেলে এঙ্গেলস্‌-এর Private Property and State বইটি বাজেয়াপ্ত করেও, জেলার আবার মন্তব্য সহকারে ফেরৎ দিয়েছে, "Bad, very bad. No love, no adventure. It induces sleep."[২৭] ১৯৩২-এ Sea Custom Act-এ কমিউনিজম সংক্রান্ত বইপত্র আমদানী নিষিদ্ধ করা হলেও, বিপ্লবীরা চোরা গোপ্তা পথে মার্কসীয় সাহিত্য আনাতেন। সরকারী রিপোর্টে বলা হচ্ছে, একমাত্র ১৯৩৪-এ ১৫,০০০ কপি ঐ সংক্রান্ত বই বাজেয়াপ্ত করা হয়, যেগুলি নাকি **নিউইয়র্ক টাইমস্‌**। নিউইয়র্ক হেরল্ড প্রভৃতি পত্রিকার মলাট লাগিয়ে ভারতে চালান দেওয়া হয়েছিল।[২৮] কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'কমলালয়' বা 'তারা স্টোর্স'-এর মাধ্যমে বই পাওয়া যেত।[২৯] দেউলী-তে বই যোগান দিত তরকারী ভেণ্ডার 'সোরাবজী কোম্পানী'।[৩০] বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও, সরকার ফাঁস আলগা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রশ্নপত্র রচনা করা হত, তার উত্তর দিতে এবং পরীক্ষার স্বার্থে অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষকেও মার্কসবাদী গ্রন্থাদি জেলখানায় প্রবেশাধিকার দিতে হয়েছে।[৩১]

যাই হোক, অনেক আত্মবিশ্লেষণ, গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীরা জেলে দলে দলে কমিউনিস্ট হলেন; যারা জেলে হলেন না, তারা বাইরে এসে হলেন। কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিকতাবাদ, গণসংগ্রামের চেহারা উত্তাল শ্রমিক ধর্মঘট, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, বিশেষত মানবমুক্তির বেদীমূলে ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেডের আত্মবলিদান, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি তাদের আকর্ষণ করল। প্রথমদিকে কমিউনিস্টদের বিপ্লবীদের প্রতি কিছুটা সংকীর্ণ মনোভাব থাকলেও, সপ্তম কংগ্রেসের পর সংকীর্ণতামুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ তুললো, বিপ্লবীদের পার্টিতে যোগ দেবার আর কোন বাধাই রইল না। সরকারী গোপন দলিল থেকে জানা যায়, ১৯৩৪-৩৮-এর মধ্যে মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীদের শতকরা ২৫ ভাগই কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখালেন।[৩২] একই দলিলে বলা হয়েছে ১৯৩৮-এর মতে কেবলমাত্র ছাত্র ফ্রণ্টে সাধারণ সভ্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৫ হাজারে। এরাই হল পার্টির শক্তিশালী স্তম্ভ।[৩৩] পার্টিতে এলেন না অনুশীলনের একটা বড় অংশ, যারা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে দেউলীবাদী শিবিরেই পত্তন করলেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল; এরা আজও রইলেন কমিউনিস্টদের থেকে কিছুটা দূরে, তবে সহযাত্রী হিসেবে। সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন, যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, তাঁরা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব

ফ্রন্টে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে কাজ করলেও, সবাই যে পুরান মতাদর্শগত উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তা বলা যাবে না। কেননা, তা হলে ১৯৪৮-৪৯ বা তার পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্টদের বামপন্থী হঠকারী নীতি ও কার্যকলাপের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না।

## সূত্র-নির্দেশিকা


১ F. P. Mackinty: *Terrorist Conspiracy in Bengal from Ist July to 31st December, 1927* Cal. 1928, P. 11

২ প্রভাত চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, কলিঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮১

৩ সৌমেন ঠাকুর: **যাত্রী**, কলিঃ, ১৯৭৫, পৃঃ ৯২

৪ DIG, I B file 1931 Note on Terro-communist conspiracy

৫ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলিঃ ডিসেম্বর ১৯৮১

৬ রণেন সেন: **বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, ১৯৩০-৪০**, কলিঃ ১৩৮৮, পৃঃ ২১

৭ ঐ, পৃঃ ২২

৮ ঐ, পৃঃ ২৩

৯ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার: *In search of Revolutionary Ideology and a Revolutionary Programme*, New Delhi 1979, pp 194-96 ও লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১০ মাখন পাল: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলিঃ ডিসেঃ ১৯৮১

১১ *Indian Revolution and our Task—An Appeal of the Calcutta Committee of the C.P.I*, Cal. 1933, p-4

১২ নলিনী দাস: **দ্বীপান্তরের বন্দী**, কলিঃ ১৯৭৪, পৃ ৮৭

১৩ ঐ, পৃঃ ৯৯

১৪ সতীশ পাকড়াশী: **অগ্নিযুগের কথা**, কলিঃ ১৩৭৮, পৃঃ ২২১

১৫ ঐ, পৃঃ ২৩৭

১৬ নলিনী দাস, ঐ, পৃঃ ১৫১-৫২

১৭ তিনকড়ি মুখার্জীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, চন্দনমগর, নভেম্বর ১৯৮১

১৮ জিতেন ঘোষ, **জেল থেকে জেলে**, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃঃ ১৩০-১১০
১৯ বিভূতি গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলিঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
২০ প্রমথ গুপ্তের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, কলিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ও লেখকের কাছে সুধাংশু অধিকারীর চিঠি, ত্রিবেণী ৩ঃ. ১২.৮১
২১ সীতাংশু দত্তরায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, কলিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১
২২ সতীশ পাকড়াশী, ঐ, পৃঃ ২২৩
২৩ মধু ব্যানার্জীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, কলিঃ, আগষ্ট ১৯৮১
২৪ জিতেন ঘোষ : **জেল থেকে জেলে**, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৪
২৫ বিভূতি গুহ : সাক্ষাৎকার
২৬ বিজয় মোদকের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার, হুগলী, নভেম্বর, ১৯৮১
২৭ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পৃঃ ২৬৯
২৮ *India and Communism,* Rev. ed. Simla, 1936, pp. 296-298
২৯ প্রমথ গুপ্ত, সাক্ষাৎকার
৩০ ঐ,
৩১ *Calcutta University Question Papers 1935,* Cal. 1940 P 428
৩২ R. E. RAY : *Notes on the policy and Activities of the Terrorist Patries in Bengal from 1937 to August 1939,* Cal. 1940, P 14
৩৩ ঐ, পৃঃ ১৬

# কোঙ্কনের একটি প্রাচীন মঠ

রণবীর চক্রবর্তী

১

ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে যে দীর্ঘ উপকূল নেমে গিয়েছে কচ্ছের রাণ অঞ্চল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, যেন উপকূল মসৃণ নয়, বরঞ্চ ভঙ্গুর। আর সেই উপকূলের প্রায় সমান্তরালভাবে মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে কেরালা পর্যন্ত চলে গিয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। ভঙ্গুর তটরেখার জন্য আরব সাগরের ঢেউ প্রায়ই ঢুকে পড়ে উপকূলের খানিকটা ভিতরে, অনেকটা খাড়ির আকারে। তাই দেশী বিদেশী জলযান এই উপকূলের ভিতরে বেশ কিছুটা চলে গিয়ে পেয়ে যায় নিশ্চিন্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সেই হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকে ইওরোপীয় বণিকদের সময় পর্যন্ত বাণিজ্যের—বিশেষত সমুদ্র বাণিজ্যের—রমরমা প্রায় অনবসিত। অন্যপক্ষে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বলে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু আরব সাগরের আর্দ্রতা আহরণ করে মেঘ পৌঁছে দেয় পশ্চিমঘাটের পাহাড়ে। ফলে বর্ষণসিক্ত ও স্নিগ্ধ এই উপকূল, অন্তত মহারাষ্ট্র থেকে কেরল পর্যন্ত। এই পশ্চিম উপকূলের একাংশের একটি প্রাচীন নাম ছিল 'অপরান্ত'। 'অপর' কথার সাধারণ মানে অন্য, অ-সাধারণ অর্থে পশ্চিম, 'অন্ত' বলতে বোঝায় সীমা, অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম সীমার দেশ। 'অপরান্ত' কথার ভৌগোলিক সংজ্ঞা নানা সময়ে নানা রকম।[১] তবে সাধারণভাবে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ও সহ্য পর্বতের (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) সংলগ্ন দেশকেই অপরান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অপরান্তের অন্তর্গত একটি নূতন স্থান নামের

আবির্ভাব ঘটল ঃ কোঙ্কন বিষয় ( =জেলা )। কোঙ্কন বলতে সচরাচর গুজরাটের দিউ থেকে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলকে চিহ্নিত করা হয়। 'কোঙ্কন' নামটিও অপরান্তের মতই নানা যুগে আয়োজন বেড়েছে, কমেছে।[২]

বৃহত্তম সংজ্ঞায় কোঙ্কনের দক্ষিণপ্রান্ত কর্ণাটকের উত্তরাংশের উপকূল ছুঁয়েছে, উত্তরের সীমা গুজরাটের নৌসারী অবধি এগিয়েছে। যে প্রাচীন মঠ নিয়ে আজকের এই আলোচনা তার অবস্থিতি উত্তর কোঙ্কনের সঙ্গনে ঃ মহারাষ্ট্রের নানা জেলার একটি প্রাচীন অঞ্চল সঙ্গন।

২

ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে নিতান্ত বিরল ঘটনা নয়। তবে বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন মঠ, বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি, সংখ্যায় নিয়মিতভাবে বাড়তে শুরু করে ভারত ইতিহাসের আদি মধ্যযুগে ( অর্থাৎ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে )। আদি মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম তথা সমাজের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে ( যথা ঃ মঠ, মন্দির, বিহার ) নিষ্কর ভূমিদান। ভূমিদান করলে পুণ্যলাভ হয় ও অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটে, সে কথা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বারবার বলা হয়েছে। তাই শাসকগোষ্ঠী, কখনও কখনও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আবার কখনও বা সাধারণ মানুষও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি দান করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমকালীন শাসকের দ্বারা ভূমিদান তাম্রশাসনে 'পট্টীকৃত'—আজকের ভাষায় রেজিস্ট্রেশন—করা হ'ত।

উত্তর কোঙ্কনের যে প্রাচীন মঠটির কথা এখানে আলোচিত হবে, সেই মঠেও অনুরূপ নানা দান করা হয়েছিল। সেই দানের ঘটনার মধ্য দিয়ে মঠটির ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা দেয়। মোট পাঁচটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে ঃ যার কালের ব্যাপ্তি শকাব্দ ৮২৮ থেকে শকাব্দ ৯৭৫ ( অর্থাৎ ৯২৬ খ্রীঃ থেকে ১০৫৩ খ্রীঃ )। অতএব ১২৭ বছরের ইতিহাসের আকর এই পাঁচটি তাম্রশাসনে বিধৃত। সব দলিলই থানা জেলার চিনচানি গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

(ক) রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্রের তাম্রশাসন (৮৪৮ শকাব্দ—৯২৬ খ্রীঃ)

(খ) রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের তারিখ বিহীন তাম্রশাসন (তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকাল ৯৩৯-৯৬৭ খ্রীঃ)

(গ) শিলাহার ছিত্তুরাজের অধীনস্থ সামন্ত চামুণ্ডরাজের তাম্রশাসন (শকাব্দ ৯৫৬-১০৩৪ খ্রীঃ)

(ঘ) মোঢ়বংশীয় বিজ্জলের তাম্রশাসন (৯৬৯ শকাব্দ = ১০৪৭ খ্রীঃ)

(ঙ) মোঢ় বংশীয় বীজলের (= বিজ্জল) তাম্রশাসন (৯৭৫ শকাব্দ = ১০৫৩ খ্রীঃ)

এই পাঁচটি দলিলেরই সম্পাদনা করেছিলেন ভারতীয় পুরালেখবিদ্যার প্রবাদপুরুষ দীনেশচন্দ্র সরকার।[৩] একটি তাম্রশাসন (গ) সম্পাদনার কৃতিত্ব অপর এক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের ভি. ভি. মিরাশি।[৪] তাম্রশাসনগুলির মুখ্য উপজীব্য যদিও ভূমিদান এবং একটি মঠকে অন্যান্য নানা সুযোগ সুবিধা দান, তবুও অন্যান্য বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে। সেই কারণে আলোচ্য মঠটি বিষয়ে আমরা একশ সাতাশ বছরের বিভিন্ন তথ্য পাই। একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ইতিহাস ১২৭ বছর ধরে পাওয়া প্রাচীন ভারতের গবেষকদের কাছে বিরল ঘটনা। দশম শতকে সঞ্জল অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটদের প্রাধান্য; একাদশ শতকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে শিলাহার বংশ ক্ষমতায় আসে এবং তারও পরে স্থানীর মোঢ় বংশের আধিপত্য দেখা যায়।

এই তিন বংশের মধ্যে রাষ্ট্রকূটরা সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ। কোঙ্কনের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট বংশের প্রায় নাড়ীর যোগ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ (৭৩৫-৫৫ খ্রীঃ) তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন বাদামীর চালুক্যবংশের অধীনস্থ সামন্তরূপে। চালুক্য বংশের তখন পড়তি অবস্থা। দন্তিদুর্গের পক্ষে চালুক্যদের উচ্ছেদ ঘটাতে বেশীদিন লাগে নি। শেষ চালুক্য রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে হঠিয়ে তিনি স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন ৭৫৩-৫৪খৃঃ। কিন্তু তারও আগে উত্তর কোঙ্কণের উপর তাঁর আধিপত্য (হয়তো রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ সামন্তরূপে (প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৭৪৯ খ্রীঃ। ক্রমে দক্ষিণ কোঙ্কনের আরও রাষ্ট্রকূটদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয় প্রথম কৃষ্ণের সময়ে (৭৫৬-৭২ খ্রীঃ) দীর্ঘদিন উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কনে রাষ্ট্রকূটদের তরফে শাসন করতেন তাঁদের অধীনস্থ সামন্ত শিলাহার বংশ।[৫]

৩

এই রাজনৈতিক পটভূমিতে উত্তর কোঙ্কনের থানা অঞ্চলে দশম শতকের গোড়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলা উচিত। এ বিষয়ে প্রধান উপাদান পাঁচটি তাম্রশাসনের প্রথমটি; যেটি ৮৪৮ শকাব্দে ( =৯২৬ খ্রীঃ ) উৎকীর্ণ। তাম্রশাসনটি যদিও তৃতীয় ইন্দ্রের রাজত্ব-কালের, তার মধ্যে তাঁর পিতা সম্রাট দ্বিতীয় কৃষ্ণের (৮৭৮-৯১৫ খ্রীঃ) সমকালীন ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় কৃষ্ণের কাছ থেকে সমগ্র সঞ্জন অঞ্চলের শাসনভার লাভ করেছিলেন তাজ্জিক বংশীয় সুগতীপ মধুমতি। তাম্রশাসনটি থেকে আরও জানা যায় যে সঞ্জন অঞ্চলের যাবতীয় 'বেলাকুল' বা বন্দর জয় করেছিলেন এই মধুমতি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় কৃষ্ণের অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে মধুমতি সঞ্জন অঞ্চলে এক সফল অভিযান চালিয়েছিলেন এবং তার পুরস্কার স্বরূপ সমগ্র সঞ্জন মণ্ডল শাসনের ভার পেয়েছিলেন। 'তাজ্জিক' বা 'তাজিক' বলতে আরবদের বোঝায়। আর সংস্কৃত মধুমতি নামটির আড়ালে যে নামটি রয়েছে, তা হল মহম্মদ। কোঙ্কন অঞ্চলে আদি মধ্যযুগে যে বিদেশী বণিকেরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে আরবরা অগ্রগণ্য। বাণিজ্যিক কারণে আরব ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন মৈত্রীর কথা সমকালীন নানা তথ্যসূত্রে বিধৃত।[৬] কিন্তু এক্ষেত্রে উভয়ের সমঝোতা বাণিজ্যিক স্তরকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছে যায়।[৭] অবশ্যই এই মৈত্রীর পিছনে অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক স্বার্থ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। আরবদের সহায়তায় রাষ্ট্রকূটরা সঞ্জনের বন্দর সমৃদ্ধ এলাকা থেকে কাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, সেকথা সঠিক না জানলেও, এটুকু অনুমান করা চলে যে এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটদের অনুগত শিলাহারদের উপরই বোধ হয় কোপটা পড়েছিল।

একথা বলা এই জন্যে যে আলোচ্য মঠটি রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ প্রশাসক বা গভর্ণর সুগতীপ মধুমতির সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠটির প্রধান বিষয় ছিল দেবী দশমীর একটি মন্দির। দেবী দশমী সম্ভবত দুর্গা বা ঐ ধরনের কোনও মাতৃকাদেবীর সমতুল্য। অনৈয় বা অন্নৈয় নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর দুই ভ্রাতা রেবণ ও কৌতুকের উৎসাহ ও উদ্যোগে মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল। অন্নৈয় কোনও সাধারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় ইন্দ্রের মন্ত্রী পুবৈয়-এর সঙ্গে তার

বন্ধুত্বের কথা জানা যায়। সম্রাটের প্রতি অন্নমৈয়ের ব্যক্তিগত আনুগত্যের কথাও তাম্রশাসনে লিখিত। তিনি সম্ভবত মন্দির ও মঠের জন্য কিছু রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে দেবী দশমীর মন্দিরের জন্য সংযান (=সঞ্জন) মণ্ডলের দেবীহার গ্রামের 'অর্ধধুর' (এক বিঘার ১/১৬ ভাগ) জমি দান করা হয়। এছাড়াও সংযান মণ্ডলের কোলিমহার বিষয়ের (জেলার) অন্তর্গত কানাডক্ক গ্রাম দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কানাডক্ক গ্রাম থেকে প্রাপ্য রাজস্বের উপর সরকারী দাবী ত্যাগ করে তা মন্দিরের উদ্দেশে দেওয়া হ'ল। এই আর্থিক সঙ্গতি ও ভূসম্পত্তি দিয়ে দেবী দশমীর জন্য নৈবেদ্য প্রদান, মন্দির সংস্কার ও মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত পঞ্চগৌড়ীয় মহাপর্ষদের নয়জন ব্যক্তিকে রোজ খাওয়ানোর খরচ মেটাতে হ'ত। পঞ্চগৌড়ীয় মহাপর্ষদ সম্ভবত পাঁচটি অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের অধ্যয়ন। অধ্যাপনের একটি প্রতিষ্ঠান। এই পাঁচটি অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা (১) সারস্বত (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল, ও (৫) উৎকল—দেশীয় বলে পরিচিত।[৮] একটি তাম্রশাসনে এই মহাপর্ষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাধ্যায়িক বা পণ্ডিতদের কথা জানা যায়।[৯] প্রথম তাম্রশাসনের পঞ্চগৌড়িয় ব্রাহ্মণরাই বোধহয় স্বাধ্যায়িক বলে উল্লিখিত। তা হলে দেখা যাচ্ছে তিন ব্রাহ্মণ ভাইয়ের উদ্যোগে যে দেবী মন্দিরটি গড়ে উঠল, সেটি কেবলমাত্র পূজা উপাসনার ক্ষেত্র নয়; তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বসবাস, আহারাদি ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ব্যবস্থাও আছে। তাই তাম্রশাসনগুলিতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানটি মন্দির নয়, মঠ বা মঠিকা নামে অভিহিত। স্থানীয় এক মুসলমান শাসকের আনুকূল্যে ও তাঁর অধিপতি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে ('তদনু-মতেন') প্রতিষ্ঠিত হ'ল একটি মঠ এমন এক উপকূল অঞ্চলে যা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণে সুপরিচিত ছিল। মঠিকাটি এর পরের সব তাম্রশাসনেই 'কৌতুক মঠিকা' নামে আখ্যাত। যদিও তিন ভাইয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন, তবুও এক ভাইয়ের নামেই মঠিকার নামকরণ হয়। সম্ভবত তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ।

## ৪

মহম্মদ সুগতিপের রাজত্বকালেই কৌতুক, অন্নমৈয় রেবণ—এই তিন ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে। কৌতুক মঠিকা বিষয়ে অনেক আকর্ষক তথ্য পাওয়া যাবে পরবর্তী শাসক তৃতীয় কৃষ্ণের সময়কার (৯৩৯-৬৭ খ্রীঃ) তাম্রশাসনে।[১০] এই

তাম্রশাসনে মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী বলে আখ্যাত; বুঝতে অসুবিধে নেই দেবী দশমী ও ভগবতী এক ও অভিন্ন। আলোচ্য তাম্রশাসনে দেবী মন্দিরের উল্লেখ আছে দ্বিতীয় মন্দিরটি ভিল্লমালদেব মধুসূদনের অর্থাৎ বিষ্ণুমন্দির। বিষ্ণুমন্দিরটি ভিল্লমাল (বর্তমান রাজস্থানের ভিনমাল)-এর বণিককুলের পৃষ্ঠ-পোষকতায় গড়ে উঠেছিল মনে হয়, রাজস্থানের ভিনমাল অঞ্চলের একটি বণিক সম্প্রদায় সংযান মণ্ডলে তাঁদের পাকাকাকি কর্মক্ষেত্রে গড়ে তুলেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে সঞ্জন অঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ভিনমালের বণিকদের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরটি তাঁদের আদি বাসস্থানের (বা কর্মকেন্দ্র) স্মৃতিতে চিহ্নিত হয়।

তাম্রশাসনটির মুখ্য বক্তব্য হ'ল পাশাপাশি দুই মন্দিরের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল। সেই বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাতে একটি সমঝোতা হয়। সমঝোতার শর্তগুলি বিষ্ণুমন্দিরের 'বারিক' (বা পাণ্ডা) ও দেবী মন্দিরের মহাপর্ষদ (যার কথা আগের তাম্রশাসনেই জানা গিয়েছে) উভয় পক্ষই মানতে বাধ্য থাকবেন। বিরোধ কিন্তু ধর্মীয় কারণে ঘটে নি; বরঞ্চ কারণটি একেবারেই জাগতিক। দেবী মন্দিরের উত্তর দেওয়ালের সংলগ্ন জমিটি ছিল বিষ্ণুমন্দিরের সম্পত্তি। দেবী মন্দিরের পরিচালকরা কোনও এক সময়ে বিষ্ণুমন্দিরের জমিটি আত্মসাৎ করেন, তাই নিয়ে স্বভাবতই বিবাদ বাধে। এই বিবাদ মেটাতে যে শর্তগুলির কথা তাম্রশাসনে লেখা আছে তা এইরকম: বিষ্ণুমন্দিরের জমি দখল করার সুবাদে দেবী মন্দিরের তরফ থেকে প্রতি বছর বিষ্ণুমন্দিরকে চল্লিশ দ্রম্ম (রৌপ্য মুদ্রা) দিতে হবে। এই অর্থ উক্ত জমির 'স্রোতক' বা ভাড়া বা খাজনা হিসেবে গৃহীত হবে। তা হ'লে এতে সন্দেহ নেই যে দেবী মন্দিরের কর্তাব্যক্তিরা পাশের মন্দিরের কিছু জমি অন্যায়ভাবে দখল করেছিলেন। 'স্রোতক' হিসেবে প্রতি বছর চল্লিশ দ্রম্ম অর্থ বিষ্ণু মন্দিরকে দেবার দিনও ধার্য করা আছে: দীপোৎসব ভঙ্গ বা দেওয়ালীর দিন। দীপাবলী অবশ্যই দেবী মন্দিরের অন্যতম প্রধান উৎসব, তাই খাজনা-ভাড়া প্রদানের জন্য ঐ সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।[১১] প্রসঙ্গত বলা উচিত যে দীপাবলী উৎসব সম্বন্ধে লেখমালায় এইটিই সম্ভবত প্রাচীনতম উল্লেখ। বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও ভক্ত, তিনি ব্রাহ্মণ বা বণিক যেই হোন না কেন, যদি স্রোতক' বা খাজনার পরিমাণ বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হন, অথবা মন্দিরের প্রাচীর ভাঙার ব্যবস্থা করেন, এবং এই জাতীয় গর্হিত আচরণের দ্বারা সমঝোতা নষ্ট করার প্রয়াসী হন, তা হ'লে তিনি কুক্কুর ও চণ্ডালের সমতুল্য

বলে গণ্য হবেন। বিষ্ণু ভক্ত যদি বণিক হন, তাহলে উপরিউক্ত অপরাধের জন্য সরকার তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখেন! অনশনের দ্বারা আত্মহননের মাধ্যমে অপরপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টাও নিন্দিত। তাম্রশাসনে স্পষ্ট বলা হয়েছে এইরকম কোনও চরম পন্থা নিলেও সমঝোতার শর্তগুলি অপরিবর্তিতই থাকবে। 'স্রোতক' হিসেবে যে চল্লিশ দ্রম্ম অর্থ দেবীমন্দির বিষ্ণুমন্দিরকে দেবে, সেই রৌপ্যমুদ্রা তৈরী করে দেবেন শ্রেষ্ঠী ব্যবহারিক গম্ভুবক।

যে ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হ'ল জমি দখলের বিবাদের দরুন অনেক জল ঘোলা হয়েছিল। দেবী মন্দিরের তরফ থেকে পাশের মন্দিরের জমি দখলের সক্রিয় প্রয়াস সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। দুই মন্দিরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চাপ সৃষ্টির চেষ্টা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে অনশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের প্রয়াসও অভাবিত থাকে নি। কিন্তু জমি দখলের মত অন্যায় কর্ম সত্ত্বেও দেবী মন্দিরের জন্য বিশেষ কোনও শাস্তিবিধান করা হয় না। চল্লিশ দ্রম্ম 'স্রোতক' ব্যয়ের বিনিময়ে দেবী মন্দিরের পরিচালকরা কার্যত বিতর্কিত ভূখণ্ডের উপর পাকাপাকি ভোগাধিকার কায়েম করে বসলেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দেওয়া দরকার। উভয় ধর্মস্থানের সঙ্গেই বণিক সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিন্ন মালের বণিকদের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে বিষ্ণু মন্দিরটি গড়ে উঠেছিল; অপরপক্ষে দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে বাণিজ্যকর্মে আগত আরবদের ভূমিকা ভুললে চলবে না। তাছাড়া শ্রেষ্ঠী ব্যবহারিক গম্ভুবক নিঃসন্দেহে একজন ধনী মুদ্রা ব্যবসায়ী (money-merchant)। তাঁরই নির্মিত মুদ্রায় দেবীমন্দিরের মহা-পর্ষদের কর্তাব্যক্তিরা 'স্রোতক' হিসেবে চল্লিশ দ্রম্ম প্রতি বছর বিষ্ণুমন্দিরকে দিয়ে থাকেন। বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুরোহিত, ধর্মীয় নেতা, মন্দির পরি-চালনকারী ব্রাহ্মণদের নিয়মিত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একটি পরিষ্কার চেহারা এখানে ফুটে উঠেছে।

দুই মন্দিরের মধ্যে বিবাদ যখন তুঙ্গে, এবং ক্রমে যখন তার একটা সমাধানের পথ দেখা যাচ্ছে, তখন সংযান মণ্ডলের রাজনীতির চেহারাটা কি রকম? সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে সংযান মণ্ডলে কে বা কারা তাঁর সামন্ত হিসেবে ছিলেন, সে বিসয়ে খোলাখুলি কোনও কথা দ্বিতীয় দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বলা নেই। কিন্তু তৃতীয় কৃষ্ণের পাদবন্দনাকারী অর্থাৎ অনুগত দেশ ও রাজাদের তালিকার 'তাজিক' বা আরবদের উল্লেখ আছে। তৃতীয়

কৃষ্ণের প্রতি, রাজনৈতিকভাবে অনুগত আরবরা সম্ভবতঃ সংযান মণ্ডলের আরব শাসককুল। সুগতিপের কোনও বংশধর বা অন্য কোনও আরব শাসক সেখানে রাষ্ট্রকূটদের সামন্ত হিসেবে ক্ষমতা ভোগ করছিলেন। সংযানের দুই মন্দিরের ঝগড়া মেটাতে আঞ্চলিক প্রশাসক হিসেবে আরবদের কিছু ভূমিকা, এক্ষেত্রে আড়ালে পড়লেও, অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে দেবী ভগবতীর মন্দিরটি আরব শাসক সুগতিপ মধুমতির আনুকূল্যে গড়ে উঠেছিল। দুইটি তাম্রশাসন দেখলে মনে হয় আরব প্রশাসকরা তো বটেই, রাষ্ট্রকূট সম্রাটরাও বোধ হয় দেবী মন্দিরের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মন্দিরটি তাঁদের নেকনজরেও পড়েছিল নিশ্চয়, নইলে পাশের মন্দিরের জমি দখল করার ব্যাপারে কোনও শাস্তিবিধান করা দূরে থাকুক, উল্টে একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বার্ষিক ভাড়া হিসেবে ঠিক করা হ'ল—যেন ঘটনাটা আইনসঙ্গত জমি ভাড়া নেবার মতই একটা ব্যাপার। কি ধরণের ও আর কার স্বার্থ দেবী মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সে কথা পরে আলোচনা করব।

## ৫

আশ্চর্যের কথা পরবর্তী তিনটি তাম্রশাসনে দেবী মন্দিরের ব্যাপারে নানা কথা বলা হ'লেও, তার পাশের বিষ্ণুমন্দির বা দুই মন্দিরের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আর একটি কথাও জানা যায় না।

তৃতীয় তাম্রশাসনে দেখা যায় রাষ্ট্রকূট আধিপত্যের যুগ শেষ। ঐ অঞ্চলে শিলাহার রাজারা আবার ক্ষমতায় এসেছেন। তৃতীয় তাম্রশাসনে শিলাহার ছিত্তুরাজের (চিত্তরাজ) অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে ৯৫৮ শকাব্দে ( ১০৩৪ খ্রীঃ ) চামুণ্ডরাজ নামক এক রাজাকে সংযান অঞ্চলে দেখা গেল।[১২] এই তাম্রশাসনে কৌতুক মঠিকাকে একটি ঘানক বা তেলের ঘানি দান করা হয়েছে। এই দানকে নমস্যবৃত্তি বলা হয়েছে, অর্থাৎ চিরকালীন নিষ্কর দান। ঘানি থেকে উৎপন্ন তেল ও খোলিকাও ( খোল ) মন্দিরের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ; ঘানিতে উৎপন্ন জিনিষগুলিকেও কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এই তেল ব্যবহার করা হবে দেবী ভগবতীর সামনে দীপ জ্বালাবার জন্য এবং—চমকিত হতে হয়—মঠিকার মহাপর্ষদের স্বাধ্যায়িক বা পণ্ডিতদের ও ব্রাহ্মণ অতিথিদের পদসেবার জন্য। বোঝা যাচ্ছে দেবী মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাধ্যায়িকদের গুরুত্ব ক্রমে বাড়ছে, ফলে তাঁদের আরাম ও আয়েসের ব্যবস্থাও

করা হচ্ছে। স্বাধ্যায়িকদের গুরুত্ব বাড়ার আরও একটি প্রমাণ এই যে মঠিকার উদ্দেশে প্রদত্ত দান মহাপর্ষদের তরফ থেকে এক স্বাধ্যায়িক গ্রহণ করেন ঃ তাঁর নাম চিহড়। তিনি কি তবে স্বাধ্যায়িকদের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ বা জ্ঞানচর্চায় অগ্রগণ্য? মন্দিরের উদ্দেশে প্রদত্ত দান যিনি গ্রহণ করেন, অনুমান করতে বাধা নেই, মন্দিরের পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কৌতুক মঠিকার জন্য যখন ঘানিটি দেওয়া হ'ল, তখন চামুণ্ডরাজের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেবী মন্দিরের মহাপর্ষদের প্রতিনিধি হিসেবে নাম আছে অগস্তি গাবী, সীলুব, ভাস্কর, অর্জুন, দিনকর, দেদে, আর্য, সিন্দুর, আদিত্যবর্ণ।[১৩] এঁরা সকলেই দেবী মন্দিরের পূজার্চনা ও মঠের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দেবী মন্দিদের যাজ্ঞীকর নামক আর এক ব্যক্তির কথা জানা যায় ঃ তাঁর পরিচয় 'শালাস্থান মুখ্য।' 'শালাস্থান' কথার অর্থ বাসগৃহ। অর্থাৎ পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও মঠের অন্যান্য ব্যক্তির জন্য নির্মিত বাসস্থানের তিনি দেখাশোনা করতেন। অতএব মনে করা চলে যে দেবী মন্দিরের আয়তন ও ক্রিয়াকলাপের পরিসর বোধহয় বেড়েছে, সেইজন্য বিশেষ দায়িত্ব পড়ছে এক একজন ব্যক্তির উপর। মন্দিরের সার্বিক পরিচালনভার অবশ্যই মহাপর্ষদের উপর ন্যস্ত আছে। রাজসভার বিশিষ্ট সদস্য ও রাজকর্মচারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণ্যমান্য নাগরিকরা যেমন ঃ হরষমানীয় মুখ্য অর্থাৎ পাঁচটি কারিগর গোষ্ঠীর প্রধানেরা, পুরপ্রধান অর্থাৎ সঞ্জন নগরীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, বিষয়ীগণ বা জেলার অধিকারীগণ, যথা ঃ ক্ষিত, লিম্বৈয়, বলৈয়, কেশবৈয় প্রভৃতি। এখানেই শেষ নয়, অনেক ব্যবসায়ীর উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয় ঃ কেশরী নামক শ্রেষ্ঠী, সুবর্ণকার কল ও সোমেয়, বণিক উব ও তিন ব্যবহারিক বা ব্যবসায়ী, অল্লীয়, মহর ও মধুমত। শেষ তিনটি নামের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অল্লীয় নামটি আলি শব্দের সংস্কৃতায়িত চেহারা আর মধুমত ও মহম্মদ যে একই নাম একথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব আমরা যে তাম্রশাসনে কেবলমাত্র কয়েকজন বণিকের নাম দেখি তাই নয়, দেবী মন্দিরের প্রতি দানকর্মের সময় তিনজন মুসলমান বণিককেও লক্ষ্য করি।[১৪] ঐ অঞ্চলের বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে মঠিকার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকাটি সেই বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়। সাধারণ বণিক ছাড়াও শ্রেষ্ঠী বা ধনী ব্যবসায়ী এখানে আছেন। দুজন স্বর্ণকারও এই তালিকাভুক্ত।

স্থানীয় কারিগরদের আগ্রহও তাম্র শাসনে প্রতিফলিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত থেকে শুরু করে বণিক, কারিগর, প্রশাসক, এমনকি মুসলমান বিদেশী বণিক—অর্থাৎ সমাজের নানা অংশের সম্ভ্রান্ত মানুষ এই মঠের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

৬

একাদশ শতকের মাঝামাঝি আবার রাজনৈতিক পালাবদল চোখে পড়ে। ৯৬৯ শকাব্দ (=১০৪৭ খ্রীঃ) ও ৯৭৪ শকাব্দের (=১০৫৩ খ্রীঃ) দুইটি তাম্রশাসনে শিলাহারদের পরিবর্তে স্থানীয় মোঢ়বংশীয় শাসক বিজ্জলকে রাজত্ব করতে দেখা যায়।[১৫] রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে অবশ্য দেবী মন্দিরের কোনও ভাগ্য বিপর্যয় হয় নি। দুইটি তাম্রশাসনেই মঠিকার প্রতি নানাবিধ সুযোগ সুবিধাদানের কথা বলা হয়েছে। ৯৬৯ শকাব্দের মাঘ সংক্রান্তির দিনে বিজুলের দানকর্মের সময় উপস্থিত ছিলেন সর্বাধিকারী নিযুক্ত বরিষ্ঠক শ্রীমুম্মুরক (প্রধানমন্ত্রী) এবং ঠক্কুর ডোম্বলৈয় প্রমুখ মন্ত্রীবর্গ। কৌতুক মঠিকাকে এই তাম্রশাসনে অবশ্য কবীতক মঠিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৌতুক মঠিকার ভোগাধিকারে (প্রভুজ্যমান) কণাড্ড নামে একটি গ্রাম ছিল—অর্থাৎ ঐ গ্রামের রাজস্ব কৌতুক মঠিকার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সম্ভবত কণাড্ড ও কানাডুক (যার নাম প্রথম তাম্রশাসনে আছে) এক ও অভিন্ন গ্রামের নাম। এই নিষ্কর গ্রাম থেকে 'সিরিডিরকা' নামক একটি বিশেষ কর রাজকোষে জমা পড়ত; বিজ্জল সেই অধিকারও প্রত্যাহার করে নিলেন। 'সিরিডিরকা' থেকে প্রাপ্ত অর্থ দুই স্বাধ্যায়িক ও দুই গৃহস্থের উদ্দেশে দেওয়া হল। অনেকগুলি আকর্ষক ঘটনা এই তথ্যগুলি থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমত কণাড্ড কানাডুক গ্রামটিকে যখন মঠিকার উদ্দেশে গোড়ায় দান করা হয়েছিল, তখন স্থানীয় শাসক সিরিডিরকা করের উপর স্বীয় অধিকার বজায় রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন বাদে বিজ্জল ঐ করটিও মকুব করেন। সিরিডিরকা কি জাতীয় রাজস্ব, এ সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। অপর উল্লেখযোগ্য কথা এই মঠিকাতে এখন কেবলমাত্র স্বাধ্যায়িক বা ধর্মজগতের মানুষরাই থাকেন না, সেখানে গৃহস্থদের বাসও আছে। কিভাবে দুই গৃহস্থ বহুধর ও কক্কুঅঃ—মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বোঝা মুশকিল। সম্ভবত মঠের কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করতেন বলে তাঁদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা মঠ করত।

বিজল আরও একবার কৌতুক মঠিকার জন্য 'সিরিডিরকা' কর প্রদান করেছিলেন ৯৭৫ শকাব্দে ( = ১০৫৩ খ্রীঃ )। মোটামুটি দুইটি তাম্রশাসনের মূল বক্তব্য একইরকম। দ্বিতীয় তাম্রশাসনটিতে কিছু বিশদ বর্ণনা আছে। কণাড্ড কানাড্ডক গ্রামের মতই কেননা গ্রামটিও কৌতুক মঠিকার ভোগাধিকারে ছিল; তবে সিরিডিরকা কর ভোগের অধিকার আগে ছিল না। ৯৭৫ শকাব্দের তাম্রশাসনে সেই অধিকার স্বীকৃত হয়। এই তাম্রশাসন অনুযায়ী সিরিডিরকার বার্ষিক পরিমাণ তিন দ্রম্ম ঐ তিন দ্রম্ম ২৭ জন ব্রাহ্মণ অতিথিকে খাওয়ানোর জন্য ব্যয়িত হবে। সেইজন্য তাম্রশাসনে তিন দ্রম্মকে 'ভোজন অক্ষয়নী' বা ভোজন অক্ষয়নীবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'অক্ষয়নীবি' কথাটি চিরকালীন দান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৭

একশো সাতাশ বছরের ইতিহাসে তিনটি পৃথক রাজবংশের কাছ থেকে রাজস্ব ভোগের অধিকার, ভূমিলাভ ও আরও নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে কৌতুক মঠিকা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দুটি বা তিনটি গ্রামের রাজস্ব ভোগের অধিকার ছিল এই মঠের। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে দেবীহার গ্রামের অর্ধধুর পরিমাণ ( $1\frac{1}{2}$ বিঘা ) জমি, যা মঠকে দান করা হয়েছিল। একটি তেলের ঘানিও দান করা হয়। 'সিরিডিরকা' নামক রাজস্ব, যা সাধারণত মকুব করা হয় না, তা-ও দেবী মন্দিরের উদ্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভগবতী মন্দিরের আয়তনও যে বেড়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে : প্রথম দিকে দেবী মন্দির ও মহাপর্ষদ নিয়ে গঠিত মঠিকাতে পরে যুক্ত হয়েছে শালাস্থান বা বাসগৃহ। গোড়ার দিকে মহাপর্ষদের সঙ্গে যুক্ত নয়জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল, পরে পঁচিশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। মঠিকার এই উন্নয়নের পিছনে স্থানীয় শাসক-কুলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত আমাদের নজর এড়ায় না—এবং আনুকূল্য প্রদর্শনের নীতিটি দীর্ঘমেয়াদী এবং ধারাবাহিকভাবে মানা হয়েছে।

কিন্তু কৌতুক মঠিকার সংলগ্ন বিষ্ণু মন্দিরের কি হল? মাত্র একবারই এই মন্দিরের সম্বন্ধে তথ্য আমরা পেয়েছিলাম, তারপর সব তাম্রশাসনই বিষ্ণুমন্দিরের ব্যাপারে তুষ্ণীভাব দেখিয়েছে। মন্দিরটি হঠাৎ উধাও হয়ে গেল, একথা মনে করার কারণ নেই। কারণ তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসন অনুযায়ী প্রতিবছর দেবী মন্দিরের কাছ থেকে ৪০ দ্রম্ম পাবার

কথা। এমনটা ভাবা অসঙ্গত নয় যে বিষ্ণুমন্দিরের ব্যাপারে প্রশাসনিক নীরবতা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত, তার অনস্তিত্বের কারণে নয়। মনে রাখা দরকার যে দুটি মন্দিরের সম্পর্ক মধুর ছিল না। এটাও খেয়াল রাখতে হব দুটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সঙ্গে বণিকদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু বিষ্ণু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বণিকেরা উপকূলের মানুষ ছিলেন না, তাঁরা রাজস্থানের ভিনমাল থেকে সঞ্জনে এসেছিলেন ; অতএব কোঙ্কন উপকূলে তারা বহিরাগত। অন্যপক্ষে দেবী মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম বণিক-সম্প্রদায়—যাঁরা সম্ভবত স্থানীয় উপকূলের ব্যবসায়ী। এর মধ্যে মুসলমান আরব বণিকদেরও ধরতে হবে, যাঁরা ব্যবসায়ীরূপে ভারতে এসে ব্যবসায়িক স্বার্থেই উপকূলের সমাজ ও ধর্মকর্মে নিজেদের ভালোমত জড়াতে চাইছিলেন। দেবী মন্দিরের প্রতি আঞ্চলিক কারিগর গোষ্ঠীগুলির উৎসাহের কথাও অজানা নয়। রাজস্থান থেকে বহিরাগত বণিকদের প্রভাব ও প্রাধান্য যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেইজন্য কি স্থানীয় প্রশাসক স্থানীয় ব্যবসায়ী ( আরব বণিকসহ ) ও স্থানীয় কারিগররা কি সম্মিলিতভাবে অপর একটি মন্দিরের প্রতি তাঁদের মদত একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে দিয়ে আসছিলেন ? তা-শাসনগুলির তথ্য সাজালে ও তার ব্যাখ্যা করলে এই অনুমানই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে, ক্রমে ক্রমে। বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে রাজানুগ্রহ নেই, ভিনমালের বণিকদের অর্থানুকূল্যেই তা গড়ে উঠেছিল। অতএব আন্দাজ করা যায় তাঁদের হাতে বাণিজ্যলব্ধ অর্থের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য ছিল না। অন্তত কিছুদিন বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের মদতপুষ্ট স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিলেন। যতই বিত্ত ও প্রতিপত্তি থাকুক না কেন কৌতুক মঠিকার, বিষ্ণু মন্দিরের জমি আত্মসাৎ করার দায় তার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয় নি। তাই চল্লিশ দ্রম্ম বার্ষিক ভাড়া দেবী মন্দিরকে দিতে হত। চল্লিশ দ্রম্ম সেইযুগে খুব কম অর্থ নয়। যে সময় তিন দ্রম্ম দিয়ে পাঁচিশজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো যেত, সেখানে চল্লিশ দ্রম্মের মূল্য যথেষ্ট। এই ঘটনার পরই উপকূলের শাসক, বণিক সমাজ, কারিগর গোষ্ঠীর সহানুভূতি ও আনুকূল্য বোধহয় আরও বেশী করে মঠিকার প্রতি বর্ধিত হয়। চল্লিশ দ্রম্ম করে প্রতি বছর খাজনা দেবার খরচ সামাল দেবার জন্যই কি নানাবিধ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতে থাকে ? বিষ্ণু মন্দিরের কপালে যে এই জাতীয় কোনও অনুগ্রহ জোটেনি, তা তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট আর পক্ষপাতও যে কৌতুক মঠিকার প্রতি, তাতেও কোনও দ্বিমত নেই।

তাম্রশাসনগুলি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি মঠের প্রতিষ্ঠা, তার প্রসার ও উন্নয়নের তথ্যাদি আমাদের সামনে হাজির করে না, পাশাপাশি দুই মন্দিরের মধ্যে নিতান্ত পার্থিব কারণে গজিয়ে ওঠা বিরোধের প্রতিও ইঙ্গিত করে। আমরা শুধু একটি মন্দিরের কথাই জানি তাই নয়: একটি মঠের আয়নায় উত্তর কোঙ্কনের উপকূলবর্তী সমাজে দুই বণিক গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন লক্ষ্য করি; এও লক্ষ্য করি কিভাবে উপকূলের সমাজ ও প্রশাসন ধর্মাচরণের মাধ্যমে স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি তার পক্ষপাত জানান দেয়।

পাদটীকা

১ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'দি জিওগ্রাফি অফ দি ডেকান', গোলাম ইয়াজদানি (সম্পাদিত) **দি আর্লি হিস্ট্রি অফ দি ডেকান,** **প্রথম খণ্ড,** (লণ্ডন, ১৯৬০) পৃ: ৩৩-৩৪

২ ঐ, পৃষ্ঠা, ৩৪-৩৫,

৩ **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,** ৩২ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৯৫৭), পৃ: ৪৫-৭৬।

৪ ভি. ভি. মিরাশি সম্পাদিত, **করপাস ইনস্ক্রিপশনাম ইণ্ডিকেরাম** ষষ্ঠ খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭৮)

৫ রণবীর চক্রবর্তী, 'দি অ্যাটিচিউড অফ দি রাষ্ট্রকূটস টুওয়ার্ডস দি কোঙ্কন কোস্ট' (প্রকাশিতব্য)

৬ আদি মধ্যযুগীয় আরব লেখকরা বলহার (রাষ্ট্রকূট উপাধি বল্লভরাজ-এর আরবী রূপ) রাজাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এস. এম. নায়নার—**আরব জিওগ্রাফারস নলেজ অফ সাউথ ইণ্ডিয়া** (মাদ্রাজ, ১৯৪২) দ্রষ্টব্য।

৭ রণবীর চক্রবর্তী, **ওয়ারফেয়ার ফর ওয়েলথ: আর্লি ইণ্ডিয়ান পারস্পেকটিভ** (কলকাতা, ১৯৮৬)

৮ **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,** পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮, সারস্বত ব্রাহ্মণরা সম্ভবত কোঙ্কনের স্থানীয়; বাকীরা বোধহয় কোঙ্কনে বহিরাগত।

৯ এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১০ **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা,** পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫-৬০

১১ মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে দেওয়ালীর দিন থেকে নূতন আর্থিক বছর গণনা করার প্রথা আজও প্রচলিত আছে। এই প্রথার প্রাচীনত্ব কতটা তা

জানা নেই। এখানে ধরে নেওয়া যায় যে দেবী মন্দিরের কর্তাব্যক্তিরা বার্ষিক ৪০ দ্রম্ম 'স্রোতক' বিষ্ণু মন্দিরকে দিতেন দেওয়ালীর দিন, কারণ ঐ দিন থেকেই নূতন আর্থিক বছর শুরু হচ্ছে। এটা যুক্তিসঙ্গত বটে, কারণ আর্থিক লেনদেন ও হিসাব আর্থিক বছরের শুরুতেই হওয়া উচিত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব এক আলোচনা প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন যে 'টেকচাঁদ' বহার (১৭৩৯-৪০ সালে লিখিত) এর বিখ্যাত ফার্সী অভিধান **বহার-ই-আজম্**-এ 'দিওয়ালিয়া' শব্দের অর্থ নিঃস্ব, বাংলায় যাকে আমরা বলি দেউলিয়া বা দেউলে। দীপাবলীর দিন, দিনের বেলায় নিঃস্ব ব্যবসায়ী তাঁর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ রেখে মোমবাতি জ্বেলে রাখতেন। এইভাবেই দেওয়ালীর দিন নিজেকে নিঃস্ব ঘোষণা করতে হত। এটিও দীপাবলীর দিন থেকে নূতন আর্থিক বছর গোনার প্রথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। তথ্যটির জন্য বর্তমান লেখক অধ্যাপক হাবিবের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনুমান করা যায় কোঙ্কনে উপকূলের ব্যবসায়ী সমাজ দীপাবলীর দিন থেকে নূতন আর্থিক বছর গণনা করত—এই প্রথার প্রাচীনত্ব সম্ভবত দশম শতাব্দী থেকে।

১২ **এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা**, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১-৬৮

১৩ এই ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ, কিছু কিছু নাম যেমন গাণী, সীলুব, দেদে এই নামগুলি বোধহয় স্থানীয় ব্রাহ্মণদের নাম।

১৪ এই বণিকদের বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: রণবীর চক্রবর্তী, 'মার্চেন্টস অফ আর্লি মিডিভাল কোঙ্কন', **ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এণ্ড সোস্যাল হিষ্ট্রি রিভিউ** (প্রকাশিতব্য)

১৫ এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮-৭৬।

# মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সমস্যা

অতুলচন্দ্র রায়

ভারতের ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল দেশের মানুষের সার্বিক ইতিহাস রচনার জন্য উহার বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের একটি বিশেষ রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে ও আঞ্চলিক জনগণের কতকগুলি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে যাহার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও চর্চা ছাড়া ভারতের সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা অনুধাবন করা সম্ভব নহে। সমগ্রকে জানিতে হইলে আঞ্চলিক বিভিন্নতার পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন ও তাহাই বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে সেগুলিতে যথার্থ চিত্র পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরে এই বিষয়ে ইতিহাসবিদ ও গবেষকগণ আগ্রহী হইয়াছেন ও কিছু কাজও হইয়াছে। তথাপি মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চার অবকাশ এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য সেই সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ সমস্যাও রহিয়াছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক' কথাটির প্রকৃত অন্তর্নিহিত সংজ্ঞা এখনও পরিষ্কার নহে। যে অর্থে এই কথাটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তাহার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ইহার অর্থ হইল কোন এক দেশের বা অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-ধারা, চারিত্রিক স্বভাব, আচার-আচরণ ও ধর্ম-বিশ্বাস। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক' কথাটির বিশ্লেষণ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ "This includes the human as well as the economic relation of different classes to one another, the character of family and household life, the condition of labour and of leisure, the attitude of men to nature, the culture of

each age as it rose out of these general conditions ef life and took ever-changing forms in religion, literature and music, architecture, learning and throught." ইহা অনস্বীকার্য যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের অবতারণা করিতে হয় এবং ইহার জন্য একটি মোটামুটি দক্ষতা রচনা করিতে হয়। কিন্তু বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সেই ক্ষেত্র এখনও রচিত হয় নাই।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রচনা আমাদের হাতে এখনও আসে নাই, এবং সেই যুগে এই ধরণের রচনার কোন প্রয়াসও হয় নাই। ইহার সম্ভাব্য কারণও অনুমান করা যায়। বাংলার প্রথম দিকের মুসলমান শাসকগণের অধিকাংশই ছিলেন অসিজীবী ও নিরক্ষর। লুঠতরাজ ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে উহাদের যতটা উৎসাহ ছিল, কৃষ্টি প্রচারে ততটা ছিলনা। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের কোনো কোনো সুলতান ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই দরবারী ইতিহাস অথবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইহিহাস রচনায় উৎসাহ দেন নাই এবং আত্মজীবনীও রচনা করেন নাই। সমকালীন যুগে উত্তর ভারতে ফার্সী ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষতা ঘটে, কিন্তু এই সাহিত্যেও বাংলা তথা বাংলার জনগণের উল্লেখ নিতান্তই সামান্য এবং তাহাও নিছক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রসঙ্গেই। এই বিশাল ফার্সী ঐতিহাসিক সাহিত্যে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির কোনো উল্লেখ নাই। সম্ভবত সেই যুগের বাঙালীর জীবন-ধারণ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ উত্তর ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের তেমন ছিল না বলিয়া মনে হয়।

পাল আমল হইতে বাংলায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটিতেছিল এবং এই সাহিত্য ছিল প্রধানত ধর্মীয় ও লৌকিক। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সাহিত্যে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর সুফী মতবাদ ও সুফী সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে রচিত এক নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। মধ্যযুগে বহু বিদেশী—বিশেষ করিয়া ইওরোপীয়, চৈনিক ও আরব দেশীয়—নানা উদ্দেশ্যে বাংলায় আসে ও বাংলার সম্বন্ধে কিছু তথ্যও পরিবেশন করে। তথাপি এই তথ্যগুলি এতই সামান্য যে ইহার অবলম্বনে বাংলা তথা বাঙালীর এক পূর্ণাঙ্গ তথা নির্ভরযোগ্য চিত্র অঙ্কন করা যায় না।

প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করিয়াই সে যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারেই পারিবারিক জীবন পরিচালিত হইত। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় শাস্ত্র ছিল দুই প্রকারের— ঐতিহ্যগত তথা চিরাচরিত (*conventional*) ও উদারনৈতিক (*liberal*)। ঐতিহ্যগত হিন্দুধর্ম ও সমাজের ধারক ও বাহক ছিল স্মৃতি-শাস্ত্র এবং ইহার অনুসাশন অনুসারেই রক্ষণশীল হিন্দুদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত হইত। অপর দিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে যে বিশাল এক জনগোষ্ঠী ছিল, তাহাদের উপর প্রভুত প্রভাব ছিল নানা লৌকিক ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশাসনের। এইসব লৌকিক ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি ছিল রক্ষণশীলতার বিরোধী। এই যুগে বাংলার ইসলামের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলতা ও উদারনীতিবাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয়। ইসলামী উদারনীতিবাদের প্রবক্তা ছিলেন সুফী সাধু-সন্ত ও তাঁহাদের অনুগামীগণ। সুতরাং মধ্য যুগে বাংলায় তিন রকম বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে যাহাতে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় রীতি-নীতি, দেব-দেবী ও আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা অনস্বীকার্য যে সাহিত্য হইল যুগের প্রতিচ্ছবি। এই কারণে সমসাময়িক যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জন্য সম-সাময়িক সাহিত্যের গরুত্ব যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে বিবিধ মঙ্গলকাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, সহজিয়া তন্ত্রশাস্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য ও কিছু পরিমাণে সুফী সাহিত্যের উল্লেখ করা যায়।

বর্তমানে কিছু ইতিহাসবিদ ও গবেষক উল্লিখিত লৌকিক সাহিত্য হইতে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার ঠিক অঙ্কন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই প্রয়াস প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি সমকালীন যুগের প্রকৃত চিত্র এখনও অসম্পূর্ণ।

একথা সর্বজনবিদিত যে বাংলার প্রথম তুর্কী আক্রমণকারী মহম্মদ বখতিয়ার খালজী সাম্রাজ্য এক সেনাবাহিনী লইয়া বাংলা আক্রমণ করেন এবং অতি সহজেই একদা পরাক্রমশালী রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাভূত করিয়া ভাগীরথীর তীরে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রোথিত করেন। সমাজ হইল রাজনৈতিক শক্তির ধারক। বখতিয়ার খালজীর এই সহজ সাফল্য কি ইহাই প্রমাণ করে যে সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার সমাজ-জীবন ছিল ভঙ্গুর ও হীনবীর্য? অথচ পাল ও সেনযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। মুষ্টিমেয় তুর্কীদের অনুপ্রবেশে ও বাংলার প্রায় অর্ধাংশ দখলে

বাংলার সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকায় রহিল কেন ? এই প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য কেউ সন্ধিক্ষণে বাংলার সমাজের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনের প্রথম এক শতকের বাংলার সমাজ জীবনের প্রকৃত অবস্থা আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। মনে হয় এই সময়ে বাংলার সমাজ জীবনে স্থিতিশীলতা ছিল না এবং এই কারণে বাংলা তথা হিন্দু বাঙালী ইসলামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয়। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তুর্কীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মুসলিম শাসনের ঠিকে প্রাক্কালে সমাজ জীবনের চিত্র ফুটিয়া ওঠে নাই। সম্ভবত সেই সন্ধিক্ষণে বাংলার সমাজ জীবনের অবক্ষয় মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপনের সহায়ক হইয়াছিল। সে সময় হিন্দু তথা অ-মুসলমান সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বর্ণগত, জাতিগত ও সমাজগত সম্পর্ক ইসলামের পক্ষে বাংলার নিম্নতর জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। এই অনুমানের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে মুসলিম আক্রমণ ও মুসলিম সাধু-সন্তদের কার্যকলাপ হিন্দু তথা অ-মুসলিম সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার নানাভাবে প্রকাশ পায়। এই সময় বাংলায় বহু লৌকিক ধর্মের ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন লইয়া গড়িয়া উঠে এবং পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার প্রবৃত্ত হয়। ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত বাংলার এইসব লৌকিক ধর্ম, ধর্মানুষ্ঠান ও সাধন-ভজনের দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়াছেন তাঁহার "Obscure Religious Cults" নামক গ্রন্থে। কিন্তু এই সব ধর্মের অনুগামীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারার সুস্পষ্ট পরিচয় আজিও অলিখিত রহিয়াছে।

মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে রচিত চৈনিক ও পর্তুগীজ বৃত্তান্ত হইতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নির্ভরোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না এবং তাহাও সকল ক্ষেত্রে যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের বিবরণীতে বাংলার রাজ-ধানীর মুসলিম আমীর-ওমরাহ এবং বছরের কিছু সমৃদ্ধ বণিকদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বাংলার সমকালীন সাধারণ মানুষের সামাজিক বা পারি-বারিক জীবনধারার সম্বন্ধে চৈনিক পরিব্রাজকদের কোনো ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইওরোপীয় পর্যটকদের ( যথা বারবোসা, পাটার্স, ভার্থেসা,

বারোস, প্রমুখ) বিবরণী হইতে মুখ্যাত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের কথা জানা যায় এবং তাহাও যৎসামান্য। ইহা ভিন্ন পাওয়া যায় বন্দর-নগরীর বিত্তশালী মুসলিম বণিকদের আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন প্রণালীর কথা। কিন্তু বন্দরনগরীতে বসবাসকারী বাংলার অন্যান্য সামাজিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর কোনো কথা বিশেষ জানা যায় না।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য ডক্টর আবদুল করিম সুফী সাহিত্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুফী-সন্তদের জীবনী, তাঁহাদের কাল্পনিক অলৌকিক শক্তি এবং শিষ্যদের সহিত তাঁহাদের ধর্মীয় আলোচনা ('সলতুজ') ইত্যাদি হইল সুফী সাহিত্যের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই শিষ্যগণ নিজেদের গুরুর তিরোধানের পর গুরুদের ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেশগুলি সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। এই সব প্রকাশনীতে বাংলার শাসকবর্গের রাজনীতির কিছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিবর্তনের বা সামাজিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের কোনো উল্লেখ নাই।

বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পতন ঘটলে সংস্কৃত চর্চা কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে এক সূক্ষ্ম সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকিলে লৌকিক সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বেশ কিছুটা ম্লান করিয়া ফেলে। আমাদের অধিকাংশ গবেষকদের অভিমতই তাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ লৌকিক সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় এখনও বিশেষ জানা নাই। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের এই দিকটি গবেষণা সাপেক্ষ।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই সাহিত্যের রচনা ও বিকাশ ঘটে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর সমগ্র ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ধরিয়া। সামাজিক ইতিহাসের তথ্যের জন্য শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতগুলি বাংলার সাহিত্যে ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের উদ্ঘাটন করিয়াছে। মানুষের বাস্তব জীবন কাহিনী লইয়া যে গ্রন্থ রচনা করা যায়, ইহাদের মধ্য দিয়া তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু জীবন চরিত হিসাবে এই গ্রন্থগুলি মোটেই আদর্শ স্থানীয় নহে। তথাপি এই জীবনচরিতগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন পেশাদারী শ্রেণী ও

উহাদের বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মের ও ধর্মাচরণের আধিক্যই বেশী ও সেই সঙ্গে অতিন্দ্রীয় দর্শনবাদ। এই সাহিত্যে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার কিছু আভাস পাওয়া যায় মাত্র এবং এই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত হইবে কাল্পনিক।

বাংলার লৌকিক সাহিত্যের মধ্যে 'মঙ্গলকাব্য' হইতে বাংলার সমাজের ও সংস্কৃতির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহাকে বিশুদ্ধ সমকালীন বলা যায় না। এই কাব্যগুলির মোটামুটি রচনাকাল হইল পঞ্চদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'-এ কাব্যগুলির ঐতিহাসিকত্বের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁদের মতে কাব্যের প্রতিটি কবি তাঁহার অঞ্চলেরই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন যাহা অন্যান্য অঞ্চলের চিত্র হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ভাষায় "যে কবি যে অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কবি সেই অঞ্চলেরই সামাজিক প্রথার এক একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" সুতরাং মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কবির রচনাগুলি একত্রে সংকলিত করিতে পারিলে বাংলার বিশেষ স্তরের সমাজের নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিতে হইলে এই শ্রেণীর তথ্য বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নাই। তথাপি মঙ্গলকাব্য-গুলিতে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর জীবনধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, কবিদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের রচনায় তাঁহাদেরই সমাজের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়, "যখন কোনও নিম্নশ্রেণীর লেখক মঙ্গলকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তখন তিনি উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগকে অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া কোনও মৌলিকতা প্রকাশ পাইতে পারে না।" সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া বাংলার বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পরিবর্তে শুধুমাত্র উচ্চতর স্তরটিরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহাও পূর্ণাঙ্গ নহে।

মধ্যযুগের বাংলার সার্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জাতিগত সংগঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর বসবাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃতি,

আচার-আচরণ অনেকটা নির্ভর করে প্রকৃতিগত পরিবেশ ও জমির গুণাগুণের উপর। আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ( উন্নত ও অনুন্নত ) জীবনধারা, উহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ও আচার আচরণের জন্য তথ্যানুসন্ধানের পয়োজন। এই প্রসঙ্গে এইচ. এইচ. রিসলীর গবেষণার উল্লেখ করা যায়। বাংলার বিভিন্ন জলপথ ও স্থলপথ সম্বন্ধেও ধারণা করিতে হয়। কারণ সামাজিক বিবর্তন ও বৃত্তি বা পেশার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গমনাগমন অনেকটা নির্ভর করে যোগাযোগের ব্যবস্থার উপর। মধ্যযুগে বাংলায় নগরের অভাব ছিল না। মঙ্গলকাব্যে নগরের বর্ণনা ও নগরবাসীদের আচার-আচরণের বহু উল্লেখ আছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া একই বর্ণের বা শ্রেণীর মানুষের আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার বিশেষ বৈষম্য দেখা যায় নগর ও গ্রামের মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ নগর ও গ্রামের একই বর্ণভুক্ত মানুষের মধ্যে বৈষম্য সুস্পষ্ট। ইতিহাস গ্রন্থে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে চিত্র আমরা পাই, তাহা নেহাৎ সাধারণভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিছু সূক্ষ্মভাবে ইহার বিচার বিশ্লেষণ না করা হইলে সার্বিক চিত্র পাওয়া যাইবে না।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করিতে হইলে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও জাতি তত্ত্ববিদদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

( মধ্যযুগে ভারত ইতিহাস-বিভাগে
সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ )

# লেখক পরিচিতি

চিরকিশোর ভাদুড়ী—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গবেষক
রাজীবকান্তি শর্মাধিকারী—প্রাচীন ভারত ইতিহাসের গবেষক
সুনীলবরণ বিশ্বাস—প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গবেষক
অনিরুদ্ধ রায়—অধ্যাপক, ইস্লামিক হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রীলা মুখোপাধ্যায়—ইতিহাসের গবেষক
রীণা ভাদুড়ী—অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ
অসিত কুমার সেন—অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ
রঞ্জিত সেন—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
নিখিলেশ গুহ—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
সমর কুমার মল্লিক—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ
পার্থ সেন—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইসলামপুর কলেজ
সৌমিত্র শ্রীমানী—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পি. এন. দাস কলেজ
প্রসূণ মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ
স্নিগ্ধা সেন—অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সাবিত্রী কলেজ
শমিতা সেন—এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সুদীপ্ত সেন—এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
চণ্ডীপ্রসাদ সরকার—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ
অমল দাস—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ
নির্বাণ বসু—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনি নাইডু কলেজ
দেবব্রত মজুমদার—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গুরুদাস কলেজ
অনুরাধা রায়—ইতিহাসের গবেষক ( কলকাতা )
রণবীর চক্রবর্তী—অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অতুলচন্দ্র রায়—অধ্যাপক, ইস্লামিক হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার, কলকাতা